বাংলার নবযুগ

মোহিতলাল মজুমদার

দ্বিতীয়

[illegible]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম-প্রাণ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অচলপ্রতিষ্ঠেষু

ভূমিকা

'বাংলার নবযুগ' প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধের আকারে আমি যে আলোচনা করিয়াছি, গ্রন্থের মধ্যেই বহুস্থানে আমি তাহার অভিপ্রায় ও বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি মুখবন্ধহিসাবে সেই কথাই আর একবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলে পাঠক-পাঠিকার সুবিধা হইতে পারে।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটা বড় যুগ—কেন, তাহাই এই প্রবন্ধগুলির সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিষয়টি ঐতিহাসিক, সে কারণে আলোচনাও খাঁটি ইতিহাস-সম্মত হওয়াই উচিত; কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, বরং ইতিহাস-রচনায় অধুনা যে কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পালনীয় হইয়াছে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তথাপি, ইতিহাস বলিতে ঘটনার যে কালক্রমিক তরঙ্গ-পরম্পরাও বুঝায়, আমি তাহার একটি উদার দৃশ্যপট সম্মুখে প্রসারিত রাখিয়াছি, সেই তরঙ্গরাজির উন্নত-শীর্ষমালাই আমার ধ্যান-চিন্তার প্রধান সহায় হইয়াছে। কোন যুগের ভাবধারা—জাতির জীবনের গতি ও পরিণাম বুঝিয়া লইবার পক্ষে, ঐতিহাসিক মাল-মশলার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারও একটা প্রাথমিক প্রয়োজন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় যাহা তাহা ঐ জাতির বিশিষ্ট সাধনা ও তাহার চরিত্ররূপ নিয়তির সহিত যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির প্রাণ-মনের যে আকস্মিক উদ্দীপ্তি হইয়াছিল তাহার যথার্থ বিবরণ লিখিতে হইলে, ঐ জাতির জাতিগত পরিচয়, তাহার চরিত্রগত সংস্কার—তাহার সংস্কৃতির মূলে যে কয়েকটি গ্রন্থি দৃঢ় হইয়া আছে,—সেই সকলের আলোকে সেই আকস্মিক ঘটনাকে চিনিয়া লইতে হইবে; তাহা না করিয়া কেবল নির্ম্মম বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া ও কতকগুলি অতি আধুনিক চিন্তা ও মতবাদ তাহার উপরে আরোপ করিয়া, যে কাহিনীর সৃষ্টি হইবে তাহা আর যাহাই হউক, জাতির সেই জীবনের ইতিবৃত্ত নয়।

ঐ শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতেই বাঙালীর মানস-জীবনে যে চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়, এবং তাহারই ফলে ক্রমে যে নবজাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই, সে বিষয়ে আংশিক বা প্রাসঙ্গিক যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাতে সমগ্র-চিন্তার লক্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই কালের কতকগুলি ঘটনা ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, সে যুগের গতি-পরিণতির মূলধারাটি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই অতীতের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল বাঙালীর নাই, বর্ত্তমান ছাড়া আর কিছুকেই সে কোন মূল্য দেয় না, তার উপর, অধুনা সে বর্ত্তমান লইয়া এতই বিভ্রান্ত যে, অতীতের সংবাদ লইবার অবকাশই তাহার নাই। এজন্য গতযুগ সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তীই তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সদ্যোবিগত কালের ইতিহাসও ইতিমধ্যে গুরুতর গবেষণার বিষয়

হইয়া উঠিয়াছে ; কারণ, সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্ত্তিবিষয়ক প্রামাণ্য কাগজ-পত্র হয় লুপ্ত হইয়াছে, নয় খুঁজিয়া উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এই কাজ যতদূর সাধ্য ও সম্ভব তাহা কেবল একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও কীটদষ্ট গলিত পত্রিকারাশি হইতে সে যুগ-সম্পর্কিত যে তথ্যরাজি সংগ্রহ ও সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই ইতিহাসের একখানি কাঠামো খাড়া করা যাইবে। কিন্তু সেই তথ্যের উপাদানরাশি হইতে সে যুগের গূঢ়তম প্রবৃত্তি, এবং জাতির সেই নবজাগরণের মূল প্রেরণাটিকে আবিষ্কার করিতে হইলে, শুধুই পাণ্ডিত্য নয়, একটি বিশেষ দৃষ্টিশক্তি আবশ্যক,—উপরকার সেই তরঙ্গগুলির পারম্পর্য্যও যেমন, তাহাদের তলবর্ত্তী গভীরতর অন্তঃস্রোতকেও তেমনই, আদ্যন্তের সহিত মিলাইয়া মূলধারা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই ধারার কোন একটি অংশকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না, কারণ, কোন ব্যক্তি বা ঘটনার বৈশিষ্ট্যই সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয় ; কোন একটি তরঙ্গ কেবল আগে উঠিয়াছে বলিয়াই তাহা যে পরবর্ত্তী সকল তরঙ্গের প্রবর্ত্তক, এমন সিদ্ধান্তও ভ্রমাত্মক। যে-চেতনা পূর্ব্বে জাগে নাই পরে জাগিয়াছে, তাহাই প্রকৃত যুগ-চেতনা কিনা—নবযুগ যখন জাতির জীবনে পূর্ণ জাগরণ আনিয়াছে তখনকার সেই স্ফুটতর বেদনাই পূর্ব্বতন বিক্ষোভের কারণ কিনা—ইহাও বিচার করিতে হইবে, তাহারই মানদণ্ডে মূল-ধারাটির বেগ ও বিস্তার নির্ণীত হইবে। আমি যে দৃষ্টিশক্তির কথা বলিয়াছি তাহা সুলভ নহে, সে শক্তির দাবিও আমি করিতেছি না, কিন্তু সেইরূপ একটা আদর্শ যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; সে চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, এ যুগের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তকার সে বিচার করিবেন। ভবিষ্যৎ বলিলাম এইজন্য যে, এখনও ঐ যুগকে বিচার করিবার মত কালের উপযুক্ত ব্যবধান ঘটে নাই ; জাতির জাগরণ সেই যুগে আরম্ভ হইয়া একটা বড় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সহসা অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তনে জীবনের গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; এই নূতন জীবনধারায় জাতির নিয়তি যে নূতনতর সত্যের ইঙ্গিত করিবে, তাহার নিকষে পূর্ব্বযুগের মনীষিগণের সাধনালব্ধ সেই জীবন-মন্ত্র যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা হইবে—জাতির উদ্ধারকল্পে তাঁহারা যে পথ ও পাথেয় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে কতখানি দূরদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের পরিচয় আছে, তাহাও প্রমাণিত হইবে। এখন এই মহামন্বন্তরের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাপর ধারা-নির্ণয় করাই দুরূহ ; তাই আমিও গ্রন্থে যাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহার সত্যাসত্য-বিচার এখনই সম্ভবপর হইবে না।

তথাপি এই গ্রন্থপাঠ কালে আমার ঐ একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—আমি ঐতিহাসিক নই, এ গ্রন্থও ইতিহাস নয়। আমি যে সূত্র ধরিয়া বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী রচনা করিয়াছি তাহাতে সে যুগের কয়েকটি বিরাট পুরুষকে নাটকীয় চরিত্র বা পাত্রের মত কালক্রমিক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া নাটকের অঙ্কগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছি মাত্র। আমি দেখাইয়াছি, এই পুরুষগুলি সেই একই ধারাকে পর পর ধরিয়া রাখিয়াছে, সকল বিরোধ-সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই জাগরণ যে পরিণামের অভিমুখী হইয়াছে, সে পরিণাম—জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক নূতন জাতীয়তা-

বোধ। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর বহির্জ্জীবনে বড় কিছু ঘটে নাই, সে একটা জাগরণ মাত্র—তাহার প্রাণ, মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ। বাঙালী জাতির জাতিগত সংস্কারই সেই জাগরণের সহায় হইয়াছে, কারণ, বাঙালীর জীবনে ভাব-চিন্তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি; ব্যবহারিক জীবনে সে অনেক সঙ্কট অনেক সমস্যাকে এড়াইয়া চলে, অথবা অতিশয় লজ্জাজনক ভাবে সহ্য করে; বাস্তবের আঘাতে সে তেমন সাড়া দেয় না, দেশের জলমাটি বা প্রাকৃতিক প্রভাবই ইহার কারণ, জাতির রক্তও কতক পরিমাণে দায়ী। তাহার নিকটে ভাব আগে, বস্তু পরে; তাই মিষ্টিক তত্ত্বরস বা মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত আরাম তাহাকে চিরদিন তৃপ্ত রাখিয়াছে, ঐ জলবায়ু তাহার কর্ম্মোদ্যমকে শিথিল করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়াছে। তথাপি, সে যে বীর্য্যহীন নয় তাহার বহু প্রমাণ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে, তাহার সেই ভাব-জীবনে—সেই আত্মতৃপ্তির মানস দুর্গে—দুইবার প্রবল ধাক্কা লাগিয়াছিল; একটি, মুসলমান-শাসনের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহার সমাজে ও ধর্ম্মে; আর একবার গত শতাব্দীতে, ইংরেজ-শাসন ও তদধিক—ইংরেজী শিক্ষার ফলস্বরূপ, তাহার ভাবজীবন ও চিন্তাজীবনের মূলে। এই দুইটিরও পূর্ব্বে বৌদ্ধবিপ্লব-কালে তাহার অবস্থা কি হইয়াছিল জানা নাই; হয়ত সেই প্রাচীনতর যুগে বাঙালী তখনও কোন সুদৃঢ় ঐতিহ্যের অধিকারী হয় নাই, তখনও জাতির চরিত্র দানা বাঁধে নাই; ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাহার যে একটা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরে নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সেই সংস্কৃতির উপরেই নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতেও কোন প্রবল ধাক্কা কি ভাবে কোথায় লাগিয়াছিল তাহার নিশ্চিত বৃত্তান্ত জানা নাই। কিন্তু বাঙালীর ইতিহাস যে মুখ্যতঃ ভাববিপ্লব ও চিন্তাজীবনের ইতিহাস, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই ধাক্কা সর্ব্বপ্রথম লাগিয়াছিল তাহার সামাজিক জীবনের বন্ধনগুলিতে; তখনও তাহার পূর্ণজাগরণ হয় নাই, অর্থাৎ যুগের প্রভাব তখনও সে ভালরূপ অনুভব করে নাই, কেবলই বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছে, অন্ধ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছে। এই যুগই রামমোহনের যুগ, কিন্তু তাহা নবযুগের সূচনামাত্র; তাই এই যুগের নায়ক রামমোহনকেই সমগ্র যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া যে একটা প্রচলিত সংস্কার নানা কারণে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই সংস্কার কতদূর সত্য, এ গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা বিচার-পূর্ব্বক নির্ণয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ তাহারই উপরে আমার আলোচনার মূল্য নির্ভর করিতেছে—আমি ঐ জাগরণের প্রকৃতি ও পরিণাম যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার সহিত এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। আমার দৃষ্টি ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহারও একটা যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ আছে। তাই এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব। রাম-মোহনের চরিত্রে এমন স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা, এবং তাঁহার মানস-ধাতুতে বুদ্ধির এমন প্রাখর্য্য ছিল যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম আগামী অর্থাৎ আধুনিক যুগের উপযোগী সমাজসংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, জাতির জীবনপ্রবাহে পুরাতনের যে পঙ্ক ও শেহালা জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা দূর করা যে অত্যাবশ্যক, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তিনিই কয়েকটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রধান লক্ষণ—স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও

মনকে মুক্ত রাখিবার শক্তি। ইহারই বলে তিনি তৎকালীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের অঙ্গে যে আঘাত করিয়াছিলেন তাহাতেই সুপ্তিভঙ্গের সূচনা হয়—ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য, এবং ইহার জন্য রামমোহনের যে গৌরব তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু জাগরণের সূচনা হইলেও তাহার ক্রম বা ধারা রামমোহনের অভিলষিত পথে অগ্রসর হয় নাই—তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অনুরূপ হয় নাই। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি; রামমোহনের ঐ দৃষ্টি এবং তাঁহার সেই যুদ্ধঘোষণার মূলে কেবল একটা অসাধারণ ব্যক্তি-প্রতিভাই ছিল, তাঁহার সেই মনোভাব ও মতবাদ যে অতিশয় মৌলিক, এবং এজন্য রামমোহন একজন অসাধারণ পুরুষ, এমন ধারণা অনেকের আছে। তিনি যে একজন অসাধারণ পুরুষ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু তাঁহার ভাব-চিন্তার যে মৌলিকতা দাবি করা হয়, তাহা বিচার-সাপেক্ষ। রামমোহন যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, এমন কি, উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণও করিয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত; কিন্তু তন্ত্রের শিক্ষা যে কি, তাহা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজবিধির কত বিরোধী, তাহা প্রায় কেহই অবগত নহেন; যাঁহারা সে বিষয়ে কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, রামমোহনের ঐ মতবাদ ও মনোভাব মৌলিক বলিয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম: রামমোহন জাতির বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছু না হউক, একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ণ জাগরণের স্বরূপ বা গভীরতর কারণ, এবং সেই জাগরণের ফলে পরবর্ত্তী কালের জটিলতর সমস্যা ও তাহার সমাধান—এ সকলের কিছুই তিনি যে নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ ঐ যুগের ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিলেই মিলিবে। আমি রামমোহনকে তাঁহার প্রাপ্য স্থান দিয়াছি; কিন্তু দীর্ঘকাল-প্রচলিত জনশ্রুতি অথবা অর্দ্ধ-সত্য কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া, এবং অধুনালব্ধ তথ্য-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া, আমি রামমোহনের একটা অমূলক ও অনাবশ্যক মহিমাবৃদ্ধির চেষ্টা করি নাই। কেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত বহু নূতন ও সুনিশ্চিত তথ্যই নয়—ঐ যুগের পূর্ণ প্রভাবকালে যে সকল শক্তিমান ও যুগন্ধর পুরুষ তাঁহাকে যেরূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সেই দৃষ্টির অমোঘতার যে প্রমাণ এখনও নানাদিকে পাওয়া যাইতেছে—তাহার সাহায্যেও, আমি এই যুগের গভীরতর প্রবৃত্তি বুঝিয়া তাহার ধারা-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত মত-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই; আমি বাঙালী হইয়া বাঙালী জাতির হৃদস্পন্দন, তাহার শ্রেষ্ঠ আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার সাধনা ও সংস্কৃতি, এবং সর্ব্বোপরি তাহার বিশিষ্ট প্রতিভার একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সাল তারিখ বা ঐতিহাসিক কালক্রমের হিসাবে রামমোহনের স্থান, এবং কোন একদিক দিয়া তাঁহার মনীষা—যতই উচ্চ হউক, এই যুগের প্রধান ও মূল প্রবর্ত্তনা যে ইংরেজি শিক্ষার ফলেই ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; সে পক্ষে কোন ব্যক্তিবিশেষই যুগপ্রবর্ত্তক নহেন; ছোট-বড় কত পুরুষের প্রচেষ্টা, এবং শেষে জাতির প্রবুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা সেই শিক্ষাকে প্রসারিত ও প্রয়োজনীয় করিয়াছে। সমাজ-সংস্কারের বাসনা ক্রমে যতই প্রবল হউক, ঐ যুগের সমগ্র

মধ্যকাল ব্যাপিয়া এই শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাই আর সকল আকাঙ্ক্ষাকে গৌণ করিয়া তুলিয়াছিল, এবং সেই শিক্ষার ফলে যখন বাঙালীর প্রাণমনের পূর্ণ জাগরণ ঘটিল, যুগের সেই তৃতীয় ও শেষ পর্ব্বে, সে আত্মপ্রকাশের ভাষাও খুঁজিয়া পাইল—নব্য-বাঙলা-সাহিত্যের জন্ম হইল। এই নব্যসাহিত্যই জাতিহিসাবে তাহার পূর্ণ জাগরণের নিদর্শন; ইতিপূর্ব্বে সে যাহাকিছু করিয়াছিল, তাহাতে সে তাহার আত্মাকেই খুঁজিতেছিল, তখনও পায় নাই,—তাহার প্রমাণ, সে ইতিপূর্ব্বে সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে, এমন কি রাজ-নৈতিক ধূলাখেলায়, যেমন কেবল অনুকরণই করিতেছিল, তেমনই, সাহিত্যে অনুবাদ ছিল তাহার একমাত্র কৃতিত্ব। এতদিনে সে কবি ও ঋষির পদে—স্রষ্টার আসনে—অধিষ্ঠিত হইল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের স্থানে বঙ্কিম, মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হইল। যে জাগরণ এতদিন সমাজ, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ ছিল তাহাই সমগ্র জাতির প্রাণকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে যে 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের ঋষি বলা হইয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য আমরা এখনও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করি নাই। এতদিনে যেন জাতির মগ্নচৈতন্য হইতে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের ঐতিহ্য, তাহার সেই সুদীর্ঘ অতীত, একসঙ্গে একই প্রেরণায় তড়িৎশিখাবৎ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। এখন নূতনকে বরণ করিবার জন্য পুরাতনকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন আর রহিল না; সমাজসংস্কার অতিশয় বাঞ্ছনীয় হইলেও, দেশীয় বিধিবিধানগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া সরাসরি বিলাতী প্রথা আমদানি করিতে গুরুতর দ্বিধা উপস্থিত হইল—বিলাতী বস্তুকেই একটু দেশী রং বা হিন্দু আবরণ দিয়া লজ্জা ঢাকিবার প্রবৃত্তিও প্রশমিত হইল; এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের গালি মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য, হিন্দুধর্ম্মকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করিয়া—উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন রহিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ভাবুক ও মনীষী পৌরাণিক ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্মের পরিণত রূপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাহাতে জাতির আধ্যাত্মিক সংশয় দূর হইল; শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ও অলৌকিক সাধক-জীবনের দ্বারা—বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র, হিন্দুসাধনার এই তিন ধারার যে সমন্বয় করিলেন তাহাতে, হিন্দুর ত' কথাই নাই—একজন খাঁটি খ্রীষ্টপন্থী ও মহামনীষী বিদেশী লেখকও চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই সকলের মূলে সেই যুগের কোন্ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিতে হইবে? উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যে যজ্ঞানল জ্বলিয়াছিল তাহাতে বাঙালীর প্রতিভা, সমগ্র হিন্দুভারতের প্রতিনিধিরূপে, যে-মন্ত্রে যে-আহুতি দিয়াছে—তাহার নাম জাতীয়তা; এ মন্ত্রের এমন বাণী পূর্ব্বে কখনও ভারতভূমিতে উচ্চারিত হয় নাই, বিধাতা তজ্জন্য বাঙালীকেই বরণ করিয়াছিলেন, বাঙালীই তাহার যোগ্য হইয়াছিল,—কি কারণে ও কোন্ গুণে, আমি এই গ্রন্থে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই জাতীয়তার যে উদ্বোধন হইয়াছিল—তাহা হিন্দু-ইতিহাসের কোন অংশকে অস্বীকার করিয়া নয়, পরবর্ত্তী সমগ্র হিন্দুসাধনাকে এককালে মুছিয়া ফেলিয়া, "হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপনিষদের একেশ্বরবাদ"কে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও নয়। যে দৃষ্টির দ্বারা যুগে যুগে হিন্দুসাধনার সেই এক সনাতনকে অপূর্ব্ব ও বিচিত্র বিকাশের মধ্য দিয়া অনুসরণ

করা সম্ভব—শুধু সম্ভব নয়, না করিতে পারিলে হিন্দুর সেই লোকোত্তর সম্পদ মিথ্যা হইয়া যায়,—সেই দৃষ্টি যতদিন না আয়ত্ত হইয়াছে, ততদিন নবযুগের সেই ভাব-বিপ্লব লক্ষ্যহীন নিষ্ফলতার দ্বারা বিড়ম্বিত হইতেছিল। সেই সনাতন যদি নবযুগের এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবেই ভারতের সংস্কৃতি—হিন্দুর হিন্দুত্ব বাঁচিবে। ইহার জন্য কেবল সংস্কারকের ভূমিকায় আস্ফালন করিলেই চলিবে না। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই সমস্যা যেমন কঠিন হইয়া দেখা দিয়াছে, তেমনই তাহার সমাধানও নিত্যত্বের গৌরব লাভ করিয়াছে। বাঙালী বা ভারতবাসীর জীবনে সে সমস্যা এখনও দূর হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর গভীর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সমাধানের সেই ইঙ্গিত এবং প্রেরণা এখনও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে; সকল কথা খুলিয়া বলিবার উপায় নাই, পরে আভাসে কিছু বলিব।

এই যে জাগরণ ইহার মূলে রামমোহনের কোন্ বাণী, কোন্ ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঁকি দিতেছে? প্রখর বুদ্ধিশালী তর্ককুশল রামমোহন যে একটিমাত্র কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—তিনি এ জাতির বুদ্ধির জড়তাকে আঘাত এবং গতানুগতিকতার মোহভঙ্গ করিয়াছিলেন। আর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সেইকালের পক্ষে যতই মৌলিক হউক, পরবর্ত্তীকালে তাহার অধিকাংশই বাতিল হইয়া গিয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যে সংস্কার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাহার সঙ্কীর্ণতা ও কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; 'একেশ্বরবাদ' ও 'পৌত্তলিকতা', এই দুইই হিন্দু দর্শন ও হিন্দুসাধনার বহির্ভূত; উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও সেমিটিক একেশ্বরবাদ এক নহে—নয় বলিয়াই 'পৌত্তলিক' শব্দটাই হিন্দুর অভিধানে একটি প্রক্ষিপ্ত শব্দ। হিন্দু 'একেশ্বর'ও বোঝে, 'পৌত্তলিকতা'ও বোঝে—কিন্তু রামমোহনের বুদ্ধি দিয়া নহে; শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী, এবং তারও পরে, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দের সাধন-মন্ত্র যে-কালে সারা ভারতের চিত্ত অধিকার করিয়াছে, সেকালে এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি অভ্রান্ত ছিল না—তিনি যথার্থ ধর্ম্ম-সংস্কারক হইতে পারেন নাই। শিক্ষাবিস্তারও রামমোহন একা করেন নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রামমোহন যে শিক্ষানীতির সমর্থন করিয় ছিলেন, তাহা যথাকালে আপনিই প্রবর্ত্তিত হইত—সেই নীতি অবলম্বন করিবার মত ধীশক্তি ও কর্ম্মপ্রতিভা যাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্ফুরিত হইয়াছিল সেই বিদ্যাসাগরও একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তিনি রাম-মোহনের অন্ধ অনুবর্ত্তী ছিলেন না। তথাপি সেই শিক্ষানীতিও জাতির পক্ষে সত্য, অর্থাৎ, কল্যাণকর হয় নাই; যে-শিক্ষা সত্যকার জাতীয় শিক্ষা বলিয়া পরে উপলব্ধ হইয়াছে, এবং সুবিদিত কারণে এখনও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই—রামমোহন তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি যে জাতির অদৃষ্ট বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আদৌ পূর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আজিকার এই অবস্থা; রামমোহনের রাজনীতি ছিল ভূমিচর, অর্থাৎ স্থূল ও কল্পনাহীন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের আশ্রয়ে, ইংরেজ-শাসনের স্নিগ্ধ ও কল্যাণকর ছায়ায় ভারতবাসীর চতুর্ব্বর্গ লাভ হইবে; তজ্জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা—ঐ সাধু ও সুসভ্য জাতির নিকটে আবেদন-নিবেদন, আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের

ভ্রম বা ঔদাসীন্য দূরীকরণ। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, ইংরেজ জাতির প্রতি যে গভীর আস্থা, ইংরেজের সুবিচার ও সদাশয়তার উপরে যে নির্ভরতা ঐ যুগে সমগ্র জাতিকে যেন একটা সংস্কারের মত পাইয়া বসিয়াছিল, রামমোহন সেই প্রাকৃতজনসুলভ বুদ্ধির উপরে উঠিতে পারেন নাই, এবং ইহাই সত্য যে, দেশ ও জাতির জন্য তাঁহার যতকিছু শুভ চেষ্টা ঐ একই ধারণা-প্রসূত, এইজন্য তাঁহার বুদ্ধিও অনেক পরিমাণে ইংরেজী বুদ্ধিই ছিল—তাঁহার অধিকাংশ চিন্তার মূলে ছিল ইংরেজের অনুকরণ; হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-শাস্ত্রের নূতনতর ব্যাখ্যাও ওই এক মনোবৃত্তির ফল। তথাপি তাঁহার মহত্ত্বের নিঃসংশয় নিদর্শন এই যে, তিনিই এ যুগের প্রথম মুক্তিপিপাসু বাঙালী, এবং সেই মুক্তির প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম স্বজাতি-সমাজে নির্ভয়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, তবু ইহার প্রয়োজন ছিল। বাংলার নবযুগ নামে আমি যে যুগের কাহিনী লিখিয়াছি, সেই যুগ যে কেবল বাংলার নয়, ভারতেরও নব-জাগরণের যুগ, ইহা যেমন সত্য, তেমনই, তাহার উদ্বোধন ও আয়োজন যে বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ইহাও স্বীকার্য। সে-যুগের বাংলার ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস —বাংলার বাহিরে সর্ব্বত্র তখন ঘোর অন্ধকার। আবার, সেই জাগরণের মূলে যে মুক্তি-পিপাসা ছিল তাহা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক মুক্তি-পিপাসা নহে, সে পিপাসা আরও গভীর—গভীর বলিয়াই সে-যুগ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এ গ্রন্থে আমি তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি—তথ্য-প্রমাণে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইবে। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, এবং পরে আধ্যাত্মিক সত্য-পিপাসা, এবং এই সকলের মধ্য দিয়াই পূর্ণ-মনুষ্যত্বের যে পথ ও পাথেয়-সন্ধান—তাহাই এ যুগের যুগব্যাপী সাধনা, আমি এই দিকটিতেই লক্ষ্য রাখিয়াছি, তাই সে যুগের অপরিস্ফুট রাজনৈতিক চেতনাকে গণ্য করি নাই; আধুনিক কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও তাহার নীতির সহিত ঐ যুগের ভাবধারার প্রত্যক্ষ যোগ নাই বলিয়া, এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরব্ধ হয় তাহার মন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল বলিয়া, আমি সে আলোচনা সাবধানে বর্জ্জন করিয়াছি।

কিন্তু এইক্ষণে (এই ভূমিকা লিখিবার কালে) এমন একটি ঘটনায় সারা ভারত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিত ও আলোড়িত হইয়াছে যে, বাঙালীরই তাঁহাতে নূতন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, অতএব অমি গ্রন্থমধ্যে যাহার উল্লেখমাত্র করি নাই, এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। বাংলার নবযুগের কাহিনীতে আমি বাঙালীর যে চরিত্র ও তাহার যে নিয়তির একটা পরিচয়-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছি —এই ঘটনায় তাহার আশ্চর্য্য সমর্থন রহিয়াছে। বাংলার সেই নব-জাগরণ যে কোন্ অর্থে ভারতেরও নব-জাগরণ—বাঙালীই যে এযুগের মুক্তিসাধনায় আদি ও প্রধান পুরোহিত, বাঙালীই যে অসাধ্য-সাধনের মন্ত্র জানে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মহা আয়ুর্ব্বেদ যে তাহারই আবিষ্কার, এ কথা আজ ভারতের সর্ব্বত্র সকল জাতি স্বীকার করিবে। যে জাতীয়তা-বাদ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের যুগোচিত প্রতিভায় একটা আধ্যাত্মিক আদর্শে উন্নীত হইয়াছিল, তাহারই উদগ্র আবেগে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম

পাদে, বাঙালী দেশ-মাতৃকার যে অকাল-বোধন করিয়াছিল, তাহাতে আত্মনাশের যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া সে প্রায় ভস্মসাৎ হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থে সেই নিদারুণ নিষ্ফলতা ও তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহা অনুমান করিয়া প্রকাশ্যে কোন দুরাশার আশা পোষণ করিতে সাহসী হই নাই ; তাই সেই জাতীয়তা-মন্ত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে কোন্ ফল প্রসব করিবে সে আলোচনা করি নাই ; কেবল ইহাই বলিয়াছি যে, নবযুগের সেই ধারা অতঃপর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, বাঙালীর সেই সাধনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী যে মরিবে না,—বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী যে ভারতের ইতিহাসে ব্যর্থ হইবার নয়, এ বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করি নাই, করিলে এই গ্রন্থরচনার প্রয়োজন থাকিত না। আজ ঐ ঘটনাই আমার সেই বিশ্বাস এবং চিন্তাধারাকে দৃঢ়তর করিয়াছে। বাংলায় যাহা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতেই সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে ভারতের মুক্তি নাই ; বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালী বিবেকানন্দ যে জাতীয়তার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শ, অর্থাৎ তাহাই খাঁটি ভারতীয় আদর্শ ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—ভারতবাসীমাত্রেই সেই আদর্শ যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তবেই স্ব-স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, এবং ধর্ম্মান্ধতা বর্জ্জন করিয়া, তাহারা এক 'ভারতীয়' বা 'হিন্দু' জাতিতে পরিণত হইবে, এবং 'জয় হিন্দ্' বলিতে কাহারও বাধিবে না। সে যে কেমন করিয়া সম্ভব তাহা, সেই ভাবেরই ভাবুক—বিবেকানন্দেরই উত্তর-সাধক এক বীর্য্যবান ও মহাপ্রাণ বাঙালী-সন্তান সমগ্র ভারতের চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। কংগ্রেস তাহা পারে নাই,—সে প্রাণ, সে প্রতিভা এবং সেই অসাধারণ আত্মবিশ্বাস তাহার নাই ; সে এখনও পথ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস জয় করিতে পারিতেছে না—বদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিয়া কখনও ক্রন্দন, কখনও গর্জ্জন করিতেছে। সে সর্ব্বভারতীয় এক-রাষ্ট্রের কথাও বলে, আবার—'Self-determination'-এর নীতিকেও সভয়ে স্বীকার করে। বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম নয়—আপোষ করিতেই সে সর্ব্বদা প্রস্তুত ; সেই আপোষ-নীতিই যে এতদিনে সফল হইতে চলিয়াছে—যে-নামে বা যে-অজুহাতেই হউক, সে যে এইবার তাহার সুযোগ ছাড়িবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। উপায় কি ? অহিংসা ও সত্যাগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত একটা ভিক্ষাভাণ্ড বই ত' আর কিছুই নয়,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যে তাহাই! একদিকে জনগণকে উত্তেজিত করিয়া নিজ প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি ; অপরদিকে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা সেই উত্তেজনা শান্ত করা, প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো এবং আশ্বস্ত করা ; ইহাই তাহার সংগ্রাম ; উহাতেই সন্ধির পথ প্রশস্ত হইতেছে। সংগ্রামের নামে সে সত্যই ভয় পায়—তা' সে সহিংসই হউক, আর অহিংসই হউক ঃ ইহার কারণ, তাহার দুর্জ্জয় প্রাণশক্তি বা আত্ম-বিশ্বাস নাই। মুখ্যত হিন্দু হইলেও সে তাহার সেই হিন্দুত্বকে বড় করিয়া তুলিতে পারে নাই, তাই হিন্দু-নামেও ভয় পায়, সেই ভয় প্রতিপক্ষকে সংশয়ান্বিত করে। খাঁটি হিন্দুত্বের সেই মহতী অনুপ্রেরণা নাই বলিয়াই সে হিন্দুকেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত করিতে পারে নাই—তাহারও শঙ্কা দূর করিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত সে যে জাতীয়তার মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে ভাব-বিরোধ, আদর্শ-বিরোধ,

এমন কি নীতি-বিরোধও আছে, তাই তাহাকে এক এক কালে এক একটি বিশেষ ধূয়া তুলিয়া জনগণকে জাগাইয়া রাখিতে হয়। মহাত্মা গান্ধীর নব-সৃষ্ট ঐ কংগ্রেস ভারতে যে জন-জাগরণ আনিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব; কিন্তু জাগরণ সত্বেও, বার-বার পথ ভুল হওয়ায়, এবং দ্বিধাহীন, বিশ্বাস-বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে, মুক্তি এখনও সুদূরপরাহত হইয়া আছে। নেতার যে সর্ব্বপ্রধান গুণ—জনগণের চিত্ততলে অবতরণ করিয়া, তাহাদের ক্ষুধাকেই শক্তিরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া শুভ ও সিদ্ধির পথে চালনা করা—সেই গুণ কংগ্রেস-নেতার নাই। তৎপরিবর্ত্তে, যে সংকল্প বা আত্মগত আদর্শ জনমনের অনধিগম্য, তাহাতেই জনগণকে প্রবৃত্ত করিবার যে চেষ্টা, তাহা নেতার উপযুক্ত নয়—তাহা শাসক, শিক্ষক বা গুরুর কাজ; কারণ, সত্যকার নেতা যিনি, জনচিত্তই তাঁহার জন্মভূমি; যাঁহার মধ্যে জনগণের প্রাণের ক্ষুধাই পূর্ণতম মাত্রায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—তিনিই নেতা। গান্ধিজী এইরূপ নেতা নহেন; তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিগত একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শও সহজ মানবীয় আদর্শ নয়; তাহা আধিভৌতিক নয়—আধ্যাত্মিক। এই জন্যই তিনি জনগণকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহারা যে তাঁহার ডাকে পূর্ণশক্তি ও সাহসেব সহিত সাড়া দিবে—প্রাণে-মনে সম্মত হইবে—এ বিশ্বাস তাঁহার নাই। নেতার পক্ষে এই সংশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। গান্ধিজী যে-মন্ত্রের সাধক ও প্রচারক তাহা ব্যক্তি-সাধনার মন্ত্র—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে, অর্থাৎ আত্মার মুক্তিসাধনার পন্থাকেই তিনি জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার পন্থা বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন; তাহাতে ভারতবর্ষের মানুষ তাহার বহু কালাগত সংস্কারের বশে যেটুকু সাড়া দেয় তাহা যথেষ্ট নয়; তিনি তাহাদিগকে আগে মোক্ষলাভের উপযুক্ত করিয়া পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনুমতি দিবেন! ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এমন অভাবনীয় ঘটনা কখনও ঘটে নাই; মহাভারতের মহামানব শ্রীকৃষ্ণও আত্মার ধর্ম্মে ও মানুষের ধর্ম্মে বিরোধ মিটাইবার জন্য অর্জ্জুনকে কত রকমে বুঝাইয়াছেন—হিংসার মূলেও যে শ্রেষ্ঠ অহিংসা থাকিতে পারে, এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাহাকে যুদ্ধ নামক একটি অত্যাবশ্যক মানবীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। গান্ধিজীর অহিংসা সেই হিন্দুধর্ম্মের অহিংসা নয়, তাহার আদর্শ জৈন বা বৌদ্ধ। গীতার সেই তত্ত্বও মানবধর্ম্ম বা সহজ-মনুষ্যত্বের পরিপোষক নয়; এইজন্য এত বড় ধর্ম্মোপদেশ সত্বেও ভারতবর্ষে দেহধর্ম্মী মানুষের দুর্গতি কখনও ঘোচে নাই; এখানে জাতির মুক্তিকে গৌণ করিয়া ব্যক্তির মোক্ষসাধনাই শ্রেয়স্কর হইয়াছে,—আমি এই গ্রন্থে সে আলোচনাও করিয়াছি। গান্ধিজী সেই গীতাকেও সংশোধন করিয়া যে অহিংসা ও সত্যাগ্রহ-ধর্ম্মে জনগণকে দীক্ষিত করিতে—এবং জগতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহার মূলে সেই মানব-প্রেম বা মানবতার প্রেরণা নাই যাহাকে আমি বাংলার নবযুগের প্রধান ও অভিনব প্রবৃত্তি বলিয়াছি। তাঁহার প্রেম মূলে মানবমুখী নয়—ভগবৎমুখী; যে প্রেম মানুষকে মানুষরূপেই বক্ষে বাঁধিয়া, আদৌ তাহার মনুষ্যত্বকে আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত করে, ইহা সেই প্রেম নয়; তিনি মানুষের সেই সহজ মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন না, তাই এতকালেও তিনি তাহাদিগকে তাঁহার সেই অমানুষী

নেতৃত্বের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই—কখনও যে পারিবেন তাহাও সন্দেহস্থল। বাংলার নবযুগের সাধন-মন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাতে মানুষই বড়—মানুষ আগে, ব্রহ্ম পরে; অর্থাৎ ভগবানের ভিতর দিয়া মানুষকে নয়—মানুষের ভিতর দিয়াই ভগবানকে বা নিঃশ্রেয়সকে লাভ করিতে হইবে; ভগবানের মহিমা নয়, মানুষের মহিমাই মানুষকে উপলব্ধি করিতে হইবে—মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে; সেই বিশ্বাসই আত্ম-বিশ্বাস, তাহাতেই মানুষের আত্মা জাগিবে। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের বাণী। সেই মানবপ্রেমের সাধনায় যে পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিবে তাহার প্রাণের এমনই প্রসার ঘটিবে যে, সকল প্রাণ সেই প্রাণে আসিয়া মিলিবে—সে-প্রাণের স্পর্শমাত্রে লোহা সোনা হইয়া যাইবে; দীর্ঘ তপশ্চরণ, বৈরাগ্য, উপবাস, অভ্যাসযোগ, ধর্ম্মোপদেশ—এ সবের প্রয়োজন হইবে না; মহাত্মা নয়—সেই মহাপ্রাণের আহ্বানে, সেই মহাপ্রেমের আকিঞ্চনে, কেহই স্থির থাকিতে পারিবে না, ছুটিয়া বাহিরে আসিবে, নিঃশেষে আত্ম-দান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। ভারতবর্ষ আজ এইরূপ নেতারই প্রতীক্ষা করিতেছে; বাংলার নবযুগ যে-পন্থায় যে-মুক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহাতেই সেই নেতার আবির্ভাব হইবে—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাসংগ্রামেও নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। বাঙালী কবিও ঠিক এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনিও যেন সেই যুগের সেই সাধন-মন্ত্রের প্রেরণায়, মানস-নেত্রে যে আদর্শ-নেতার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, আজ আর তাহা স্বপ্ন বলিযা মনে হয় না; আমি সেই কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, একদা দিব্যভাবা-বেশের পরম মুহূর্ত্তে কবি যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন—

কবে প্রাণ খুলে পারিব বলিতে
"পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু পিছু!
পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু!

"হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখ কত দূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে'
আসে লোক শত শত।

"আয়, আয়, আয়—ডাকিতেছি সবে
আসিতেছে সবে ছুটে—
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে!

"যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক
ভরে' যায় ঘাট-বাট!
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
—ব্রাহ্মণ আর জাঠ।"

—ইহাই সেই নেতার আত্ম-দর্শন; এ স্বপ্ন কাহার সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে? এ নেতৃত্বের শক্তি কোথায়? এই যে—"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়, নাহি আর আগুপিছু"—ইহার জন্য জনগণের নয়—নেতারই পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন; সেই নেতা এমন কথা বলে না যে, আগে তোমরা জাগো, তোমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়া তোল, বরং ইহাই বলে—

চারিদিকে হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

এবং—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ!

কিন্তু গান্ধিজীর সাধন-মন্ত্রই স্বতন্ত্র, তাই তাঁহার নেতৃত্বও অন্যরূপ। তিনি, ভারতবর্ষ যে ভুল করিয়াছিল, সেই ভুল সংশোধন না করিয়া, তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিতে চান। বাঙালী সেই ভুল সংশোধন করিয়া যে নব-মানবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিল, তাহাতে এখনও সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই বটে, কিন্তু তাহা যে মিথ্যা নয়, সে প্রমাণ নূতন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাই আমিও এই কয়টি কথা যোগ না করিয়া পারিলাম না।

কর্ম্মদোষে বাঙালী যে নেতৃত্ব হারাইয়াছে, ইহাই দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য; নতুবা মহাত্মার কর্ম্মনীতির সহিত যদি বাঙালীর ভাবদৃষ্টি যুক্ত হইত, তবে এই যাত্রাপথ আরও সংক্ষিপ্ত হইত। বাঙালীর ভাবদৃষ্টি যে স্বতন্ত্র—তাহার প্রতিভার সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই আমি এই গ্রন্থে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙালী হিন্দু হইয়াও বাঙালী, তাহার ধাতু-প্রকৃতিতে যে তান্ত্রিক সংস্কার প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতেই—সে, ভাব ও রূপ—Ideal ও Real-এর সমন্বয় করিতে পারে; তাহার সেই আশ্চর্য্য সৃষ্টি-শক্তি আছে, এ শক্তি এ যুগে আর কোন ভারতীয় জাতির নাই। বাঙালীই হিন্দু, অথচ হিন্দু নয়; সে যেমন সনাতনী, তেমনই যুগ-বিপ্লবের পতাকাধারী; সে বেদান্তী নয়, সে শাক্ত—

মহামায়ার উপাসক ; সে জীবনকে ত্যাগ করিতেও যেমন জানে, ভোগ করিতেও তেমনই উৎসুক ; সে চরকা ঘুরাইতে পারে না—ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু ভিন্নতর কর্ম্মের আহ্বানে সে নিশীথ-নিদ্রা হইতেও জাগিয়া উঠে ; সে Soul-force-এর উপবাস সহ্য করিতে পারে না, এবং বুদ্ধের অহিংসার পরিবর্ত্তে গীতার অহিংসাকে অধিকতর সত্য বলিয়া মানে। এই বাঙালীই ভারতের নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছিল, এই বাঙালীই আজ এই চরম দুর্দ্দশার দিনেও, জাতীয়তার সেই তান্ত্রিক আদর্শকে যেরূপে অবয়বী করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই ইঙ্গিতে অন্ধকারে পথ মিলিতে পারে—কংগ্রেসও তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-নীতি সংশোধন করিয়া অকূলে কূল পাইতে পারে।

তথাপি বাঙালী হিন্দুর আজ বড় দুর্দ্দিন ; বাঙালী হিসাবেই বাঙালীর বাঁচিয়া থাকা যে কত প্রয়োজন তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি বলিয়াই, আমি অধুনা আত্মভ্রষ্ট ও আত্মঘাতী বাঙালীর জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, এবং নানা মত ও নানা দলের কুরুক্ষেত্র এই বাংলা দেশে যিনি সেই বাঙালীত্বকে রক্ষা করিবার জন্য একাই বহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছি।

বাগনান, বি. এন্. আর.
পৌষ, ১৩৫২

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

নবযুগের সূচনা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এযুগের সারা ভারতের ইতিহাস। ওই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই এই বাংলা দেশে যুগব্যাপী প্রাচীন সংস্কারের জড়ত্ব আঘাত পাইতে থাকে। এই সময়ে রামমোহনের ন্যায় মনীষী সকল বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সমাজ-শাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন; রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার ভাণমুক্ত করিয়া একটা রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যে পরিমাণ ইংরেজী শিক্ষা এই আদর্শের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কার্যকরী হইয়াছিল—রামমোহনের তাহা ছিল না; তৎসত্ত্বেও তাঁহার যে সহজাত মেধা ও তার্কিক প্রতিভা ছিল তাহা বাঙালীরই প্রতিভা—কামদেব তার্কিক বা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দেশে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে, রামমোহনের মত প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে; যুগধর্ম্মের বশে সেই জাতীয়-প্রতিভাই—সেই একই শক্তি—এক নূতন তন্ত্রের অভিমুখী হইয়াছিল, যুগোচিত প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াছিল। তখন সদ্য রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে সমাজ-শক্তিও ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সেই অরাজ-কতার কালে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ ঘটিয়াছিল, রামমোহনের নব্যতন্ত্রের পক্ষে তাহাও কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক হইয়া থাকিবে। রামমোহনের জীবনেতিহাসে তাহার প্রমাণ মিলিবে। রামমোহন নিজ জীবনে যে স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিয়া-ছিলেন—এক অসাধারণ মেধা ও তত্ত্ববুদ্ধির বলে তিনি তাহাকেই রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, সকল নীতির দ্বারা শোধন করিয়া জাতির জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া-ছিলেন। এজন্য তিনি প্রধানতঃ একটি বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন—অতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ও সর্ব্বপ্রকার গুহ্যসাধনা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করা; যাহা একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল—তাহার উচ্ছেদ-সাধন। প্রায় সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে মানুষমাত্রের যে স্বাধিকারবাদ—রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা—প্রবল হইয়াছিল, রামমোহনের এই চেষ্টার মূলেও তেমনই এক ভিন্নতর বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিবার সেই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইহাই সে যুগের প্রথম বিদ্রোহঘোষণা। আমাদের

দেশের শাক্ত সাধকগণ সমাজের বাহিরে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের শক্তিসাধনা ব্যক্তিগত ভাবে করিতেন, রামমোহন সমাজের ভিতরেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে, আধিভৌতিক ঋদ্ধিলাভের জন্য, সেইরূপ সাধনার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং বলিষ্ঠ মেধা ও তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধি সহকারে সেই মত ঘোষণা করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। নবযুগের এই নূতন মুক্তিমন্ত্র—শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদ—সেকালের পণ্ডিত-সমাজকেই আঘাত করিয়াছিল, জাতির চৈতন্যে সাড়া জাগে নাই ; এই নূতন তন্ত্র সমাজে কেবল একটা বিরোধের বীজ বপন করিয়াছিল। ইহার কারণ রামমোহন ছিলেন নিজেরই মুখপাত্র, তাঁহার বিদ্রোহ ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত—তিনি ছিলেন পূরামাত্রায় অ্যারিস্টো-ক্র্যাট। তথাপি তাঁহার সেই 'আইডিয়া' তদানীন্তন জড়তাগ্রস্ত সমাজের মনে যে প্রথম ধাক্কা দিয়াছিল—পরবর্ত্তীকালের বহু মনীষী তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; জাতি-সাধারণ রামমোহনকে কখনও বুঝিতে না পারিলেও, ইহার অল্পকাল পরেই এ জাতির যে নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল—রামমোহনের বাণীতেই যে তাহার প্রথম সূচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাগরণের দ্বিতীয় যুগ বিদ্যাসাগরের যুগ ; এই যুগেই যুগ-লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইযাছিল। এই যুগেই একটি ব্যক্তির মধ্যেই সে যুগেব সকল আকৃতি যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনেই যুগপ্রবৃত্তিব সেই মূল তত্ত্বটি যেরূপে ধরা দিয়াছিল—তাহার সেই বাণী যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—আমার মনে হয়, এমন আর কাহারও জীবনে হয় নাই। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেব ঘরে জন্মিয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শিক্ষা ও সংস্কারে বর্দ্ধিত হইয়া এবং আজীবন ব্রাহ্মণ-আচার বজায় রাখিয়াও ভগবৎ-আরাধনা বা অধ্যাত্ম-সাধনার পরিবর্ত্তে মানুষের সেবায় সর্ব্বসমর্পণ করিয়াছিলেন, —মুক্তিচিন্তা বা পরলোকের ভাবনা তাঁহার আদৌ ছিল না। তাঁহার বংশগত সংস্কার ও সংস্কৃত বা হিন্দু-শিক্ষার কথা স্মরণ করিলে, মনে হয় তাঁহারও এইরূপ 'নাস্তিক' মনোভাব—ভগবানের স্থানে মানুষকে বসাইয়া এই যে মানুষ-পূজার প্রবৃত্তি—ইহার তুল্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? এক দিকে তিনি শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে যেমন প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তেমনই মানুষের ইহজীবনের দুর্গতি দূর করিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টায় আজীবন উদ্‌ভ্রান্তভাবে কত কর্ম্মই করিয়াছিলেন ! মানুষের মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকটে মহামূল্যবান ছিল—সেই মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। এক দিকে লোকহিতব্রত অপর দিকে শিক্ষা-বিস্তার, এক দিকে সমাজ-সংস্কার ও অপর দিকে ভাষা ও সাহিত্যের পথনির্ম্মাণ—এই দুইয়েরই মূলে ছিল সেই এক অনন্ত প্রেরণা—মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। তিনি যে শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল—চরিত্রনীতি বা কর্ম্মনীতি ;

ইহারই প্রয়োজনে—বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যকে তিনি সেই শিক্ষার উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নিছক তত্ত্বজ্ঞানের যে দর্শনশাস্ত্র তাহাকে সেই শিক্ষায় কোন প্রাধান্য দেন নাই। তিনি প্রত্যক্ষের উপাসক ছিলেন, 'অদৃষ্ট' অপ্রত্যক্ষের প্রতি তাঁহার কোনও আস্থা ছিল না। তিনিও যুক্তিপরায়ণ ছিলেন—তিনিও তর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যুক্তি ও সে তর্ক রামমোহনের মত কোনও তত্ত্বকে প্রমাণ করিবার জন্য নয়, "কর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানে"র কারণ প্রদর্শনের জন্য। ব্যক্তির তথা জাতির জীবনে বৈষয়িক সিদ্ধিলাভকে পরমপুরুষার্থরূপে বরণ করিবার জন্য যে বুদ্ধি-ধর্ম্ম ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ রামমোহনের বিদ্রোহ-ঘোষণার মূলে বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাই সত্যকার মানবপ্রীতি ও মানবসেবায় এক উদারতর ও গভীরতর প্রেরণা হইয়া দেখা দিল; যাহা মস্তিষ্কগত ছিল, তাহাই এক্ষণে প্রাণশক্তিরূপে হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; তাহার মন্ত্র হইল আরও স্পষ্ট, আরও প্রাণময়, আরও উদার। এইজন্য বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ রামমোহনের অপেক্ষা বহুগুণে গভীর ও ব্যাপক ছিল—কারণ রামমোহনের যে বিদ্রোহ প্রধানতঃ তর্কবিচারের পুঁথি অথবা সৌখিন বৈঠকী-যুদ্ধ, কিম্বা সভাস্থাপন ও সংবাদপত্র-জাতীয় আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগর তাহাকে সাক্ষাৎ জীবনের ক্ষেত্রে সেবা ও প্রেমের শক্তিতে সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিছক তত্ত্ব আলোচনা বা তর্কবিচারের প্রতিও তাঁহার এমনই বিতৃষ্ণা ছিল যে, হিন্দুর সন্তান এবং এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি হইতে হিন্দু-দর্শনকে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন।

অতএব, বিদ্যাসাগরের মধ্যেই যে এই যুগের যুগপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সে প্রবৃত্তি যে কি, তাহা বোধ হয় এখনও কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। এই যুগপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সেকালের সেই মহাপুরুষগণেরও বোধ হয় কোন সজ্ঞান ধারণা ছিল না, একালেও আমরা তাহার কোন শুদ্ধ সুন্দর নাম আমাদের ভাষায় তৈয়ারি করিতে পারি নাই—ইংরেজী নামেরই যে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অর্থ বা ব্যাকরণ কোনটাই সুষ্ঠু নয় 'Humanity', 'Humanism' প্রভৃতির অনুকরণে 'মানবতা', 'মানবিকতা' আদৌ উপাদেয় নয়। ওই বস্তুটা ঠিক ওই অর্থে আমাদের ভাষায় ধরা দিতেছে না, তাহার কারণ উহা আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতির বহির্ভূত —ভাষা যে জাতির অন্তরতর ভাবচৈতন্যের কতখানি বাধ্য—ইহাও তাহার একটি প্রমাণ। সেযুগের যুগধর্ম্মবশে আমাদের যে জাগরণ ঘটিয়াছিল, য়ুরোপীয় ইতিহাসের ভাষায় আমরা যে তাহাকে Renaissance বলিয়া থাকি—আমার মনে হয়, এক হিসাবে তাহা যথার্থ নহে। এই নবজাগরণের মূলে যে প্রধান প্রেরণা আমরা লক্ষ্য করি—তাহা যদি ওই Humanity, Humanism জাতীয় একটা মনোভাবই হয়, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ

নূতন—কোনও প্রাচীন সুপ্ত সংস্কারের পুনরুদ্বোধন নয়। বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তির পক্ষেও এই নবভাবের প্রেরণা নিশ্চয় ইংরেজী-শিক্ষার ফলে জাগে নাই, দেশীয় শিক্ষা বা ধর্ম্মসংস্কারও ইহার অনুকূল নয়। অতএব, এ যেন ওই যুগেরই প্রবৃত্তি—কালধর্ম্মের অনিবার্য্য তাড়নাই আমাদের সমাজের সহৃদয় ও শক্তিমান ব্যক্তিগণকে কোন-না-কোন আকারে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। সে যেন একটা ঋতুর আবির্ভাব—ইংরেজী-শিক্ষা সেই আবির্ভাবের পক্ষে বড়ই অনুকূল ও উপযোগী হইয়াছিল। হিন্দুর শিক্ষা ও সাধনায় মানুষকে যে গৌরব দান করা হইয়াছে—এক হিসাবে তাহা চরম গৌরব বটে; মনুষ্যজন্ম যে সুদুর্লভ, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে মানুষের দেহভাণ্ডেও তাহাই আছে, মানুষই সাধনার বলে ব্রহ্মপদ লাভ করিবার অধিকারী—এসকল কথা হিন্দুর চিন্তায় দৃঢ়মূল হইয়া আছে, কিন্তু সে মানুষ দেহধারী 'আত্মা'; দেহবদ্ধ 'জীব'রূপে তাহার যে সত্তা—অর্থাৎ মনুষ্যজীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার পৃথক মূল্য বা মহিমা সম্বন্ধে আমরা কখনও তেমন সজাগ ছিলাম না। এজন্য এই Humanity বলিতে এযুগে আমরা যাহা বুঝি, ঠিক তেমন কোন তত্ত্ব আমাদিগকে পূর্ব্বে কখনও আকৃষ্ট করে নাই। আধ্যাত্মিক সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া মানুষকে একটা বড মূল্য আমরা দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার জীবনকে পারলৌকিক সদ্‌গতি বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের পথে চালিত করিবার আদর্শ—সমগ্র সমাজকে তাহারই অভিমুখী করিবার প্রয়াস—আমাদের স্মৃতিসংহিতায় ও নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে আজিও জাজ্জ্বল্যমান হইয়া আছে। জীবন-ধর্ম্ম অপেক্ষা জীবন্মুক্তির সাধনাই আমরা পরম-পুরুষার্থ-সাধনা বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই নূতন জীবনবাদ বা মানবধর্ম্ম তাহার প্রায় বিপরীত। ইহার মতে—মানুষের দেহগত জীবনের যে রহস্য তাহার অন্ত নাই; মানুষের মন, মানুষের প্রাণ, মানুষের হৃদয় যেমন বিরাট তেমনই অতলস্পর্শ, এবং এই মরজীবনের মত এমন মহিমময় আর কিছু নাই। মানুষের জীবনে শ্রী ও শক্তিবিকাশের যে অসীম সম্ভাবনা আছে—তাহার অন্তরবাসী আত্মা-নামক সেই অতি সূক্ষ্ম পুরুষকে বাদ দিয়াও তাহার দেহে যে ভোগের শক্তি, মনে যে সৃজনীশক্তি ও প্রভু-শক্তি, এবং হৃদয়ে যে প্রেমের ও ত্যাগের শক্তি আছে, তাহাদের পূর্ণতা-সাধনই সে জীবনের পরম নিঃশ্রেয়স; তাহার অধিক সম্ভবও নয়—আবশ্যকও নয়। ভারতীয় দর্শনের ভাষায় ইহাও একপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি, এবং এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান একরূপ নাস্তিকতাও বটে। তথাপি এ আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন; কারণ ইহাতে দেহকে বা অহং-চেতনাকে প্রাধান্য দিলেও, ভোগকেই চরমতত্ত্ব করিয়া তোলা হয় নাই; ইহাতেও ন্যায়পরতা, হিতাহিতবোধ কর্ম্মবীর্য্য, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সুমহৎ চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন আছে। অতএব এই নূতন মানবধর্ম্মের আদর্শ আত্মা বা ব্রহ্ম না হইলেও, ইহা মূলে নীতিহীন বা কর্ম্মহীন নহে; মানুষের মনুষ্যত্ব-মহিমা—জীবনকেই যতদূর সম্ভব শ্রী ও শক্তিমান করিবার প্রয়োজন—

স্বীকার করাই এই নবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। রামমোহনের সেই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বপ্রকার মিষ্টিক তন্ত্রমন্ত্রবর্জ্জন ও তদ্দ্বারা মানুষের আধিভৌতিক হিতসাধনের অভিপ্রায়—এই নব মানবধর্ম্মেরই যে প্রথম আন্দোলন সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; বিদ্যাসাগরে এই মানবধর্ম্মেরই এক অতি সহজ ও স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা—কর্ম্মে ও প্রেমে—যে স্ফুটতর রূপ ধারণ করিল, তাহাতেই নবযুগের এই নূতন প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল; অথচ বিদ্যাসাগর রামমোহনের বিপরীতপন্থী—কি চরিত্রে, কি মানস-প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল ছিল না।

ইহারই অনতিকাল পরে নবযুগের এই নূতন উৎকণ্ঠা একজন কবির চিত্তগহন হইতে কাব্যচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিল—জ্ঞানেও নয়, কর্ম্মেও নয়, এবার তাহা প্রাণের অতি গূঢ়-গভীর আকূতিরূপে বাণী হইয়া উঠিল; জাগ্রতচিত্তের যতকিছু উদ্বেগ, ভয়-ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া এবার তাহা মগ্নচৈতন্যে—ব্যক্তির স্বাধীন স্বতন্ত্রআনন্দময় সত্তায় পৌঁছিযাছে—তাহাকে স্রষ্টা কবি করিয়া তুলিয়াছে; সেখানে কোন চিন্তা বা তর্ক-যুক্তির বাধা, বাস্তবের বন্ধন-পীড়া নাই; কেবল প্রাণের দুর্জ্জয় স্ফূর্ত্তি আছে—মুক্তির ব্রহ্মাস্বাদ-চেতনার উল্লাস আছে। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মকে সকল যুক্তিতর্ক-জ্ঞানবিচারের বাহিরে, সকল প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অতীতরূপে—অতিশয় স্বাধীন কাব্যকল্পনায় লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাণের বিশুদ্ধতম আবেগরূপে অনুভব করিয়াছিলেন।

রামমোহনে যাহা যুক্তিতর্কের বিষয় ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা প্রেম ও কর্ম্মের প্রেবণা হইতে পারিয়াছিল—মধুসূদনের অন্তরে তাহাই কেবলমাত্র মুক্তিচেতনার অসীম আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথার আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, এখানে তাহারই একটু বিশেষ ব্যাখ্যা করিব। সকল উৎকৃষ্ট কাব্যই কবির অবচেতন মনের স্বপ্নরচনা। স্বপ্নরচনায় যেমন সজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব থাকে না—যাহা দেখিতেছি তাহা আমারই—স্বপ্নদ্রষ্টারই—*সৃষ্টি* বটে, তথাপি সে-আমি জাগ্রত-আমি নয; আমারই গূঢ়তর চৈতন্য ওই উপরকার আমিটাকে ভুলাইয়া—মগ্নচৈতন্যের নানা সঞ্চিত সংস্কারকে উপকরণ করিয়া যে স্বপ্ন রচনা করে, তাহাই আসলে একটি রূপকমাত্র; তেমনই কাব্যের সেই কাহিনী একটা কাহিনীমাত্রই নয়—সে কাহিনী কবিমানসের একটা অরূপ আকূতিকেই রূপ দিয়াছে; উপরের ওই কাহিনীর তলে তলে আর একটি কাহিনী বহিয়া চলিয়াছে; সে কাহিনী নিতান্তই অন্তরগোচর,—শব্দার্থের অতীত; কারণ তাহা একটি চৈতন্যঘন অনুভূতির ভাব-প্রবাহ। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' সেই ভাব-প্রবাহের একটি স্বপ্ন-রূপক; রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ, রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি কেবল এক একটি ব্যক্তি বা চরিত্রই নয়, সেই এক ভাবেরই নানা প্রতীক বা বিগ্রহ। এই

কাব্যের সমগ্র কাহিনী যেমন সেই একটি ভাবের একই রূপক, তেমনই ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ওই ছন্দই সেই ভাবকে গতি দিয়াছে—সুর দিয়াছে, ওই ছন্দের স্রোতেই কাহিনীর যত কিছু তরঙ্গ উঠিয়াছে। কবির কোন চিন্তা নাই (উৎকৃষ্ট কবিকর্ম্মে থাকে না)—তাঁহার প্রাণের সেই যে মানবধর্ম্ম-প্রেরণা তাহাতে কোন বিচার-বিতর্ক, কোন সমস্যা-সঙ্কট-বোধ নাই—সে যেন একটা প্রবুদ্ধ জীবন-চেতনা, একটা অবশ আত্মস্ফূর্ত্তি! ঋষির মন্ত্রদৃষ্টির মত কবির দৃষ্টিও অপরোক্ষ—শুধু তাহাই নয়, কবিই এমন দৃষ্টিকে জাতির দৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারেন। মধুসূদন প্রথম কিছুদিন নাটকরচনা প্রভৃতির দ্বারা বাংলাভাষা লইয়া বাণীর অনুশীলন করিয়াছিলেন; পরে সহসা একটা নূতন ছন্দ-সঙ্গীত তাঁহার অন্তরের অন্তরে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। আদিকবি বাল্মীকি যেমন হঠাৎ সেই আদি ছন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার দ্বারা কাব্যনির্ম্মাণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন—মধুসূদনের পক্ষে বোধ হয় ঠিক তেমনটি হয় নাই। মধুসূদনের সেই কাব্যমন্ত্র ও কবিস্বপ্ন যে বাণীর রূপে প্রকাশ পাইবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, এই ছন্দই ছিল সেই বাণীর বীজ বা আত্মস্বরূপ। সেই ছন্দ তাঁহার অন্তরে পূর্ণপ্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার সহিত দেহও যুক্ত হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই যে বাণীদেহের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা, ছন্দ তাহার বাহন মাত্র নয়, ছন্দই তাহার প্রকৃত রূপ।

এক্ষণে দেখা যাক, সেই বাণী কি? 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' কবির কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় নাই, যাহা আছে বলিয়া তাঁহার নিজের মনে হইয়াছিল, এবং আমাদেরও না হইয়া পারে না, তাহা যথার্থ নয়। কবিকল্পনার দিব্যআবেশকালে কোন সজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব থাকে না—কাব্যের যে ভাগটি স্বপ্ন, তাহা কবির জাগ্রত মনের রচনা নয়। মধুসূদন অতিশয় সজ্ঞানে বিশেষ বুদ্ধিসহকারে এবং অনেক হিসাব করিয়া, নিজের অভিপ্রায়মত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই, প্রতি পদে তাঁহার সেই জাগ্রত-চৈতন্যকে প্রতারিত করিয়া তলে তলে যে ভাবস্রোত বহিয়াছে, তাহাকে সজ্ঞানে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, থাকিলে—তিনি 'বৃত্রসংহারে'র মত একখানি রীতিমত মহাকাব্যই লিখিতেন, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র মত এতবড় একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। এই ছন্দের—এই সঙ্গীতের—কথাই আমি বার বার উল্লেখ করিয়াছি। এই যে সঙ্গীত ইহাতে দুইটি প্রধান সুরের সংযোজনা আছে—একটি রাবণ, অপরটি রাম। একটি ভ্রূক্ষেপহীন আত্মঘোষণার সুর, অপরটি তাহারই অবিচ্ছেদ্য বিসম্বাদী—অতিবিনীত আত্মসমর্পণের সুর। একটির পরিণাম হইয়াছে—ধ্বংস, অপরটির—উদ্ধার বা পরিত্রাণ; কাহিনীর বহিরঙ্গে ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। কবির সেই স্বপ্নের রূপক-রূপ ইহাই বটে। কিন্তু সে রূপকের অর্থ কি? আমাদের গভীরতর

রস-চেতনায় তাহার উত্তর সর্ব্বদাই মিলিয়া থাকে। 'মেঘনাদবধ' সমগ্র ভাবেও যেমন একটি অখণ্ড ভাবের অখণ্ড রূপক, তেমনই তাহার প্রতি অঙ্গেও সেই রূপকের ইঙ্গিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদের হত্যা-ঘটনাটি বাহিরের দিক দিয়া যে অর্থই বহন করুক, উহা কবির সেই স্বপ্নকেই একটি রূপক-রূপ দিয়াছে—এবং তাহাতে লক্ষ্মণই মরিয়াছে, ইন্দ্রজিৎ অমর হইয়া আছে; অর্থাৎ, তদ্দ্বারা মানুষের যৌবন-শক্তি ও তাহার যত কিছু মহিমা দেবশক্তি ও দেবভক্তির উপরে জয়ী হইয়াছে। আবার, রাবণ যখন তাহার সকল গৌরব সকল সম্পদ চিতানলে ভস্ম হইতে দেখিয়া শোকগম্ভীর কণ্ঠে অন্তর-বেদনা নিবেদন কবিতেছে, এবং তাহাতেই এই কাব্যের মানবভাগ্যকাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে—তখনও কবির স্বপ্ননিহিত সেই মানব-ভাগ্যের মহনীয়তাই ছন্দে ও সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। যে এমন করিয়া চাহিবার ও পাইবার শক্তি রাখে, তাহাকে আবার এমনই করিয়া সর্ব্বস্ব হারানোর দুঃখও সহ্য করিতে হয়; ইহাই মানুষের নিয়তি। প্রাণের বীর্য্যবলে জীবনকে জয় করিয়াও শেষে এই যে মৃত্যুবরণ—ইহা দেবতার অমরত্ব অপেক্ষাও অধিক গৌববেব। সেই সর্ব্বনাশের মুহূর্ত্তেও পুরুষ আত্মাপরাধের অনুশোচনায় অবসন্ন হইবে না, বরং ইহাই অনুভব করিবে যে—মানুষের পক্ষে দুজ্ঞেয় বলিয়াই যে শক্তি তাহার অজেয়, সেই শক্তির নিকটেই সে পরাস্ত হইয়াছে, এ পরাজয়ের জন্য দাযী সে নয।

মধুসূদনের রাবণ যেমন মহাকাব্যের নায়ক নয—তেমনই, ঠিক ট্র্যাজেডির নায়কও নয়, কারণ সে কাব্যে জয় বা পরাজয কোনটাই বড় হইতে পারে নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব সকল জয়-পরাজয়ের ঊর্দ্ধে,—নিয়তিনির্জ্জিত হইলেও মানুষ তাহার সকল ভুলভ্রান্তি শাস্তি-পুবস্কার সত্ত্বেও বড়। দেবতারাও স্বাধীন নয়—তাহারাও ভয়গ্রস্ত, অথবা মানুষের ভক্তি বা অভক্তি-প্রণোদিত রাগদ্বেষের অধীন। মধুসূদন তাঁহার দেবদেবীগণকেও মানুষের তুলনায় ক্ষুদ্র করিযাছেন—এইখানে হিন্দুপুরাণ অপেক্ষা গ্রীকপুরাণ তাঁহার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এ সকল কথা আমি অন্যত্র ('কবি-শ্রীমধুসূদন'-গ্রন্থে) সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি, এখানে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমি কেবল এই একটি কথাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, কবি মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম সে যুগের সেই অপূর্ব্ব উৎকণ্ঠাকে—নব্য বাংলাসাহিত্যের সঞ্জীবনীশক্তিরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন—সেই অন্তর্গূঢ় মুক্তিপিপাসাকে জাতির রসচেতনার গোচর করিয়াছিলেন। সেকালের পাঠকমণ্ডলী এই কাব্যপাঠকালে তাহাদের অন্তরের অন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছিল তাহাতে ওই কাহিনীটাই বড় হইয়া উঠে নাই; তাহার সেই সুরই তাহাদিগকে তৃপ্ত করিয়াছিল। সে কাহিনী রাম-রাবণের কাহিনী নয়—সে

এক গূঢ়তর প্রাণধর্ম্মের কাহিনী, সে এক নূতনতর আবেগ—বৃহত্তর স্ফূর্ত্তির অনুপ্রাণনা। সে কাব্যের নায়ক রামরূপী দেবতা নয়—রাবণরূপী মানুষ; ইহাই যদি তাহারা অনুভব না করিত, তবে মধুসূদনের রামায়ণ-বিমুখতা তাহারা ক্ষমা করিত না।

আমি বলিয়াছি, 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সর্ব্বত্র সেই এক ভাবের এক সুর নানা রূপক আশ্রয় করিয়া লুকাচুরি খেলিয়াছে,—এখানে ইহার একটি মাত্র উদাহরণ দিব; তাহাতে দেখা যাইবে, কবির ভাবস্বপ্নের সেই অবচেতন অনুভূতি কাব্য-কাহিনীর বহিরঙ্গে কেমন কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র প্রথম সর্গেই যে এইরূপ একটি তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাও লক্ষণীয়। এই পংক্তিগুলি আমি অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি—কারণ, ভাবের উদ্দীপনায় ছন্দের মাধুর্য্যে ও ভাষার প্রকাশনৈপুণ্যে ইহা মধুসূদনের কবিশক্তির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনও বটে। এখানে "শিলাবন্ধে বন্দী" সিন্ধুর উদ্দেশে রাবণ বলিতেছে—

> কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
> প্রচেতঃ! হা ধিক ওহে জলদলপতি!
> এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
> তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ
> রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
> কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
> প্রভঞ্জন-বৈরি তুমি; প্রভঞ্জনসম
> ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
> পর কোন পাপে? অধম ভালুকে
> শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
> কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
> বীতংসে? এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
> শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-স্বামী,
> কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,
> কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
> উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি
> দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
> ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।

কাব্যের বহিরঙ্গে কাহিনীগত কল্পনার প্রয়োজনে এ বাণী রাবণের মুখে সুন্দর হইয়াছে—কিন্তু ইহার অন্তরালে কবির সেই স্বপ্নাবেশের ভাবাবেগ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাই ইহা একটি রূপকও বটে। সে রূপকের অর্থ কি? ওই সিন্ধুকেই যদি মানুষের 'অলঙ্ঘ্য অজেয়' প্রাণসাগর বলিয়া বুঝি, তবে ওই শৃঙ্খল যে কিসের শৃঙ্খল, এবং 'বীরবলে সেই জাঙাল ভাঙিবার' অর্থ কি, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমন কোন্ যাদুকর আছে যে কেশরীকে ভালুকের মত দড়িতে বাঁধিয়া তামাসা দেখাইবে? সমগ্র 'মেঘনাদবধ-

কাব্যে'র মূল সুর ইহাই। মধুসূদন সেই যুগের যুগন্ধর কবিরূপে তাঁহার দিব্যপ্রতিভায় এই বাণীমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহারই বলে তিনি বাংলা কাব্যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার পরবর্ত্তী দুই মহাকবিই তাঁহার সম্বন্ধে যে দুইটি উক্তি করিয়াছিলেন তাহা যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনই নিঃসন্দিগ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি যেন আমার এই আলোচনারই প্রতিপাদ্য—

কাল প্রসন্ন, ইয়ুরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ—"শ্রীমধুসূদন"।

—ইহাও যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ, জাতির নবজাগরণ বা যুগোচিত সাধনাই ছিল যাঁহার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, ইহা তাঁহারই উক্তি, তেমনই, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চরমোৎকর্ষই যাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি, সেই রবীন্দ্রনাথও মধুসূদন সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—

একদিন বঙ্গসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল।...মেঘনাদবধ-কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

—'সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা' যে সে যুগের কোন্ মন্ত্রের সাধনা, আমি এই প্রবন্ধে তাহারই যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। মধুসূদন যে কত বড় কবি তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিভার সহিত সেই যুগের সম্বন্ধটি আরও ভাল করিয়া না জানিলে তাঁহার ভিতরকার সেই কবি-পুরুষটিকে সম্যক চিনিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাব-বিপ্লব—বিভিন্ন ধারা : নব মানব-ধর্ম্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র

এই যে নূতন জীবন-দর্শন—শতাব্দীর আদিতে যাহার সূচনা, শতাব্দীর শেষভাগে সেই দর্শনের যাহা কিছু সুফল তাহাই আমাদের সাহিত্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাব ও ভাবনায় অতঃপর যে সৃষ্টিশক্তি যুক্ত হইল তাহারই বলে সেই যুগধর্ম্মের আবেগ একটি পূর্ণমণ্ডল রচনা করিয়া সঞ্জীবনী বাণীরূপে স্থিতিলাভ করিল। কিন্তু সে আলোচনার পূর্ব্বে একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে।

আমার এই আলোচনা মুখ্যতঃ সাহিত্যিক, নতুবা দেখা যাইত কত রূপে ও কত দিকে এই যুগ-ধর্ম্মের লক্ষণ সেকালে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনেও যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমনই, ইহার প্রভাব অল্প অনুভূত হয় নাই। আমাদের জীবনে যেটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল—এখনও আছে, তাহা অধ্যাত্ম জীবনের—মোক্ষমার্গের ; এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সমাজের বিধি-বিধানের মূলে—মুখ্যভাবে না হইলেও, গৌণভাবে—যে বেত্রদণ্ড উদ্যত ছিল তাহাতে মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিও যেমন পথ পাইত না, তেমনই তাহার পৌরুষও পদে পদে খণ্ডিত হইত—ব্যক্তিরই স্বাধীন কর্ম্মে তাহা চরিতার্থ হইতে পারিত না। এই অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সে-যুগের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী কবি যে আদর্শ-সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এই যুগপ্রবৃত্তির একটা লক্ষণ অতিশয় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন—

> —যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
> দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
> অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
> যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
> বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
> পৌরুষেরে করে নি শতধা,—

—ইহাই ছিল বিদ্রোহের আত্মসচেতন দিক। সামাজিক কল্যাণকেও ব্যক্তির ব্যক্তিগত আদর্শের অনুগত করিয়া লওয়ার এই যে আকাঙ্ক্ষা, ইহার বীজও সেই যুগপ্রবৃত্তির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সমাজ-চেতনার সহিত ব্যক্তি-চেতনার এই যে বৈষম্য, ইহারই ফলে বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে পলিটিক্যাল মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ

হইয়াছিল, তাহাতেও দেশ-কাল-পাত্রের ভাবনা ছিল না; ব্যক্তির মুক্তি-পিপাসাই জাতীয়তার জবানিতে অসাধ্য-সাধনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এবং তাহাতে আমরা অকাল-জাগরিত পুরুষের আত্মাহুতির নিদারুণ পরিণামই লক্ষ্য করিয়াছি। সমাজের সহিত ব্যক্তির একাত্মতা আজিও ঘটে নাই—অতএব আমাদের জীবনে নবযুগের সেই নবধর্ম্ম, সেই মানবত্ব-বোধ—পূর্ণ-সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই, বিকারগ্রস্ত হইয়া শেষে বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। সে কথা এখন নয়; তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে সে যুগের এই প্রবৃত্তি ও তাহার প্রচ্ছন্ন ক্রিয়ার ক্রমপরিণাম বুঝিয়া লইতে হইবে—তাহাতেই দেখা যাইবে, কোন্ সঙ্কটনিবারণকল্পে তাঁহার সেই প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল—জাতির ভবিষ্যৎ পন্থা-নির্দ্দেশে তাঁহার সেই বাণী এখনও কি অর্থে কতখানি সত্য হইয়া আছে ও থাকিবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি নবযুগের সেই যুগধর্ম্মকে মানবধর্ম্ম নাম দিয়াছি, এবং তাহার অন্তর্গূঢ় আবেগ মধুসূদনের কাব্যচ্ছন্দে কিরূপ পূর্ণ-প্রকাশ হইয়াছে তাহাই দেখাইয়াছি। কিন্তু মধুসূদনের শক্তি ছিল যেন elemental—ঝড়ের মত, সাগরোর্ম্মি-প্রবাহের মত; যেমন দুর্দ্দম, তেমনই সহজ-সরল, ভাবনা-চিন্তার কোন দ্বন্দ্বই তাহাতে ছিল না। পশ্চিমের শিক্ষার প্রভাবেই হউক, বা যুগধর্ম্মের বশেই হউক—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও এইকালে যে নূতন মানবত্ববোধের উন্মেষ হইয়াছিল কবি মধুসূদনই আমাদের সাহিত্যে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম অসঙ্কোচে ও অনবদ্যরূপে প্রকাশিত করিলেন। আমরা দেখিলাম, এতদিনে এ ভাব জাতির প্রাণমূলে পৌঁছিয়াছে—কারণ কবিই যুগ ও জাতির যথার্থ প্রতিনিধি। অতএব আমাদের সাহিত্যে নূতন জীবনমন্ত্রের ঘোষণা হইয়া গেল—সে নূতনের আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা-সংশয় আর রহিল না। মধুসূদনের কাব্যে সেই নূতনের আবির্ভাবকে বন্দনা করিতে হইলে আর এক কবির ভাষাই যথার্থ—

> এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেগ-হিল্লোলে
> পুষ্পদল চুমি,
> এবার আস নি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে
> ধন্য ধন্য তুমি!
> রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
> গর্ব্বিত নির্ভয়,
> বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম—
> জয় তব জয়!
> হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
> সহজ প্রবল!

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণ-পুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

—নব্য বাংলা সাহিত্যে নবযুগের বোধন ঠিক এমনই সুরে সম্পন্ন হইয়াছিল, মধুসূদনের কাল পর্য্যন্ত এমনই একটা নূতনের প্রবল প্রেরণা ভাবে, কর্ম্মে ও চিন্তায় এ জাতির জীবনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তখন একটা নূতন পথে যাত্রার ব্যাকুলতা—অন্তরের অন্তরে কেবল বন্ধনছেদনের অধীরতাই প্রবল। ইহার পরে সেই অধীরতা—'ইয়ং-বেঙ্গলে'র সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা—অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইলেও, প্রতিক্রিয়া-মুখে এক নূতন ব্যাধির লক্ষণ ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার গূঢ়তর প্রভাবেই মনের মধ্যে একটা বড় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার উল্লেখ করিয়াছি এইখানেই তাহার অঙ্কুর। একদিকে সমাজ একটা বিরাট অচলায়তন হইয়া ব্যক্তির শ্বাস রোধ করিতেছে, অপর দিকে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত গতি-পথ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তি মন্ত্রে আকর্ষণ করিতেছে। এ পথ একরূপ মুক্তিপথই বটে, তখন মুক্তির আশ্বাসই বড় আশ্বাস; অধিক ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তখন কোথায়? বাঙালীর প্রাণ নিছক চিন্তাবিলাস অথবা ভাবের উন্মাদনায় অতি সহজেই তৃপ্তিলাভ করে, তাই তত্ত্বের সত্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভাবাবেগ তাহাকে বিচলিত করিল, এবং জীবনের ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম্মের আদর্শহিসাবেও এই মুক্তিমন্ত্র বরণীয় হইয়া উঠিল। তথাপি সংশয় ঘুচিল না, বরং তাহার সমাধান-চেষ্টা ভিতরে ভিতরে আরও বাড়িয়া উঠিল। রামমোহনে যাহা প্রধানতঃ বিচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা সেবা-ধর্ম্মের আবরণে কতকটা আবৃত ছিল, এবং মধুসূদনে যাহা নিরুপদ্রব রসসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল,—কোনখানে সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করে নাই, তাহাই এক্ষণে গুরুতর সমস্যারূপে ব্যক্তির চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে; শুধুই মানবধর্ম্ম নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারূপে এক নূতন প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে। এইবার সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে, নবযুগের সেই নবধর্ম্মের—মানবধর্ম্মেরই—কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হইল। মনুষ্যজীবনের অর্থ কি? মানুষের জ্ঞানে সত্যের ধারণা সম্ভব কি না? লোকহিতের আদর্শ কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে? সমাজের মুখাপেক্ষিতা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর আবশ্যক? ব্যক্তির যে স্বাধীনতা—মানুষের যাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব নাই, তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক

জীবনের আপোস আদৌ সম্ভব কি না? নূতন মানব-ধর্ম্মের যে উদার ভাবাবেগ, মানুষের হৃদয়-মনের শক্তি সম্বন্ধে যে অপরিমিত আশ্বাস—তাহার প্রেরণা ও উল্লাস এমনই নানা চিন্তায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; ব্যক্তি-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের মধ্যে যে সঙ্গতির প্রয়োজন, তাহার উপায়-সন্ধানে সেকালের ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিবার কারণ—ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধের উগ্রতা; এবং ইহারও কারণ বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশীয় সমাজের সেই অবনত অবস্থার প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতার উদ্রেক। ব্যক্তির মত জাতিও স্বকর্ম্মফলভুক্—সমাজের পাপ ও ব্যক্তির পাপ, সে পাপকে অস্বীকার করিয়া নিজের স্বতন্ত্র মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা বলিয়াই নিষ্ফল হইতে বাধ্য। ইহার একমাত্র ঔষধ ওই মানবত্বকেই একটা খুব বড় তত্ত্বের উপরে স্থাপন করা—সকল পাপ হজম করিবার মত ধ্যান, জ্ঞান ও হৃদয়-বলের সাধনা। এত বড় প্রতিভাব তখনও আবির্ভাব হয় নাই—সাহিত্যেও যে সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনেও তাহা তেমনই একটা কঠিন দ্বিধা-সঙ্কটরূপে যুগ-প্রতিনিধিস্থানীয় বহু ব্যক্তিকে বিপন্ন করিয়াছিল। কেহ সমাজ-সংস্কার, কেহ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, কেহ নাস্তিক-মনোভাব, কেহ বা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে কূল না পাইয়া একরূপ ঔদাসীন্য—প্রভৃতি নানা ভাব ও অভাবমূলক নীতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর নব জাগরিত ব্যক্তি-মানসে সেই যুগ-প্রবৃত্তিই একটা গভীরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই চাঞ্চল্যের বহিঃপ্রকাশ যে কত রূপে হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক-গুলিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের গুরুতর অভিব্যক্তি ও তাহার নিগূঢ় কারণ জানিতে হইলে একটু ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে।

চাঞ্চল্যের একটা বড় কারণ নিশ্চয় এই যে, ওই নূতন মানব-ধর্ম্মের প্রেরণা সার্ব্ব-ভৌমিক হইলেও, এ জাতির সাধনায় তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে তাহার রক্তগত সংস্কারের অনুকূল করিতে হইবে, এদেশের জল-মাটিতেই তাহাকে রোপণ করিতে হইবে। প্রাণের নির্জ্জীবতা দূর করিবার পক্ষে এমন রসায়ন আর নাই, শুধু রসায়ন নয়, ইহা স্বর্ণঘটিত সালসাই বটে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানবত্বের এই মহিমাবোধই—সমগ্র জগতে মানবজাতির নব-জাগরণ, মানবেতিহাসে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে, ইহার ফলেই মধ্যযুগের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য এই যে, তাহার একটা অতি প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতির ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই, যখনই কোন নূতন ভাব-চিন্তা বা নবধর্ম্মের আঘাতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তখনই সে তাহার সেই চিরন্তন সংস্কৃতি স্মরণ করে; নূতনকে পুরাতনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যুগ-ধর্ম্মকেও সনাতনের সঙ্গে মিলাইয়া, তবে সে তাহার সঙ্গে রফা করিয়া থাকে। এবারেও

সে যতক্ষণ না এই নূতন মানুষকে ও তাহার নূতনতর মহিমাকে সেই পুরাতন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারিয়াছে, ততক্ষণ সে তাহাকে অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করে নাই—তাহার পূর্ণ-জাগরণে বাধা ঘটিয়াছে। এই নূতন মানবধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে য়ুরোপীয় সংস্কার ক্রমেই উন্মুখ হইয়া উঠিল, তাহা ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী; তথাপি এই বিজাতীয় সংস্কার আর সকলের উপরে জয়ী হইবার উপক্রম করিল। আমি অতঃপর তাহার কথাই বলিব।

এই যে মানবত্বের গৌরব-বোধ বা 'মানব-দেব'-বাদ—ইহার অতি সহজ ও স্বাভাবিক প্রেরণায় মানুষের যে আত্মস্ফূর্ত্তি বা আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাতে তাহার চিত্তের কার্পণ্য-দোষ বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূর হয়, আপন প্রাণশক্তির অসীম সাহসে সে পাপ; ও মৃত্যু দুইকেই জয় করিতে পারে। ইহারই নাম—মানুষ কর্ত্তৃক স্বমহিমার উপলব্ধি মধুসূদন ইহারই প্রেরণায়—সেই মুক্তিকল্পনার আবেগে—তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যুগ যে কারণে মহাকাব্যের যুগ নয়, সেই কারণে, এই ধরণের আত্ম-স্ফূর্ত্তিও এ যুগে সম্ভব নয়। মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়—এই বোধ যেমন জাগিয়াছিল, তেমনই নবলব্ধ বিদ্যারাজি তাহার মনুষ্যত্বকে পরিবর্দ্ধিত না করিয়া আত্মাভিমান বা অহঙ্কারকেই পুষ্ট করিতে লাগিল,—আত্ম-প্রসারের পরিবর্ত্তে আত্ম-সঙ্কোচের হেতু হইল; প্রাণের শক্তি অপেক্ষা মনের স্পর্দ্ধা বাড়িল, গ্রহণ অপেক্ষা বর্জ্জনই শ্রেয়তর হইয়া উঠিল। এক কথায় প্রাণ-বীর্য্যের উপরে মনোধর্ম্ম—মানব-ধর্ম্মের উপরে ব্যক্তি-ধর্ম্ম—জয়ী হইতে চলিল। ইহার ফলে, মনুষ্যজীবন বা মনুষ্যহৃদয়-সম্পর্কিত সর্ব্ববিষয়ে আর সেই বিস্ময়, শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি রহিল না, বরং পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, শ্লীল-অশ্লীল, ভব্য-অভব্য প্রভৃতির সম্বন্ধে এক নূতন বিবেক-বুদ্ধি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। এই বিবেক-বুদ্ধি আর কিছুই নয়—ইহাও সেই আত্মাভিমান-প্রসূত এক প্রকার মানস-ব্যাধি। বলা বাহুল্য, এই morality-সংস্কার জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী, তথাপি সে যুগের প্রায় সকল মনীষী ও কর্ষিত-চিত্ত মানুষ এই সংস্কারের অল্পাধিক বশীভূত হইয়াছিলেন। এক দাসত্বের বদলে আর এক দাসত্ব গৌরব-জনক হইয়া উঠিল—যাহারা শাস্ত্র-বাক্য বা আপ্তবাক্যের শাসন মানিল না, তাহারাই অতি সঙ্কীর্ণ অহংবুদ্ধির দাসত্ব করিয়া আত্মার মর্য্যাদা-রক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল। এই যে সংস্কার—ইহার জন্য যুগপ্রবৃত্তিই দায়ী নয়, ইহা সেই প্রবৃত্তির একটা বিকার; ইংরেজী শিক্ষার অন্তর্গত খ্রীষ্টানী বা সেমিটিক থিয়লজি, পাপ-বাদ বা দেহ-আত্মার বিরোধবাদ হইতেই ইহা সংক্রামিত হইয়াছিল। সত্য-মিথ্যা, হিতাহিত, নীতি ও দুর্নীতির একটা নূতন মাপকাটি সহসা কুড়াইয়া পাইয়া, নব্যশিক্ষিত-সম্প্রদায়—সে যুগের নেতৃস্থানীয়গণ—পরমোৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন;—সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার একটা

গোঁয়ার্ত্তুমি তাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী বহু সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল—এমনই রুচি-বায়ু ও শুচিবায়ুগ্রস্ত হইল যে, মানুষহিসাবেই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর রহিল না; তাহার দেহ ও মন—দুইই ধোপা-কাচা করিয়া না লইলে, তাহার ভাষার গ্রাম্যতা-দোষ দূর না হইলে, তাহাকে দূর হইতে কৃপার চক্ষে দেখা ভিন্ন আর কিছু করা চলে না। এই কারণে মানব-ধর্ম্মকেই জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া বড়ই আবশ্যক হইল। সে ধর্ম্মের মুখ্য অভিপ্রায় ওই দেহ-মনের পরিচ্ছন্নতা-সাধন; এজন্য তাহাতেও, ভগবৎ-সাধনার যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—তাহাকে গৌণ করিয়া ওই morality-ই মুখ্য হইয়া উঠিল। এক বিষয়ে সে ধর্ম্মও যুগপ্রবৃত্তির অনুকূল, কারণ তাহাতে কোন মিষ্টিক-সাধনার স্থান নাই—মানুষেরই স্বার্থ বা বুদ্ধি-নির্দ্ধারিত কল্যাণ একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া বরণীয় হইয়াছিল; ভগবানকেও মানুষের উপাস্য হইতে হইলে, তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হিতাহিত ভাবনার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নতি-দুর্নীতি-সংস্কারের অধীন হইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে। এই আদর্শের ঘোষণা আজিও থামে নাই; কিছুকাল পূর্ব্বেও এক বিজ্ঞানীবাদী ধর্ম্মবীর এইরূপ ভাষায় তাঁহার মানব-ধর্ম্মের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন—

> **No priest can lead us by the nose and make us believe in meaningless practices which profit no one but the professional priest. Free thought will be the watchword of the churches of the future...Religion will not be a theorem, a Q. E. D but a problem, Q. E. F.**

—ভাষা ইংরেজী বলিয়া কেমন পৌরুষপূর্ণ হইয়াছে! কথাগুলিতে নূতন কিছুই নাই, তথাপি উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, একজন হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এই কথাগুলিই উদ্ধৃত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা মূল্যহীন নয়। তিনি লিখিয়াছেন—"The last sentence is like the rest obscure, but perhaps indicates the workings of the pragmatic bacillus even in the East." আমিও রামমোহনের ধর্ম্মতত্ত্বে এই "pragmatic bacillus" থাকার কথাই পূর্ব্বে ভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করিয়াছি।

সে যুগের সেই নবধর্ম্ম-প্রেরণা অবশেষে এমনই একটা বিপথে পড়িয়া তাহার সেই আদি-প্রবৃত্তির উদারতা ও প্রাণময়তা হারাইতে বসিয়াছিল। যে বিদ্রোহ মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি-কামনায়, কবির কল্পনা ও কর্ম্মীর সমাজ-সেবায় এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সে সরল গতি আর রহিল না, মনোধর্ম্মের সহিত হৃদয়ধর্ম্মের বিরোধ বাধিল, তাহার ফলে, মানুষের স্বাধীনতা-গৌরব সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—ব্যক্তির সহিত সমাজের, স্বাতন্ত্র্য-পন্থার সহিত লোক-সংগ্রহের, morality-র সহিত,

সর্ব্বভূতহিতের সমন্বয়সাধনে বড়ই বাধা উপস্থিত হইল। একটা তত্ত্বের যুক্তিমাত্রকে বন্ধনরজ্জু করিয়া, তাহারই সাহায্যে দল-বাঁধা—সেও যেমন মানুষকেই ছোট করা, তেমনই সমাজের সহিত কোনরূপ সত্য-বিশ্বাসের যোগ না রাখিয়া সকল বিশ্বাস সকল মতবাদ পরিহার করিয়া স্বাতন্ত্র্য-সুখ ভোগ করা—সেও একরূপ আত্মহত্যা। এমনই একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কট ক্রমে দেখা দিয়াছিল, নাস্তিকতাই একটা উচ্চাঙ্গের নীতি হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই কালেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। যুগপ্রবৃত্তির সকল লক্ষণ—তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া—তখন চারিদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার; বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবসেবা; অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা; আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ ও মানবপূজার মন্ত্রজপ; —এক দিকে এতগুলি পন্থা, এবং অপর দিকে কবি মধুসূদনের কাব্যচ্ছন্দে মানবগৌরব-গীতির ভেরী রব—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আসর যেন সুসজ্জিত হইয়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুগেরই সন্তান—নব মানব-ধর্ম্মের মন্ত্র তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হওয়া দূরে থাক, সেই মন্ত্রই তাঁহাকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করিয়াছিল যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—তিনিই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সেই মন্ত্রকে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই সেই মন্ত্রকে মন্ত্রদ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—বুঝিযাছিলেন যে, নবযুগের ধর্ম্ম এই মানবধর্ম্মই বটে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের উপরেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নির্ভর করে; জাগরণের মন্ত্র ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য-দেবতার সেই সুমহান্ মূর্ত্তিকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে—অন্ধের হস্তী-দর্শন-প্রণালীতে—দেখিবার উদ্যমই যত গোল বাধাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও প্রথমে একটু অধিক মাত্রায় morality ও মানস-পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার শাসন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই—যদিও এক উদারতর ও গভীরতর নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য-সাধনও করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটি যে বড় তত্ত্ব তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামীগণের পন্থাবিশেষ হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব তাঁহার সর্ব্বচিন্তার মূলে চিরদিন বিদ্যমান ছিল, তাহারই অনুচিন্তনে ও একাগ্র ধ্যানে তিনি মানবজীবনের মহত্ত্ব ও সদর্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলেন।

এই তত্ত্বটির নাম—মানব-প্রীতি। কবে কেমন করিয়া ইহার বীজ তাঁহার অন্তরে এমন গভীর-প্রবেশ লাভ করিযাছিল সে সংবাদ আমাদের জানা নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত আজিও লিখিত হয় নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। এই মানব-প্রীতি প্রথমে যে-রূপে তাঁহার চিত্তে ধরা দিয়াছিল এবং শেষে

তাহা যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছিল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার সেই ক্রমোন্মেষের কাহিনীই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার বিকাশ-কাহিনীর সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে ; এই তত্ত্বকেই শেষে পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি প্রথম বয়সেই ফরাসী দার্শনিক আগুস্ত কোঁৎ-(Auguste Comte)-এর Positivism বা বিজ্ঞানসম্মত মানব-সেবা-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি মনুষ্য-ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্য-জাতির কল্যাণকে—ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরবকে উচ্চতর সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসই ছিল তাঁহার জন্মগত (বা জন্মান্তরীণ) সংস্কার—তাঁহার প্রতিভার মতই প্রাক্তন সম্পদ। ইহারই প্রেরণায় তিনি নবযুগের সেই নূতন প্রবৃত্তিকে একটি পূর্ণ ও সার্থক রূপ দিতে পারিয়াছিলেন—ইহারই প্রেরণায়, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তথা বাঙালীর সংস্কৃতিতে জীবন-সাধনার এক নূতন তন্ত্র—রসে-রূপে, চিন্তায় ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে—দশভুজা মূর্ত্তির মত সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই তত্ত্বের সজ্ঞান আশ্রয় যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেকালের হিন্দু-শিক্ষাদীক্ষায় বা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে য়ুরোপীয় শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—অন্ততঃ তাহার একটা বিশেষ গুণের পক্ষপাতী ছিলেন—সে পক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। য়ুরোপীয় বিদ্যা ও সেই বিদ্যাজনিত পাণ্ডিত্য-সংস্কারের নানা দোষ লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলেও, তিনি তাহার প্রভাব কখনও কাটাইতে পারেন নাই, বোধ হয় চাহেনও নাই ; বরং সেই প্রভাবকে বিদ্রূপ করার ছলে তিনি যেন নিজেকেই বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মগত সংস্কার যেমনই হউক, তাঁহার সজ্ঞান ভাব-চিন্তার যাহা কিছু মৌলিকতা তাহার মূলে ছিল নবযুগের নূতন মনোভাব, এবং তাহা যে কতখানি ওই ইংরেজী শিক্ষার ফল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। এই মনোভাবই জাতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যোগে তাঁহার প্রতিভাকে এমন সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল।

আমরা দেখিয়াছি, মানবধর্ম্মের এক অভিনব প্রেরণাই এই যুগধর্ম্ম বা আধুনিকতার নিদান। এই যুগে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সহিত প্রকৃতি-বাদ যুক্ত হইয়া—মানুষকে তাহার শক্তি ও নিয়তি সম্বন্ধে একটা নূতনতর চেতনায় সচেতন করিয়া তুলিল। ইহাও দেখিয়াছি, যাহা প্রথমে প্রাণমনের প্রবল আকৃতিরূপেই একটা বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল—তাহাই শেষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহাকে প্রবল করিয়া, ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, এবং জীবনেও, নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও কর্ম্মজিজ্ঞাসাকে

যেমন উন্মুখ করিয়াছিল, তেমনই মনুষ্যত্বের উদার আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। শেষে ব্যক্তি ও সমাজের সেই চিরন্তন বিরোধই নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল— মনুষ্যত্বের মহিমা নয়, তাহার তলদেশের পঙ্করূপ দুর্ব্বলতাই নূতন ছদ্মে আত্মপ্রকাশ করিল। সেকালের হিন্দু-সমাজের ঘোরতর অবনতিও ইহার একটি কারণ বটে। সেমিটিক theology ও খ্রীষ্টিয়ান ethics তাহাতে বড় সুবিধা পাইল; সেই স্বনুষ্ঠিত বিধর্ম্মের চাপে স্বধর্ম্ম এমনই পীড়িত হইয়া উঠিল যে, মানব-সেবার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক শুচিতা-রক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল—জনহিতার্থে আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উন্নত স্বার্থবুদ্ধিই সংযমশীলতা ও চারিত্রের নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল। আসল কথা, নূতন মানব-ধর্ম্মের বিকৃত রূপ দাঁড়াইল—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বসাধন; ওই 'morality'র তত্ত্বই আর সকল তত্ত্বকে গৌণ করিয়া, মনুষ্য জীবনের গভীরতর রহস্যকে, মানব-নিয়তির বিরাট মহিমাকে, অস্বীকার করিতে চাহিল। মানুষের আত্মার যে অন্তহীন সদ্‌গতিকে বিশ্বাস করিয়া এক মহামনীষী বলিয়াছিলেন—"The soul may be trusted to the end," আমাদের দেশে সেকালের শিক্ষিত-সমাজে তাহার বিপরীত বিশ্বাসই যেন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিল!

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই এই তন্ত্রের সঙ্কীর্ণতা, এবং তত্ত্বহিসাবেও ইহার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের মহিমা তাঁহাকে যেভাবে যতখানি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল—তেমন বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও করে নাই। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি যে মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাও যেমন মানুষেরই মহিমময় মূর্ত্তি, তেমনই, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে—বাংলা সাহিত্যের সেই অতুলনীয় কাব্যকীর্ত্তিগুলিতেও—তিনি মানুষের সেই অভাবনীয় নিয়তিকেই, তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিই এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-রস-রসিক কবিশিল্পী; তাঁহারই স্রষ্টাসুলভ কবিদৃষ্টিতে—কাম ও প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, চরিত্র-নীতি ও প্রাণধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত—এক বৃহত্তর সত্যের আশ্রয়ে পাশাপাশি স্থানলাভ করিয়াছে। তিনি মানব-প্রীতি ও চরিত্র-নীতি এই দুইয়েরই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইয়া, যত কিছু ব্যর্থতা ও সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও, মানুষের মহিমাকে আধুনিক যুগধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক দিকে মধুসূদনের সেই আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত প্রকৃতি-ধর্ম্ম—বিশুদ্ধ জীবনবাদের জয়ঘোষণা, এবং অপর দিকে, দেহের বিরুদ্ধে মনের আক্রোশ এবং তজ্জনিত চরিত্র-চর্য্যার অন্ধ আগ্রহ—এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছিল; এমন কি, ঠিক সেই কালে—মানুষ-মাত্রেই পাপী, অনুতাপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তাহার উদ্ধারের অন্য উপায় নাই—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরি॥

—এইরূপ ত্রাণ-মন্ত্রের যে প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও স্বীকার করিয়া তিনি মানুষের যে মহত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে কোন তত্ত্বকে তত্ত্বহিসাবেই প্রধান হইতে দেন নাই; কারণ, মানুষের জীবন সকল তত্ত্বের উপরে, তাহারই অসীম রহস্যপুরীর দ্বার-উন্মোচনে যাহার যেটুকু সামর্থ্য সেইটুকুই তাহার সার্থকতা; সকল তত্ত্বই মূলতত্ত্বে আরোহণ করিবার সোপান—বিশাল জীবনরথবর্ত্মের চক্রক্ষুণ্ণ গতি-রেখা। তাই জীবনকেই তিনি তত্ত্বের প্রামাণ্য করিয়াছেন, তত্ত্বকে জীবনের প্রামাণ্য করেন নাই।

সকল উৎকৃষ্ট প্রতিভাই সৃষ্টি-প্রতিভা, এবং সমন্বয়সাধনের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাতেও সেই সমন্বয়-প্রেরণাই লক্ষণীয়। যাহা এই নবযুগের নূতন সত্যরূপে প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে, তাহার প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধাও তিনি যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, তেমনই, তাঁহার মজ্জাগত জাতীয় (national) সংস্কার—চেতনা-গহনের যেন সেই প্রাক্তন 'বাসনা'—এই যুগ-প্রবৃত্তির সহিত বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিল। সেই ভারতীয় সংস্কারে—যাহা সত্য তাহা নিত্যও বটে; যুগকে বরণ করিতে হইলে তাহাকে চিরযুগের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে হইবে; যে-সত্যের মূল নাই তাহাকে বিশ্বাস কি? বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগ-সত্যকে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের সনাতন সত্যের সহিত তাহার বিরোধ মিটাইয়া। এই 'সনাতন' শব্দটির অধুনা বড়ই কুখ্যাতি হইয়াছে, উচ্চারণ করাও একটা অপরাধ। কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়াই এ প্রসঙ্গে ইহার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এ বিষয়ে যাহা বলিব তাহা লেখকের ধর্ম্মমত মনে করিয়া কেহ যেন কৃপাপরবশ না হন,—আমি ইতিপূর্ব্বে যেমন যুগ-ধর্ম্মের ওকালতি করিয়াছি, এক্ষণে তেমনই অপর পক্ষের ওকালতি করিব; আমার নিজস্ব মতামত কি, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে জানিবার বা জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই, সে কথা সম্পূর্ণ অবান্তর। পূর্ব্বে আমি যে যুগ-সমস্যা বা জ্ঞানসঙ্কটের উল্লেখ করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় তাহার যে সমাধানচেষ্টা আছে, তাহাই বুঝিবার জন্য ভারতের বিশিষ্ট সাধনা সম্বন্ধে, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এইখানে কিছু বলিব, নহিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। অতএব পাঠকগণকে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে।

ভারতীয় চেতনা বলিয়া যে একটি বিশিষ্ট চেতনা আছে এবং তাহারই একটি যে অবিচ্ছিন্ন ধারা স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে, তদন্তর্গত সাধনা ও সিদ্ধিকেই আমি 'সনাতন' নাম দিব। ইংরেজীতে "Universal Principle" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও এক অর্থে 'সনাতন' বটে, কিন্তু যখন তাহা 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ মানুষের সমাজ ও মনুষ্যজীবনের আশ্রয়রূপে মানুষেরই সাধনযোগ্য নিঃশ্রেয়স-রূপে একটা অব্যভিচারী তত্ত্ব হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা কেবল "Universal Principle" নয়, মানুষের জীবন-সম্পর্কিত একটা ব্যবহারিক সত্যও বটে; সে তখন কালের ধারায়, রূপ

হইতে রূপান্তরে, আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব হইতে ইহা স্বতন্ত্র—কারণ, ইহা তখন একরূপ জ্ঞানের বিষয়মাত্র নয়, মানুষের যাবতীয় জীবন-সাধনায় যুক্ত হইয়া ইহা তখন 'ধর্ম্ম' হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেই 'সনাতন'কে এমন করিয়া জীবনের রথে বাঁধিয়া সুদীর্ঘ যাত্রাপথ নিঃসংশয়ে অতিবাহন করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই; তাই 'সনাতন' কথাটার শুধুই তর্কগত নয়, একটা ইতিহাসগত তাৎপর্য্যও আছে। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে, যুগবিশেষের ধর্ম্ম যতই স্বতন্ত্র হউক, তাহার সেই স্বাতন্ত্র্যও এই সনাতনের ধারাক্রমিক একটা তরঙ্গ মাত্র। যুগধর্ম্মরূপ তরঙ্গে আরোহণ করিয়া কোনও জাতি বা সমাজ সনাতনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেও পারে; সে জাতি যুগপ্রবৃত্তিকেই তাহার জীবন সমর্পণ করিয়া, যুগের সঙ্গে সঙ্গেই কালের স্রোতে বিলীন হয়, সকলে তাহাই হইয়াছে। ও-দেশের সাহিত্যে একটি সুন্দর কবি-প্রসিদ্ধি আছে, এখানে তাহার গূঢ় অর্থটি কাজে লাগিবে। মহাকালের বিশাল বালুকাময় প্রান্তরে যুগ-রূপিণী Sphinx-রাক্ষসী বার বার পথিকের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার স্বরচিত সমস্যা পূরণ করিতে না পারিলে পথিকের প্রাণ সংহার করে;—অর্থাৎ সেই পথিক-রূপী জাতিকে যুগকবলিত হইতে হয়। এখানে সেই সমস্যা আর কিছু নয়—যুগপ্রবৃত্তিকে সনাতনের সঙ্গে সমন্বিত করিয়া লওয়ার সমস্যা; যে জাতি তাহা পারে না, তাহার পক্ষে পথ ওইখানেই শেষ, কালের স্রোতে সে ডুবিয়া যায়। আধুনিক উৎক্রান্তিবাদ (Theory of Evolution) অনেকটা এইরূপ, কিন্তু ভারতের সেই সনাতন-সত্য জড়-সৃষ্টিরই একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়।

ভারতের বাহিরের যত প্রাচীন জাতি, সকলেই একটা যুগের তরঙ্গে উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকার পরবর্ত্তী শক্তিমান জাতিতে বর্ত্তিয়াছে—এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গে লয় পাইয়াছে। সেই জাতিও যেমন আর নাই, তেমনই তাহার সেই বিশিষ্ট সাধনাও আর জীবিত নাই; সেখানে সনাতনের সংস্কারই যেন মিথ্যা। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ, যদিও আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না; কারণ তাহার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষও বহুকাল মরিয়া গিয়াছে।

ইহার কারণ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির শাসনে ইতিহাসও কেবল তরঙ্গ-পরম্পরাকে স্বীকার করে—কোনরূপ "being" নয়, "becoming"-এর অনাদ্যন্ত গন্তব্যহীন গতি-পথকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করে। এই সৃষ্টির কোন চূড়ান্ত অর্থ বিজ্ঞানবাদীরা এখনও খুঁজিয়া পান নাই—তেমন কোন অর্থের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তর্ক করাও নিষ্ফল। আমি কেবল ইহাই বলিব যে, সনাতন ও যুগ—এই দুইয়ের বিরোধ ও সমন্বয়ের একটা প্রমাণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায়; ভারতবর্ষ যে এখনও মরে নাই, তাহা অন্ততঃ একটা অর্থেও সত্য। যুগের পর যুগ নূতনতর সমস্যা

লইয়া ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে; যেমন করিয়াই হউক, সেই সমস্যা সে পূরণ করিয়াছে; না করিলে, আজও তাহার সেই বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কৃতি—সেই এক তত্ত্ব-দৃষ্টি জগতের মনীষিগণকে বিস্মিত করিত না। সে তত্ত্ব যে কেবল পুঁথিগত প্রাচীন পুরাতত্ত্ব নয়, তাহা যে ভারতীয় জীবনে এখনও জীবিত আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমানের যুগসমস্যাও সে আজ প্রায় এক শত বৎসর যাবৎ পূরণ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে, এবং এবারেও যে এই সঙ্কট সে উত্তীর্ণ হইবে—যাঁহারা ভারতবর্ষকে যথার্থরূপে জানিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তথাপি ভারতবর্ষ যে মরে নাই, অর্থাৎ তাহার দিক দিয়া কোন্ অর্থে সে বাঁচিয়া আছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সত্যই বাঁচিয়া থাকে, আর কিছুই বাঁচে না—যে সত্যকে ধরিয়া থাকে সে-ই বাঁচে; সে বাঁচা কেমন বাঁচা? তেমন বাঁচা বাঁচিতে চায় কে? এই সম্পর্কে একটি ইংরেজী বচন মনে পড়িল—"The touch of Truth is the touch of Life"; সেই Life কিরূপ? ভারতবর্ষ, জীবন ও সত্য—এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ মানে নাই। যাহা বাহিরে বাঁচিয়া আছে বলিয়া মনে হয়, অথচ স্পষ্ট ধ্বংসশীল, তাহা মিথ্যা—তেমন জীবনের সাধনা সে করে নাই। সেই সত্য কোন জাতিকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে না—জাতি বা মনুষ্যসমাজই সত্যকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে। সেই সত্যের কোন যুগ নাই—জাতিবিশেষের জীবনেই তাহার পতন-অভ্যুদয় নাই। তথাপি জীবনকে সেই সত্যের আশ্রয়ে অমর করার উপায় আছে—তাহাও জাতি বা মানুষ হিসাবেই টিঁকিয়া থাকা নয়, ওই সত্যকেই শত মৃত্যুর মধ্যে জীয়াইয়া রাখা। জীবন নামক যে একটা সত্তা তাহাও সত্যের সত্তা—সে কোন জাতির সত্তা নয়; জাতিসকল সেই সত্যের আধার মাত্র। শুধু তাহাই নয়, সেই আধার হইবার জন্য এই ভারতের জলমাটিই যথেষ্ট; সেই সত্য যেমন সনাতন, তেমনই তাহা ভারতেরও বটে। ইহাও একটি পরম রহস্য, সে কথা পরে বলিব। এইজন্যই ভারতবর্ষে, শেষ পর্য্যন্ত জাতিহিসাবে মানুষের কোন পৃথক মর্য্যাদা বা গৌরববোধের উন্মেষ হইতে পারে নাই—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও জাতীয়তার আদর্শ এক নয়। জীবনকে সেই সত্য-সাধনার অভিমুখী করিবার জন্য সমাজবিধিকেই রাষ্ট্রবিধির উপরে স্থান দিয়া বর্ণাশ্রমের কাঠামোটা মজবুত করিয়া তুলিলেও—এবং আদিতে তাহার গণ্ডি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইলেও—ক্রমে বহু মানুষের, বহু জাতির মধ্যে তাহা বিস্তারলাভ করিয়াছিল, বর্ণাশ্রমের বন্ধন স্বীকার করিলেই সকল জাতি এক সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যাইত। এই সমাজও সেই সত্য-সাধনের চূড়ান্ত উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; ধর্ম্মসাধনার সাধারণ কেন্দ্ররূপে তাহার বিশেষ মূল্য থাকিলেও,

উচ্চাধিকারীকে সে বন্ধন হইতেও মুক্তি দেওয়া হইত। সামাজিক জীবনে যেটুকু আত্ম-পর-ভেদ মানুষে মানুষে ঘটিবেই—বংশের নাম, এমন কি ব্যক্তির নামেও যে একটা পৃথক্ স্বার্থ-চেতনা অবশ্যম্ভাবী, সে সংস্কারও ত্যাগ করিবার জন্য সন্ন্যাসগ্রহণকালে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে সর্ব্ব-স্বার্থ আহুতি দিবার বিধি আছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, সেই সত্যকে লাভ করিবার জন্য জাতীয়তা-বুদ্ধি তো পরের কথা—যাহা কিছু বিশ্বাত্মীয়তা-বোধের অন্তরায় তাহাকেই বর্জ্জন করা সেই সাধনার অঙ্গ ছিল। 'লোক-সংগ্রহ', অর্থাৎ বহু মানুষকে সত্যের তথা কল্যাণের পথে চালিত করাই—উৎকৃষ্ট কর্ম্মনীতি; যাহা 'জগদ্ধিতায়' তাহারই অনুষ্ঠান কর্ম্মহিসাবে সত্য। অতএব, সর্ব্বভূতহিতই যেখানে একমাত্র কাম্য বলিযা নির্দ্দিষ্ট, সেখানে মানুষের জাতির প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর; তাই আধুনিক অর্থে জাতি বা 'নেশন' বলিতে যাহা বুঝায় ভারতীয় চিন্তায় কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তথাপি, সত্যকে সাধনযোগ্য করিবার জন্য সমাজবন্ধন ছিল, এবং সে বন্ধন বেশ একটু দৃঢ়ই ছিল। আর্য্যের অনার্য্যবিদ্বেষকে আমরা এক্ষণে যে চক্ষেই দেখি না কেন, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ-সংস্কার না দেওয়ার মূলে আমরা এক অতি সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া যতই তাহাকে ধিক্কৃত করি না কেন, আদর্শে ও বাস্তবে একটা বিরাট ব্যবধান থাকা আশ্চর্য্য নয়; বরং তাহা থাকাই স্বাভাবিক। আইডিয়ার সহিত বাস্তবের বিরোধ যে অনিবার্য্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; যাহারা তাহা করে না, তাহাদের নিকটে সত্য একটা ভাব-বিলাস বা তর্ক-বিচারের উপকরণ মাত্র; মানুষমাত্রেরই তাহাতে জন্মগত অধিকার আছে বলিয়া আস্ফালন করিলেই হইল, তাহাকে লাভ করিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন নাই। শ্রুতি যে বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তাহারও কোন অর্থ নাই, কারণ বল নাই কাহার? অতএব লাভ তো হইয়াই আছে; সুতরাং এই অতি-আধুনিক 'democratic ideas'-এর যুগে এ বিষয়ে তর্ক করিয়া লাভ নাই।

আমি বলিতেছিলাম, সেই সনাতনের সাধন-ক্ষেত্র হইয়াছিল সমাজ। ভারতবর্ষে কত জাতি আসিয়াছে গিয়াছে, বাঁচিয়াছে মরিয়াছে,—তাহার হিসাব সে রাখে না, সেই ইতিহাস তাহার ইতিহাস নয়। এই সমাজও এমনই পরিবর্ত্তনহীন যে তাহারও কোন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা নাই। এ দেশের আধুনিক কবি য়ুরোপীয় কাব্যের আদর্শে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ ইহাই। এখনও যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা দ্রুত হইয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা এত উৎফুল্ল হইয়া থাকি, তাহার কতখানি বাহিক ও কতখানি আভ্যন্তরীণ তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই; উপরে কোলাহলের ধ্বনি যতই বৃদ্ধি পাক, ভিতরের সেই সুর চাপা পড়িলেও একেবারে স্তব্ধ হইয়াছে কি না,—অদূর না হইলেও, দূর ভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষ্য দিবে। যাহাদের মতি-

গতি দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে, সেই প্রাচীন ভারত বুঝি এতদিনে সত্যই মরিল, কে বলিবে তাহারা যুগ-তরঙ্গের রাশি রাশি ফেনা নয়? এমন ফেনা কত বার দেখা দিয়াছে! কিন্তু ততবারই মিলাইয়া গিয়াছে।

তথাপি ইহা যুগকে অস্বীকার করার কথা নয়। যুগের প্রয়োজনে সনাতনকে বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ভারতবর্ষের সনাতনও বার বার তাহা করিয়াছে। যুগকে যদি সে তাহার অঙ্কে স্থান দিতে না পারে, তবে তাহা সত্য হয় কেমন করিয়া? কারণ, সত্য যে সর্ব্বাশ্রয়ী; প্রত্যেক যুগে ভারতীয় প্রতিভাই যুগসমস্যার সমাধান করিয়াছে, মন্ত্রকে ঠিক একই রাখিয়া সাধনার পদ্ধতি নূতন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলেও মূল সমাজবিধির বিশেষ পরিবর্ত্তন কবিতে হয় নাই। এবারকার সমস্যা সত্যই গুরুতর, সেই সনাতন সত্য-মন্ত্রের একটি চরম পরীক্ষা উপস্থিত; এবার সমাজ-বিধিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহাতেও আশঙ্কার কারণ নাই; যতই পরিবর্ত্তন হউক, ভারতবর্ষে অভারতীয কিছু হইতে পারিবে না; যতই নূতন হউক—যাহার জন্ম ভারতবর্ষে, তাহা যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে ভারতের শ্বাস-প্রশ্বাসই তাহার শ্বাস প্রশ্বাস হইবে।

এক্ষণে সেই 'সনাতন'-এর কথাই আরও কিছু বলিব। সনাতনের অর্থ যদি ইহা হয় যে যাহা যুগ-বিরোধী—যাহা কোন পুঁথি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের কতকগুলি বচনে, দেশ কাল ও পাত্রের প্রয়োজনে, কোন এক কালের সত্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তাহাই সর্ব্বযুগের সত্য, তবে তাহা নিশ্চয়ই 'সনাতন' নয়। যে সত্যের দ্বারা সকল যুগের সকল ধর্ম্মকেই বুঝিযা লওয়া যায়, অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই সাধনাভ্রষ্ট হইতে হয না, সেই সত্যই সনাতন। এই 'সনাতন'-এর ধারণা বা উপলব্ধি আর কোন জাতির জীবনে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। মানবেতিহাসের ধারাকে যাঁহারা অখণ্ডভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই আধুনিক এভোলিউশন-বাদীরা সনাতনকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির ধারা পূর্ণ নয়, পূর্য্যমান; রূপ হইতে রূপান্তরে তাহার ক্রমবিকাশ হইতেছে—ওই বিকাশের ধারাটাই সত্য, তাহার অন্তরালে ধ্রুব-স্থির কিছু নাই। ইহাও সৃষ্টির বহিরঙ্গের কথা, ভারতবর্ষ ইহাকে 'জগৎ' নাম দিয়াছে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি উহাতেই রুদ্ধ হয় নাই। সৃষ্টির এই বিকাশধারাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারাই তো মৃত্যুকে পূজার বেদীতে বসাইয়াছে, সহস্র মৃত্যুর মালায় যে ডোর রহিয়াছে তাহাকেই জীবনের অখণ্ড ধারা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইহাদের মতে, পূর্ণ-সত্য বলিয়া কিছু নাই; এক একটা জাতি এক একটা খণ্ড-সত্যকে তাহার জীবনে রূপ দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে; তাহার সাধনার যাহা কিছু সার তাহা পরবর্ত্তী কোন জাতির সাধনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এমনই করিয়া খণ্ডই আর এক খণ্ডকে পুষ্ট

করিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছে। মিসরকে গ্রাস করিয়া গ্রীস উজ্জীবিত হইয়াছিল; গ্রীসকে গ্রাস করিয়া রোম আপন দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিল; আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিগণ কি ভাবে সেই যুগ-সংস্কৃতিকে পরিপাক করিয়া কোন্ বিশিষ্ট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে কোন্ বৃহত্তর মৃত্যুর দ্বারা কবলিত হইতে চলিয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। এই গ্রাস-করার এভোলিউশন-নীতি মানুষের জীবন-নীতি হইতে পারে না। পৃথিবীর অপরাপর জাতি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ইহারই উপাসনা করিয়াছে; ভারতবর্ষ ওই জীবন ও ওই মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া, যাহা "তমসঃ পরস্তাৎ" আদিকাল হইতে তাহারই সন্ধান লইয়াছে। তাই এখানে কাহাকেও গ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় নাই; সকল বৈচিত্র্য, সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে যথাস্থান নির্দ্দেশ করিয়াই একটা বৃহৎ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হইয়াছে, খণ্ডকে স্বীকার করিয়াই অখণ্ড আপন মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস পৃথিবীর আর সকল জাতির ইতিহাস হইতে ভিন্ন—তাহা জাতিবিশেষের উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়। যাহাকেই আশ্রয় করিয়া হউক, সেই সনাতনের ধারাটি না হারাইলেই হইল; যুগ ও জাতির যতই পরিবর্ত্তন হউক, ওই সনাতন তাহার ভিতর দিয়াই ভারতের ভারতীয়তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

আশ্চর্য্য বটে! জাতিও নয়, যুগও নয়—এ যেন আর একটা কিছুর বাঁচিয়া থাকা! তাই ভারতবর্ষ কবে বাঁচিয়া ছিল, এবং এখনও বা কি অর্থে বাঁচিয়া আছে—এ প্রশ্নের উত্তর আধুনিক ঐতিহাসিকের মনঃপূত হইবে না। এই বাঁচিয়া থাকা কোন জাতি, জন্ম বা রক্তগত কিছু নয়—ইহা ভারতীয় প্রকৃতিরই একটা গুণ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে সকল জাতি এখানে বাসস্থান করিয়াছে, কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তাহারা সেই প্রকৃতির প্রভাব অনুভব করিয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে—পৃথিবীর আর সকল দেশকে ভোগভূমি বলিয়া ভারতবর্ষকে মোক্ষভূমি নাম দেওয়ার অর্থ ইহাই। আধুনিককালেও এক মহামনীষী—স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—তাঁহার 'যজ্ঞকথা' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের উপসংহারে এই কথাই বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার একটি প্রবন্ধে ("আত্মপরিচয়"—'পরিচয়') প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও 'হিন্দু-ধর্ম্মে'র সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—ভারতের সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির মধ্যে সর্ব্ব-যুগে যে সকল ধর্ম্ম বা সাধন-মার্গের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে যে লক্ষণ-সামান্য আছে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। অতএব, ইহা গোঁড়ামি বা অন্ধ-বিশ্বাসের উক্তি নয় যে—ভারতীয় সাধনার একটা চিরাগত বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সে বৈশিষ্ট্য জাতিগত নয়, ভূমিগত। এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের সেই সাধনা অব্যাহত না

থাকিলেও তাহার ধারা লুপ্ত হয় নাই; ইহাই সব চেয়ে বড় কথা, কারণ, অগ্নির কণামাত্রও অগ্নিই বটে। সর্ব্বগ্রাসী কালের হাত হইতে এইটুকুও যে রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাতেই ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে। মিসর, গ্রীস, রোম কোন অর্থেই আর বাঁচিয়া নাই, তাহাদের দেহও যেমন মরিয়াছে, তাহাদের সেই সাধনাও আর সেই রূপে বিদ্যমান নাই। কিন্তু ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি বলিতে আমরা এবং বিদেশীয়েরা যাহা বুঝি, তাহার ধারাটিকে মূল উৎস পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে অনুসরণ করা এখনও সম্ভব। এই কারণে প্রাচীন জাতিগুলি যে অর্থে মরিয়াছে সেই অর্থে কেবল দুইটি মাত্র জাতি এখনও মরে নাই—ভারত ও মহাচীন; তাহার কারণ, ইহারা প্রথম হইতেই প্রকৃতির প্ররোচনায় বিশ্বাস স্থাপন করে নাই—ভোগকেই পরমার্থ করে নাই—যাহা অব্যভিচারী এমন কিছুকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিল। জাতি বা ব্যক্তির জীবনের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা নয়—সেই সত্যের উপরেই জাতি ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ মনুষ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা। যে-জাতি কেবল স্ব-প্রবৃত্তির অন্ধপরিচর্য্যা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে ইতিহাস-নামক কাল-পঞ্জিকার পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে মাত্র। এই ভারতবর্ষেও, জাতির দম্ভ ও ব্যক্তির দম্ভ যুগে যুগে শোভাযাত্রা করিয়া একের পর এক, কত চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের উদ্ধত মশাল কিংবা রঙিন রোশনাইয়ের আলোকে ভারতের সেই অনির্ব্বাণ দীপশিখাকে দণ্ড দুইয়ের জন্য আড়াল করিয়া নিজেরাই চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। এখানে কত জাতি আসিয়াছে, আরও কত আসিবে; সকলকেই আসিতে হইবে, সকলকেই সেই সত্যের ছাঁচে জীবনকে ঢালিয়া সার্থক করিতে হইবে, সকলকেই ভারতীয় হইতে হইবে; কারণ, মানুষ অমৃতের সন্ধান আর কোথাও পাইবে না—এমন কাল-নিরপেক্ষ সত্যের সাধনা আর কেহ কোথাও করে নাই। শুনিয়া হাসিবার কারণ নাই; আজ যাহারা সেই সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই সত্যকে পরিহাস করিয়াই যেন টিঁকিয়া আছে, এবং মনে করিতেছে, একটা সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্বের আস্ফালন করিয়াই টিঁকিয়া থাকিবে—তাহারাই তো আজিকার এই শ্মশান-ভূমে যূপবদ্ধ পশুর মত খড়্গাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। সেদিন যখন য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রে ফ্রান্সের পতন—তাহার সকল গৌরবের অবসান-দৃশ্য—বড়ই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন একজন সদুঃখে বলিয়াছিলেন, "যে-ফরাসীজাতি আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল, আজ তাহার এই পরিণাম! তাহার সকল প্রতিষ্ঠা ধূলিসাৎ হইয়া গেল!" কিন্তু ইহাই তো অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী জাতির সাধনায় এমন কি সত্য ছিল, যাহা একটা যুগকে অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে? সে জাতিও অপর সকল মৃত জাতির মত কালস্রোতে একটা রং বা রূপের ঢেউ তুলিয়াছিল মাত্র; সেখানেও কেবল একটা জাতির স্বপ্রবৃত্তির পূর্ণ পরিস্ফুরণ ছাড়া আর তো কিছুই ছিল না। সে-ও মৃত্যুর অতি মনোহর

রূপের উপাসনা করিয়াছিল ; এক দিকে ছিল সূক্ষ্ম কামচর্য্যা, অপর দিকে ছিল সাম্রাজ্য-লিপ্সার ক্রূরতা ও কূটবুদ্ধি—এ দুই-ই তো মৃত্যুর নিদান। সে যাহার সাধনা করিয়াছিল তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—সেই সিদ্ধিলাভের নামই মৃত্যু, ইহাতে দুঃখ করিবার কি আছে ?

আজিকার দিনে এ কথা কাহারও ভাল লাগিবে না, তাহা জানি, আমারও কি লাগিতেছে ? আজ আমরা যে জীবনের উপাসনা করি তাহার মিথ্যাটাই পরম উপাদেয়। আদি-অন্তের ভাবনা আমরা করি না ; আমরা কেবল প্রাণ ভরিয়া পান করিতেই চাই —'মদ্যসম যাহা অদ্য ফেনায়ে উঠিছে সদ্য' তাহারই উন্মাদন-সুখ-জ্বালায় অজ্ঞান হইয়া আমরা পরিণাম-চিন্তা ভুলিতে চাই। আমরা তো বাঁচিতে চাহি না—মৃত্যুকেই বিশ্বাস করি, জীবনকে নয় ; তাই তাহাকে লুঠ করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল। সত্যকেও আমরা সহ্য করিতে পারি না, তাই তাহাকে স্বীকার করিতে এত ভয় পাই। সত্য যে একটা অতিশয় কঠিন সাধনার বস্তুই নয়, মানুষের বাঁচিবার পক্ষে তাহাই যে একমাত্র আশ্রয়—এই বোধ আমরা হারাইয়াছি। ভারতবর্ষ আত্মাকেই যদি প্রাধান্য দিয়া থাকে, তবে তাহাকেও এই দেহ জীবনেই সত্য ও সার্থক করিবার জন্য। যদি সত্যকার বাঁচিতে চাও—যদি এই জীবনেই সর্ব্ব ভয়, সকল দুঃখ ও সকল দুর্ব্বলতা জয় করিয়া এই সৃষ্টির যত কিছু আনন্দ পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিতে চাও, তবে সত্যকে উপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহাকেই আশ্রয় কর। ইহার জন্য কেবল দৃষ্টিটাকে একটু ঘুরাইয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষ যে-সত্যকে মন্ত্রের মত দর্শন করিয়াছিল, তাহা এই। তোমার যে সত্তা তাহা জগতের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র নয়—জগৎ তোমাকে ধারণ করিয়া নাই, তুমিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছ। তুমি যে জগৎ হইতে পৃথক একটা ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন সত্তা—এই বুদ্ধিই যত ভয়, দুঃখ ও দুর্ব্বলতার মূল, ইহারই নাম অবিদ্যা। যেখানে যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে, যাহা কিছু দৃশ্যরূপে দণ্ডায়মান আছে, তাহা তোমারই সত্তায় সত্তাবান ; এই সর্ব্বাত্মীয়তার যে 'আত্মজ্ঞান' তাহাতে তোমার চিৎশক্তির এমনই স্ফুরণ হইবে, সেই আত্মবিস্ফারের আনন্দ এমনই যে, তাহাতে লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় প্রভৃতি স্বার্থঘটিত চিন্তার লেশমাত্র থাকিবে না ; তখন সম্পূর্ণ নির্ব্বন্ধন ও নির্ভয় হৃদয়ে, এই ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের মধ্যেই, তুমি অনন্ত জীবন আস্বাদন করিতে পারিবে, মৃত্যুভয় আর থাকিবে না।

এই সত্যই ভারতীয় সাধনায় আদি হইতেই ধরা দিয়াছিল, এই সত্যই যুগোপযোগী সাধন-পদ্ধতির-সহায়ে মানুষকে জীবন্মুক্তির অধিকারী করিয়াছে। যাহা এককালে কেবল অতি বিশুদ্ধ ধ্যান-ধারণার বস্তুই ছিল, এবং সেইজন্য একটি অতি ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী কালের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে—ধ্যান হইতে ধর্ম্মে, জ্ঞান

হইতে কর্ম্মে—মানুষের প্রাণশক্তি প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তত্ত্বের দুর্গম পন্থাকে জীবনের উন্মুক্ত পথে মিলাইবার অতি উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহারও পরে, সেই তত্ত্ব আরও লোকায়ত হইয়া, পৌরাণিক যুগে নিরাকারকে সাকার করিয়া তুলিয়াছিল; যাহা ছিল শক্তিমানের কর্ম্মযোগ, তাহাই আর এক পথে জীবন ও জগৎকে নূতন রসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই আদি বৈদিক ধর্ম্মেরই এক অতি অপূর্ব্ব সংস্করণ; যাহা ছিল বীজ, তাহাই যোজন-প্রসারী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিল, সর্ব্বজন-চয়নীয় পুষ্প-পল্লবে ভরিয়া উঠিল। ইহার পর তন্ত্রের যুগ। তন্ত্রই জীবন ও জগৎ, সৃষ্টি বা প্রকৃতিকে এক নূতন অর্থে সেই একই সত্যরূপে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিল: ভুক্তি ও মুক্তিকে একই সাধনায় সমন্বিত করিল; মানুষকে সর্ব্ব ভয় ও সংশয় হইতে মুক্তি দিয়া জীবনকেই শ্রেষ্ঠ আত্মাধিকাব-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দিল। এই দেহই আত্মার মন্দির; এ মন্দিরের কিছুই অশুচি নয়, এই প্রত্যয়ের আশ্বাসে মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্বকে প্রত্যক্ষ কবিযা তুলিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদা এক বড় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সেই যুগান্তরের যুগধর্ম্মই এই তন্ত্রধর্ম্ম—এই ধর্ম্মে সনাতনকে যে ভাবে জয়ী করা হইয়াছিল তেমন আর পূর্ব্বে বা পরে করিবার প্রয়োজন হয় নাই—এতকাল পরে আজ তাহা হইয়াছে। আজও এই তন্ত্রধর্ম্মকেই যুগধর্ম্মের সহিত নূতন করিয়া সমন্বিত করার যে প্রতিভা, ভারতবর্ষ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। মধ্যে একটা অন্ধকার যুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিতেছি। এই যুগেই ভারতীয় সমাজের উপরে বাহির হইতে ধাক্কা শুরু হইয়াছে; তাহাতে অভারতীয় সমাজের অভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যে ঘনিষ্ঠ যোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল তাহার ফলে সেই সমাজ—ভারতীয় সাধনার সেই সাধনক্ষেত্র—এতদিন পরে টলমল করিতে লাগিল; এবং তাহারও পরে আজ পর্য্যন্ত যুগ-প্লাবনের ঘূর্ণধারায় সনাতনের সেই মধ্যবিন্দু স্থির হইতে পারে নাই। তন্ত্রের যুগেই অনাচার বাড়িয়াছে; তাহার কারণ সেই সাধনায় -কোন-কিছু বর্জ্জনের বিধি ছিল না, জীবনের সর্ব্ববিধ প্রকাশকে একই শক্তি-মন্ত্রে শোধন করিয়া লওয়াই ছিল তাহার সাধন-তত্ত্ব। কিন্তু ইহাই হইল বিপদের কারণ। ভারতীয় সাধনা যুগে যুগে যে পথেই প্রবর্ত্তিত হউক, তাহার ক্ষেত্র বা আধাররূপে যে দৃঢ়-গঠিত সমাজ ছিল, সেই সমাজ আপন বিধি-ব্যবস্থা লইয়া স্বয়ং-প্রভু বা স্বরাট হইয়া অন্য কোন শক্তির মুখাপেক্ষা করিত না,—রাজ-শক্তির সহিত যে সম্পর্ক ছিল তাহার প্রয়োজন নানা কারণে ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শেষে এমন হইয়াছিল যে, প্রতিকূল রাজশক্তির সহিত সন্ধি করিয়া কোনরূপে টিঁকিয়া থাকাই পরমপুরুষার্থ হইয়া উঠিল। ইহার ফলে সমাজ-জীবন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল; ভিতরে যাহারা আত্মিক স্বাধীনতার অভিমান ছাড়িবে না, তাহারা বাহিরে সর্ব্বপ্রকার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; তাহাতে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাইল,

স্বাধীনতার স্থলে গোপন স্বৈরাচার প্রশ্রয় পাইল। এদিকে তন্ত্রের মন্ত্রেও বিজাতীয় প্রবৃত্তির প্রভাব অবাধে প্রবেশ করিতে লাগিল, দেহ ও আত্মার সেই অদ্বৈত-সাধনাই শেষে জীবন্-ধর্ম্মকেও অস্বীকার করিল। অতঃপর শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ গুরুগণের উপদেশে দেহকে, বা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, অথবা তাহাকে মিষ্টিক তত্ত্ব-রস বা অতীন্দ্রিয় ভাবসাধনার দ্বারা শোধন করিয়া—আত্মাকেই প্রাধান্য দিয়া তাহার উপাসনাই উদ্ধারের একমাত্র পথ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" বলিয়া—ভারতবর্ষে সকল ভাবুক ও মনীষীর গ্রাহ্য হইল; সত্য-সাধনাকে বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে ভাবের ক্ষেত্রে তুলিয়া লওয়া হইল। ইহারও পরিণাম যাহা তাহাই আমাদের নবযুগের পূর্ব্বাবস্থা; তখন সেই বিশাল পুষ্পপল্লবময় বৃক্ষ শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বীজ মরে নাই, মরিবার নয়; তাই নবযুগের নবজাগরণ-ক্ষণে সেই বীজেরই নূতন অঙ্কুরোদ্‌গম-প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় কতটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছে এক্ষণে সেই আলোচনা করিব; তৎপূর্ব্বে এ প্রসঙ্গের মূল-কথা আর একবার সংক্ষেপে বলিব।

আমি বলিয়াছি, মানবত্ব বা মানব-জীবনের মূল্য ও মহত্ত্ব-বোধই এই যুগের প্রধানতম যুগপ্রবৃত্তি; ইহাও বলিয়াছি, এ দেশের জলমাটির গুণে আমাদের চেতনায় একটা এমন সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়া আছে, যাহা তত্ত্বের দিক দিয়াও যেমন সত্য, জীবনের সহিত তাহার সামঞ্জস্যসাধনও তেমনই অপরিহার্য্য। মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই সামঞ্জস্যের যেন কোন প্রয়োজনই আমরা অনুভব করি নাই, আমাদের জীবন-ধর্ম্ম এমনই দুর্ব্বল হইয়াছিল। এই কালে আত্মার জগৎ ও দেহের জগৎ—দুইটা ভিন্ন জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং একটাকে ফাঁকি দিয়া, অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করিয়া, অপরটার অর্দ্ধ-সত্যকে, কর্ম্মে নয়—স্বপ্নে বরণ করিয়া, একটা ভয়াবহ আত্মপ্রবঞ্চনা সাধনার স্থান অধিকার করিল। ঠিক কোন্ সময় হইতে ইহার আরম্ভ হয় তাহা অনুমানমাত্র; বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ও শঙ্কর-রামানুজ-প্রচারিত এক অভিনব নিবৃত্তি-প্রধান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়তো কালোচিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর যে যুগ আরম্ভ হয় তাহাই ভারতের অন্ধকার-যুগ। এ যুগে জাতির জীবনস্রোত রুদ্ধ হইয়াছিল, কোনরূপে কূর্ম্মাঙ্গের মত আত্মসংকোচ করিয়া কেবল বংশধারার সহিত সেই প্রাচীন সাধনার সংস্কারটুকুমাত্র রক্ষা করাই এ কালের শক্তি-সামর্থ্যের একমাত্র পরিচয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও, সেই অগ্নির শিখা না জ্বলিলেও, অথবা উপরকার ভস্মাস্তরণ বৃদ্ধি পাইলেও, ভিতরের বহ্নিকণা নির্ব্বাপিত হয় নাই, ভারতীয় সাধনার সেই বীজ-সত্য নষ্ট হয় নাই। ভারতের এই 'সনাতন' যে কি, বার বার তাহার উল্লেখ করিয়াছি—সেই সত্যের একটা সূত্র তুলিয়া ধরিবার চেষ্টাও করিয়াছি, তাহার অধিক

এ প্রসঙ্গে সম্ভব নয়, আমার সাধ্যও নয়। যাহা সত্য তাহা সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বকালীন, এইজন্যই তাহার নাম 'সনাতন'। সর্ব্বাশ্রয়ী বলিয়া মানুষের শুধু আত্মা নয়, তাহার দেহ বা জীবনও সেই সত্যের আশ্রিত; এবং সর্ব্বকালীন বলিয়া সেই সত্য আবর্ত্তসঙ্কুল কালপ্রবাহে একটি স্থির বিন্দুরূপে নিত্য বিরাজমান। যাহারা আত্মাকে জীবন হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহারই সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা যেমন অর্দ্ধসত্যের মোহে পড়িয়া বলহীন হইয়াছে, তেমনই, যাহারা—যেমন আজিকার দিনে—আত্মাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া দেহের জয়গান করিতেছে, তাহারাও মৃত্যুর সাধনাই করিতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সত্যভ্রষ্টতা ও তজ্জনিত অনাচারের আতিশয্য কোন কালেই অবিদ্যমান ছিল না, অতি প্রাচীন কালেই দারুণ সন্ন্যাস ও আত্মনিগ্রহের অধ্যবসায় লোক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাই গীতা শ্রীভগবানের মুখে বলাইয়াছেন—

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥১৭।৬

আবার, "কামোপভোগপরমা এতাবদ্ ইতি নিশ্চিতাঃ"—যাহারা ভোগকেই একান্ত করিয়া মানে তাহাদের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥১৬।৮

অতএব সকল কালেই তাহারা ছিল। এই বিশাল দেশের বিশাল জনসমাজে মিথ্যার উপাসনা, কুসংস্কার ও বহুবিধ অনাচারের প্রাদুর্ভাব কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। আধুনিক ঐতিহাসিক ইহাকেই ভারতীয় সাধনার পরিণাম বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিবেন, এবং এইজন্য ভারতবর্ষ মরিতে বাধ্য বলিয়াই মরিয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক মতবাদ যে কত অভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিয়া, য়ুরোপীয় মানবেতিহাস-তত্ত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে মরে নাই, আজিও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই; আজিও সেই ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির সজীবতা ও অমোঘতা, অসাধারণ কবিশক্তির বিকাশে, নবধর্ম্ম-প্রচারক অবতারকল্প পুরুষের আবির্ভাবে, অথবা, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসাধনার এক নূতন মন্ত্রদৃষ্টিতে, নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সকলের মধ্যে সেই এক ভারতীয় প্রতিভাই—সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই কৃষ্ণ-বুদ্ধের বাণীই—নূতন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরাতনের এই নূতনরূপে আবির্ভাব—যুগের আঘাতে এমন করিয়া সাড়া দেওয়া—ইহারই নাম বাঁচিয়া থাকা; ইহাই সত্য, ইহাই সনাতন। আজিও ভারতবর্ষের মানুষ যখনই তাহার অন্তরের অন্তরে দৃষ্টি করিবার অবসর পায়, যখনই প্রাণমনকে স্থির করিয়া একটা কিছুকে বিশ্বাস করিতে চায়, তখনই "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্", এইরূপ কোন বাণীই তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করে; সাধনায়

ধরিতে পারুক আর নাই পারুক, আর কোন কথাই সত্য বলিয়া মনে হয় না,—অতি-শিক্ষিত মানুষ হইতে নিরক্ষর মানুষ পর্য্যন্ত, সকলেরই সুপ্ত চৈতন্যে সেই এক অজপা স্ফুরিত হইতেছে 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্'। ইহার বীজ কোন এক কালে যুগধর্ম্মের বশে সহসা উড়িয়া পড়ে নাই, এই দেশেরই মাটিতে তাহা নিত্য নিহিত আছে।

যুগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবার সনাতনের কিঞ্চিৎ পরিচয় করিলাম; তাহার ফলে, এক দিকে নূতন মানব-ধর্ম্ম এবং অপর দিকে ভারতের মজ্জাগত সেই দুষ্প্রধর্ষ সনাতন-সংস্কার, এই দুইয়ের মধ্যে যে আপাত-বিরোধ—বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির বলে তাহা কতখানি অপসারিত হইয়াছিল, এইবার সেই কথাই বলিব।

যুগ ও সনাতন দুইযেরই বন্দনা করিলাম; যুগ ও সনাতনের মধ্যে কোন বিরোধ যে কেন থাকিতে পারে না—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনায় তাহার অর্থ কি, তাহাও যথাসাধ্য বলিয়াছি। ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছি যে, সেই ভারতীয় সাধনায় জীবন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আধুনিক জীবনবাদের অনুরূপ নয়। তথাপি ভারতবর্ষ যে কেবল আধ্যাত্মিক সাধনাই করিয়াছিল, অর্থাৎ জীবনের বাস্তব দিকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাও সত্য নয়। সে যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল তত্ত্বসাধন করিয়াছিল, তাহার সমাজে যে শুধুই ব্রাহ্মণ অথবা যোগী-সাধক এবং শূদ্রই ছিল—ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ছিল না, তাহা যেমন মিথ্যা, তেমনই, সেই তত্ত্বেরই আদর্শে মানুষের জীবন কিরূপ গঠিত হইতে পারে, তাহাব অতিশয় সুসম্পূর্ণ ও সম্ভব কাহিনী রামায়ণ ও মহাভারতে অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বেদ-উপনিষদের যুগে যাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, স্মৃতি ও পুবাণের যুগে তাহাই শাখাপল্লবে বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহারও পরে তন্ত্রের যুগ; এই যুগে ক্রমে নানা কারণে সেই জীবন-বৃক্ষ পরগাছায় আক্রান্ত হইয়া মরণোন্মুখ হইয়াছিল—যুগ-প্রয়োজনের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই; তথাপি মরে নাই, কারণ এই মাটির এমনই গুণ যে, গাছ মরিলেও বীজ মরে না।

কিন্তু আধুনিক কালের প্রসঙ্গে এ কাহিনী পুরা-কাহিনী; ইহার যেটুকু এখনও যে-কারণে হিসাব রাখিবার যোগ্য কেবল সেইটুকুই বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, নতুবা নূতন যুগের নূতন প্রবৃত্তি ও তাহার অতি গভীর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বোধগম্য হইবে না। শুধু যুগ-প্রবৃত্তিই নয়—তাহার সাক্ষাৎ লক্ষণ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবই নয়,—আরও সূক্ষ্মতর ভাব ও অভাবের ক্রিয়া, আমাদের জীবনে ঐ যুগ-সমস্যাকে সত্য করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুগপ্রবৃত্তি ও তাহার প্রভাবের কেবল সাক্ষাৎ-পরিচয়ই যথেষ্ট নয়; তাহার যেটুকু আমাদের 'আধুনিক'—সেইকালের য়ুরোপীয় জীবনে তাহা

ততখানি আধুনিক নয়, বরং কিছু পুরাতন হইয়াছিল; সেই পুরাতনকেও বুঝিয়া না লইলে, এবং আমাদের, বিশেষতঃ বাঙালী জাতির—রক্তগত পুরাতনকেও সেই সঙ্গে বুঝিয়া না লইলে, কেবল যুগ ও সনাতনের তত্ত্বেই সর্ব্বত্র সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে না। তথাপি এই চিন্তাগুলির লক্ষ্যস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রকেই রাখিব—যাহাতে ইহাদের সাহায্যে তাঁহার ভিতরকার সেই কবি-পুরুষটির উপরে আবশ্যকমত আলোকপাত হয়।

* * *

আমি বলিতেছিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে, তাহার জীবনে, সেই তত্ত্ব জীবন্ত হওয়ার কথা। সকল সাধনাই যে জীবিতেরই সাধনা—মৃতের কোন সাধনাই নাই, ইহা আমাদেরই শাস্ত্র-বচন। জীবন যত সুস্থ ও সবল, সাধনাও তত উচ্চ ও সফল হইয়া থাকে; জীবনের প্রতি বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য জীবিতের পক্ষে সম্ভবও নহে। প্রাচীন ভারতীয়-সমাজ যে-জীবন-সাধনার ক্ষেত্ররূপে গঠিত হইয়াছিল সে জীবন, আমাদের আধুনিক সংস্কারে কেন অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু সেকালে এ সংস্কার ছিল না। জীবনের একটা পূর্ণতর আদর্শ-সন্ধানই ছিল। শুধুই মনুষ্য-জীবনের একটা খণ্ড-সত্যই নয়—বিশ্বের সত্য যাহা, তাহারই ছন্দে মানুষের জীবন রচনা করিবার প্রযাস ছিল। এই প্রয়াসের বিরাম কোনকালে ছিল না; সেই আদর্শ যুগান্তরেও বিচলিত হয় নাই। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন, সেই 'মামনুস্মর যুধ্য চ'—মানুষের ব্যক্তি-ধর্ম্ম (বা স্বধর্ম্ম) এবং নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম্ম (বা আত্মার ধর্ম্ম) এই দুইয়েরই সমন্বয় যে তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা বহুবার বহুপ্রকারে শিক্ষা দিতেছেন—প্রায় হাজার বৎসর পরে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার মহাকাব্যে রঘুরাজগণের গুণকীর্ত্তনচ্ছলে, যেন গৌরবোৎফুল্ল কণ্ঠে সেই তত্ত্বানুপ্রাণিত জীবনের জয়গান করিয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব শ্লোকমালার 'যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্' এবং গীতার 'বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্। ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥'—এই দুইয়ের মূলে সেই একই তত্ত্ব—এক আদর্শ। কিন্তু জীবনের এ আদর্শ, ধর্ম্মের এ তত্ত্ব, আবার ভারতের মৃত্তিকাতলে গুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে হলরূপী আধুনিক যুগ সেই মৃত্তিকাই কর্ষণ করিতেছে।

এইবার বাঙালীজাতির চরিত্র ও তাহার রক্তগত দোষ-গুণের কথা বলি। আমি অতি-আধুনিক কালের কথা বলিতেছি না, গত শতাব্দীর সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের কথা বলিতেছি। তখন বাঙালীর দেহ সবল ছিল, মনও সেই হিসাবে সুস্থ ছিল। কিন্তু সে মন স্বভাবতঃই অলস; বাংলার জল-মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং বাঙালীর রক্তগত আলস্যের অহিফেন-রস বাঙালীকে কখনও কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা বৃহদায়তন কীর্ত্তিস্থাপনে উদ্যমশীল হইতে দেয় নাই। সে ক্ষুদ্র আয়তনের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে যেরূপ

পটু, বৃহদায়তন দেবমন্দির-নির্ম্মাণে তেমন কৃতী নয় ; একখানা বসত-বাটীও দৃঢ় করিয়া বড় করিয়া গড়িবার প্রয়োজন সে কখনও অনুভব করে নাই। এ জাতির পূর্ব্ব-ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই। যেটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় তাহা এই যে, মাত্র হাজার বারো শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে—অর্থাৎ, প্রায় ওই সময়ে একটা বিশিষ্ট জাতিহিসাবে বাঙালী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল ; নানা জাতির নানা রক্তের স্রোত অবশেষে একটা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মিশ্রণের ফলে, সেই সময় হইতে (তৎপূর্ব্বে ঠিক এই type-এর উদ্ভব হয় নাই—বাসের ভৌগোলিক সীমানাও স্থির হয় নাই) একটা অতিশয় অর্ব্বাচীন জাতির ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে। ইহার পরেও ভৌগোলিক সীমানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণ ক্রিয়াও চলিয়াছে ; কিন্তু তখন সেই race-type—সেই ছাঁচ—বাঁধা হইয়া গিয়াছে, নূতন মিশ্রণ পুরাতনকেই পুষ্ট করিয়াছে। কিংবা, যেমন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়—বাংলাদেশের আধুনিক ভৌগোলিক সীমানার চতুষ্প্রান্তেই সেই মিশ্রণ সুসাধিত হয় নাই—ঐ সকল প্রত্যন্তবাসী বাঙালীর চেহারায় ও সংস্কৃতিতে বেশ বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। এ জাতি চরিত্রে যেমন দুর্ব্বল, ভাবুকতায় ও মেধায় তেমনই শক্তিমান—যেমন কর্ম্মকুণ্ঠ, তেমনই কল্পনাকুশল। ইহার ফলে, সে যেমন স্বল্পসুখ-বিলাসী, তেমনই আত্মপরায়ণ—egoist। বাস্তবের আরাধনায় সে যেমন ক্ষুদ্রচেতা, অবাস্তবের সাধনায় সে তেমনই ভাবের আবেগে আত্মহারা। এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তিই তাহার স্বভাবে প্রবল হইয়া আছে, ইহার কারণ—সেই মজ্জাগত আলস্য। তথাপি ভাব বা তত্ত্বকে বস্তুরূপে স্পর্শ করার যে আকাঙ্ক্ষা তাহারই বলে একদা বাঙালী একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এই বাংলা দেশে তন্ত্র-ধর্ম্মের যেরূপ উৎকর্ষ হইয়াছিল তেমন আর কোথাও হয় নাই। ভাবই যে বাঙালীর প্রাণের আরামস্থল, তার প্রমাণ আজিও মিলিবে। এই ভাবকেই আশ্রয় করিয়া সে একদা একবারমাত্র জীবনে যে উন্মাদনা আনিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সেই ভাবোন্মাদনার স্রোত এখনও একেবারে স্থির হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে সেই একবার বাঙালীজাতির ভাবজীবনে জাগৃতি ঘটিয়াছিল—আর একবার তাহার মনের জাগৃতি ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এবারে বাহিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেও ভিতরে তাহার শক্তি, দেহে ও মনে, পূর্ণমাত্রায় ছিল ; ছিল না কেবল জীবনে তাহার উৎসরণ। বাহির হইতে একটা বড় ধাক্কা না পাইলে তাহার চৈতন্য সাড়া দেয় না, জীবনে ঢেউ উঠে না। সেবারে ছিল ইসলাম ধর্ম্ম ও তাহার সংস্কৃতির আঘাত, এবারে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টিয়ান সভ্যতার আক্রমণ।

এবারকার আক্রমণ এক হিসাবে আরও গুরুতর—এ আক্রমণের আঘাত কেবল ভাবজীবনেই সম্বরণ করা সম্ভব নয়। সেবার আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়ের মধ্যে বহির্গত বিরোধ যেমনই থাক, ভিতরে একটা সগোত্রতা ছিল,—শেষ পর্য্যন্ত দুই-ই প্রাচ্য

আদর্শ ; জীবনকে দেখিবার ভঙ্গী যতই ভিন্ন হউক, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাধান্য কোনটাতেই কম ছিল না। এবার যাহার ধাক্কা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল তাহার প্রধান অস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব নয়—জীবন-তত্ত্ব। এ কোন তত্ত্বও নয়—বাণী, দেহ-মন-প্রাণের উদ্দীপন-মন্ত্র ; ইহার শাস্ত্রগ্রন্থ—প্রকৃতি, সাধনযন্ত্র—দেহ। প্রাকৃতিক সৃষ্টির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে—মানুষ সেই মহানিয়মের সচেত-বিগ্রহ ; সে নিয়মও যেমন স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত্ত, মানুষের মধ্যেই তেমনই তাহার সুস্থ ও স্বাধীন বিকাশ। এজন্য মানুষের ভাগ্য মানুষেরই অধীন ; ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি যত কিছু ফলাফল তাহা সেই প্রকৃতিদত্ত শক্তিরই বিকাশ-সাপেক্ষ। অতএব মনুষ্য-জীবনের যত কিছু ভাব-অভাব, প্রয়াস-প্রবৃত্তি—সে জীবনের যত কিছু অভিব্যক্তি—সকলই পরম শ্রদ্ধা ও সাধনার বস্তু। মানুষের দেহলীলার প্রতি এই যে নবজাগ্রত শ্রদ্ধা—এই যে মানুষ কর্ত্তৃক আপন মানুষী মহিমার আবিষ্কার—ইহাই য়ুরোপীয় ইতিহাসের বহুপ্রসিদ্ধ সেই Renaissance ; ইহা হইতেই Humanism নামক এক নব ভাবের উৎপত্তি—আমাদের ভাষায় এখনও যাহার অনুরূপ শব্দ আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি নাই ; ইহারই কারণে প্রত্যক্ষ জগৎ ও মানবীয় কীর্ত্তি-সংক্রান্ত যত কিছু বিদ্যার—Humanities নামে নূতন গৌরবলাভ। অতএব এবারে আমাদের অলস অথবা সুপ্ত চৈতন্যে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা যেমন রূঢ়, তেমনই মোহকর ; বাঙালীর পক্ষে এ আঘাত সহজে সম্বরণ করা অসম্ভব।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—এই মানব-পূজার মন্ত্রে কোনরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্থান নাই। ইহাতে মনের উদ্দীপ্তি আছে, ভাব-সর্ব্বস্ব আদর্শবাদও আছে, এমন কি, সূক্ষ্ম তর্কবুদ্ধিরও অবকাশ আছে, কিন্তু সেই ভারতীয় তত্ত্ব বা সনাতন সত্যের সমগ্র-দৃষ্টি ইহার একান্ত বিরোধী। মানুষের দেহ-মনের অবাধ স্ফূর্ত্তিই ছিল ইহার প্রধান লক্ষণ। প্রাচীন গ্রীস হইতে আধুনিক ইঙ্গ-ভূমি পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় জীবনের ইতিহাসে, এই ধর্ম্মই তথাকার প্রকৃতির বড় অনুকূল—সেই প্রকৃতিতেই ইহার জন্ম। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য প্রকৃতির মধ্যে যে মূলগত ভেদ, তাহারও আরম্ভ এইখানে। এই মানবধর্ম্মতত্ত্বে মানুষের গূঢ়তর আত্মিক সত্তা যেন হিসাবের বাহিরে পড়িয়াছে ; শেষ পর্য্যন্ত জড়ের উপরে মনের প্রভুত্ব—ভোগকে মনের মত করিয়া তুলিতে পারাই হইল পরমপুরুষার্থ। য়ুরোপ যে সেমিটিক ব্রহ্মতত্ত্বকে তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে অভ্রান্ত বলিয়া মানে (জার্মান দার্শনিক সোপেনহায়র এই সেমিটিক ধর্ম্মনীতি অনার্য্য—অতএব আর্য্যজাতির পক্ষে বিধর্ম্ম—বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন) তাহাতে দেহধারী মানুষের আত্মাও পূজার যোগ্য নয় ; তাই বোধ হয়, এইরূপ বিদ্রোহ—মানুষের আত্মমহিমাবোধের এইরূপ অভিব্যক্তি—সে দেশের সে সমাজে বার বার একই ভাবের প্লাবন আনিয়াছে। ভারতবর্ষ মানুষেরই পূজা করিয়াছে,

অবতারবাদ তাহার সাক্ষ্য। য়ুরোপের ধর্ম্মতত্ত্বে ব্রহ্মই বড়, মানুষ ছোট; ভারতবর্ষের সনাতন 'তত্ত্বমসি' হইতে সেদিনের সেই নরলীলার মাহাত্ম্য-ঘোষণা পর্য্যন্ত—জীব ও ব্রহ্ম অভেদ; এই অভেদ-তত্ত্বই, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে উপলব্ধি করিবার কত পন্থাই আবির্ভূত হইয়াছে! কিন্তু সে তত্ত্ব বহুকালের বহু জঞ্জালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ভগবানের পরিবর্ত্তে ভূত হইয়া আছে—জীবনে বা ধ্যানে সেই অভেদের বা অখণ্ডের ধারণা লোপ পাইয়াছে। অতঃপর এই বাংলা দেশে, বাঙালীর মিশ্র রক্তের মিশ্র সংস্কারে, তাহার সুপ্ত প্রতিভা ও স্বতঃস্ফুরিত মেধায় এই নবভাবের বীজ সহসা উড়িয়া পড়িল; ইংরেজ বণিকের মারফতে অন্য অনেক বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মত, এই মহার্ঘতম পণ্যও প্রথমে সামাজিক ব্যবহার-যোগে, এবং পরে শিক্ষা-বিপণির সাহায্যে বাঙালীর প্রাণ-মনে বিস্তার লাভ করিল। এই ভাবের প্রতিক্রিয়া প্রথম দিকে কিরূপ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন, এই তিনের মধ্যে তাহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তির আলোচনা করিয়াছি। আবার সংক্ষেপে তাহা স্মরণ করাইয়া দিব। রামমোহনের প্রতিভায় এই নবধর্ম্ম—এই Humanism—নিছক বুদ্ধিধর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছিল; য়ুরোপীয় Renaissance-এর একটা প্রধান প্রবৃত্তি তাঁহার প্রতিভাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। Reason বা বুদ্ধিশক্তির বলে মানুষের মনের যে স্বাধীনতা—তিনি ছিলেন তাহারই উপাসক। রামমোহন ছিলেন ঘোরতর যুক্তিবাদী—যুক্তি বা বিজ্ঞান-বুদ্ধির শাণিত অস্ত্রে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদ করিয়া তিনি মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়াসী ছিলেন। মানুষের যে আত্মিক সত্তা, সে সম্বন্ধে রামমোহনের কোন জিজ্ঞাসা বা প্রয়োজন ছিল না; সমাজে, রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে (নৈতিক জীবনে) মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকে তিনি ন্যায়, যুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এবং হৃদয়বৃত্তির উপরে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোরতর Pragmatist। বিদ্যাসাগরে এই মানবধর্ম্ম আর এক বৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল—তাহার নাম মানব-সেবা। তাঁহার ধর্ম্ম ছিল হৃদয়বৃত্তি-প্রধান, তাঁহারও কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না—মানুষের পারলৌকিক কল্যাণ বা আধ্যাত্মিক সদ্‌গতির চিন্তা তাঁহার মনে কখনও প্রবেশ করে নাই; তাহার আধিভৌতিক দুঃখ ও সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায়ই তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি এই দেহদশাধীন মানুষের মূর্ত্তিকে—সাকার রক্তমাংসের বিগ্রহকেই—চিনিয়াছিলেন; তাই তাঁহার Humanism—মানুষের সেবায়, প্রত্যক্ষের উপাসনায়—হৃদয়যুক্ত দুই বাহুর কর্ম্মে—নিঃশেষ হইতে চাহিয়াছিল। য়ুরোপীয় Renaissance-এর তৃতীয় লক্ষণ মধুসূদনের প্রতিভায় পূর্ণপ্রকটিত হইয়াছিল। মন ও প্রাণের প্রভুত্ব যেমন যথাক্রমে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সাধনায়, মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মের গৌরব প্রচার করিয়াছিল—

তেমনই, মানুষের যে আর এক প্রভুত্বগৌরব—তাহার সর্ব্ববন্ধনমুক্ত প্রাণের আর এক বৃত্তির লীলা—বিধাতার মতই সৃষ্টির আনন্দে আপনাকে প্রসারিত করিবার যে দিব্য অধিকার, মানুষের সেই বৃহত্তর মুক্তির পরম আশ্বাস মধুসূদনের কাব্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইল। বাঙালীর এই সাহিত্যিক নবজন্মে য়ুরোপীয় Renaissance-এর সাক্ষাৎ-প্রেরণাই বিদ্যমান ছিল ; মধুসূদন হইতেই আমাদের সাহিত্যিক সৃষ্টি-প্রতিভার নবজন্ম, এবং এই সাহিত্যিক নবজন্মই আমাদের Renaissance-এর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসংশয় প্রমাণ। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে, এই নবজন্মের সাহিত্যিক প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

প্রাণ-মনের অকুণ্ঠিত অবাধ স্ফূর্ত্তির যে প্রমাণ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিলে আমাদের Renaissance-কে য়ুরোপীয় Renaissance-এর সমতুল্য বলা যাইত, তাহা হয় নাই—কেন, এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতেছি। আমাদের সেই যুগ একটা বড় সমস্যা, একটা মহাসঙ্কটকে ঘনাইয়া তুলিয়াছিল—যুগপ্রবৃত্তি যেমনই হউক, তাহাকে বরণ করিতে বাধারও অন্ত ছিল না—অক্ষমতাও কম ছিল না। আজিও আমাদের সে যুগ-সমস্যার সমাধান জীবনের ক্ষেত্রে হয় নাই, সেই কালেই, এবং পরে, নানা বাধা অতিক্রম করিতে সেই ভাবের কত প্রতিক্রিয়াই ঘটিয়াছে—এক ভ্রান্তি হইতে আর এক ভ্রান্তির পথে এখনও আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক জাগরণ যে একটা প্রকৃত Renaissance তাহাতে কোন সংশয় নাই। "The Wonders of Life", "The Joy of Living" জীবনে আমাদিগকে তেমন করিয়া পাইয়া না বসিলেও, আমাদের মনে যে তাহার অবাধ স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমাদের সে-যুগের সাহিত্যে—মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। য়ুরোপ যেমন বহুকালব্যাপী দারুণ সন্ন্যাসের শীতে রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, পরে সহসা তাহার শীত-কাতর সঙ্কুচিত আত্মা, Renaissance-নামক বসন্ত-ঋতুর অভ্যাগমে দেহের রসোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তেমনই আমাদের দেশেও রঘুনন্দন-শাসিত সমাজে বহুকাল ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্যই আত্মনিগ্রহ নীতির কৃচ্ছ্র সাধন-শেষে—বাঙালীর মনে যেমনই একটু বন্ধন-সংস্কার ঘুচিল, অমনই সে বসন্তাগমে পিঞ্জর-বাসী পাখীর মত, কণ্ঠের আনন্দ-গীতি রোধ করিতে পারিল না। Joy of Living পর্য্যন্ত না হইলেও—Wonders of Life আমাদিগকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং আমাদেরও সেই "সাহিত্যিক Renaissance revealed itself in the development of ideas and in new-found beauty of expression." "New-found beauty of expression!"—ইহার চেয়ে সত্য কি আর আছে! সেই হইতে বাঙালীর প্রাণ এক নূতন বাণী-দেহ লাভ করিয়াছে—new-found তো বটেই, কিন্তু

শুধুই "beauty of expression" নয়, সেই বাণীই সঙ্গীতের শতধারায়, নৃত্যের শত ভঙ্গীতে, চারুচরণে-ছায়া-মঞ্জীর বাজাইয়াছে! কেবল সেই 'childlike gaiety of response to the colour and arrogance of Renaissance culture,' অথবা 'a very festival of ardent and powerful youth' আমাদের জীবনে ঘটে নাই। তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, বরং ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জাতির ওই অবস্থাতেও, অন্তরে সেই নাগপাশ এবং বাহিরে গলরজ্জুর দৃঢ়বন্ধনসত্ত্বেও এ-জাতি এমন সত্যকার মুক্তির আনন্দ—শুধু আস্বাদন নয়—সৃষ্টি করিতেও পারিয়াছিল। উপস্থিত যাহা বলিতেছিলাম। অতি সুস্থ ও সহজাত যে ভোগ-পিপাসা তাহারই বলে বলীয়ান্ মানুষের এই পঞ্চেন্দ্রিয়-সনাথ দেহ, সৃষ্টির রূপ-সমুদ্রের তরঙ্গ-তাড়নে নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিবে, মানুষের প্রবৃত্তিনিচয়ের পবিত্রতা, তথা স্বাধীন ভোগাধিকার স্বীকার করিতে হইবে—নব মানব-ধর্ম্মের এই অপর মহামন্ত্র মধুসূদনের কাব্যসরস্বতীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই Paganism—এই তত্ত্বচিন্তাবর্জ্জিত ভোগবাদ, যুগ-প্রবৃত্তির সেই ত্রিধারা—জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের মূলে বিদ্যমান ছিল। রামমোহন যাহা যুক্তিবিচারের একটা নৈতিক (moral) বিধি দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর পরার্থ-পরতার দ্বারা তাহার সেই দিকটি আচ্ছাদন করিয়াছিলেন; মধুসূদন তাঁহার কাব্য-রচনায় ইন্দ্রিয়াধীন সুস্থ হৃদয়-বৃত্তিকেই মন ও অহঙ্কারের উপরে জয়ী করিয়া মানবত্বের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন। এমনই করিয়া নবযুগের নূতন ভাবধারা, বাঙালীর মেধা ও প্রাণশক্তির সহায়ে বেগবান হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

কিন্তু এই তরঙ্গ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলেও, খেলিবার মত গভীর ও অবাধ-বিস্তার জলাশয় ছিল না, বরং তলদেশে বহুকালসঞ্চিত পঙ্কই ছিল—আর ছিল সেই পঙ্কনিহিত সনাতনের বীজ। তাই প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, পঙ্কের আলোড়নে সমাজের নানা স্তরে যে বুদ্বুদরাশি উঠিতে লাগিল, তাহার কথা বলিয়াছি। মনুষ্যজীবনের প্রতি—মানুষের প্রতি—যে শ্রদ্ধা, তার পরিবর্ত্তে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহ ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে স্বাধীনতার আবেগ স্বৈরাচারের আবেগে পর্য্যবসিত হইয়াছিল,—ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নবশিক্ষিত বাঙালীর মেধা ও মস্তিষ্কশক্তি যে একটি আদর্শের প্রতি একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিলাতী বা খ্রীষ্টিয়ান নৈতিক শুচিতার আদর্শ—যত কিছু কুপ্রথা কুসংস্কার ও কু-আচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ও বিবেক নামক এক নূতন মানস-অভিমানের যুদ্ধ-ঘোষণা, জীবনে যুক্তিসম্মত নিয়ম-নীতির প্রতিষ্ঠা। অতএব, বাংলার Renaissance-এর সেই প্রথম যুগে, চিন্তায় বা কর্ম্মে কিংবা প্রাণের মুক্তিপিপাসায়, নব

মানবধর্ম্মের যে-লক্ষণ যত উৎকৃষ্টরূপেই প্রকাশমান হউক, মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বের, সর্ব্বসংশয়-মুক্ত কোন আদর্শের সন্ধান তাহাতে ছিল না। এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেমন কোথাও প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হয় নাই, তেমনই জাতির গূঢ়তর চৈতন্যেও এই নবধর্ম্মের সাড়া তখনও জাগে নাই।

তথাপি অন্তরের অন্তরে একটা বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছিল ; তাহার প্রমাণও আছে। তদানীন্তন সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্তরে যে Positivism ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে রামমোহনের সেই যুক্তিধর্ম্মের একরূপ প্রতিবাদ বলা যাইতে পারে ; ব্রহ্ম ও বিবেকের অজুহাতে আত্মপূজা না করিয়া, সেই যুক্তিধর্ম্মকে আর একটু বাড়াইয়া লইলেই যে নিরীশ্বরবাদে পৌঁছানো যায়, তাহাতে সেইরূপ ব্রহ্মের স্থানে প্রত্যক্ষ দেবতা মানবকেই স্থাপন করা ও তাহার পূজা যেমন সহজ, তেমনই যুক্তিসম্মত হয়। রামমোহনের ব্রহ্মবাদের মূলে বিজাতীয় ঈশ-তত্ত্বের প্রভাব আছে। কিন্তু এই মানব-হিতসাধন-ধর্ম্মের একটা নজির এই জাতির ইতিহাসেই আছে—Positivism যেন বৌদ্ধধর্ম্মেরই একটা আধুনিক বেশ। অতএব এই নব্যতন্ত্রের প্রতি যে অনুরাগ তাহার মূলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অলক্ষ্য উদ্দীপন ছিল, এমন কথা অসঙ্গত হইবে না। অন্যত্র খৃষ্টীয় ভক্তি-শাস্ত্রের যুক্তিবাদ চৈতন্য-ধর্ম্মের রসোল্লাসকে দমন করিতে পারে নাই—এই কালেই নব্যতন্ত্রে একজন বীর-বিশ্বাসী ও প্রধান প্রচারক অবশেষে তান্ত্রিক সাধনমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এ সকলই শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অভাবনীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বে। সে ঘটনার কথা এখন নহে। বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের লক্ষণ হিসাবে এগুলি অতিশয় মূল্যবান। রামমোহন যে বিচার-বুদ্ধিকে আর সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাতেই সেকালের সেই তামসিক জড়তাগ্রস্ত সমাজের প্রথম চৈতন্য সম্পাদন হইয়াছিল। এই বুদ্ধি-ধর্ম্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধা বা ভয়-ভক্তি সে যুগের নবশিক্ষিত সমাজের প্রায় সর্ব্বস্তরে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং সাক্ষাৎ বা গৌণ ভাবে পরবর্ত্তী সর্ব্ববিধ আন্দোলনের মূলে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানবগোষ্ঠীর সমবেত কল্যাণ বা উচ্চতম স্বার্থ-সাধন রামমোহনের ধর্ম্মের লক্ষ্য হইলেও তাহার মধ্যেই ব্যক্তির আত্মপূজার বীজ নিহিত ছিল ; বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে ইহার আকর্ষণ কিছু প্রবল হইবারই কথা। ইহার ফলে উদার মানব-প্রেমের পরিবর্ত্তে চারিত্রিক শুচিতার অতি কঠিন আত্মসন্তোষ, জীবনের বিশাল স্রোতে অবগাহন-স্নান না করিয়া, সেই স্রোতের আবিলতা হইতে দেহ-মনের শুচিতা রক্ষার আকিঞ্চন, মানুষকে শ্রদ্ধা না করিয়া তাহার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের অত্যধিক আগ্রহ—এক কথায় দেহের উপর মনকে, প্রেমের উপরে মর্‍্যালিটিকে স্থান দেওয়ার প্রবৃত্তিই দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছিল। ইহাও এক হিসাবে বিশুদ্ধ যুগপ্রবৃত্তির লক্ষণ, ভারতের সেই সনাতন ইহার চতুঃসীমানায় ছিল না।

ভারতবর্ষ যে-বুদ্ধিকে যে-জ্ঞানের সহায় বলিয়াছে, ইহা সে বুদ্ধি সে জ্ঞান নয়। ইহা ক্ষুদ্র হৃদয়ের অসহিষ্ণুতা—ইহাতে প্রেমও নাই, জ্ঞানও নাই। এইজন্যই বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় যে একটি শ্লোকের প্রতি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সে শ্লোকটি এই—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩। ৩৪

—'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'—রাগ, বা কোন কিছুর প্রতি (উৎকৃষ্ট হইলেও) আসুরক্তি, এবং দ্বেষ, অর্থাৎ কোন কিছুর প্রতি (অপকৃষ্ট হইলেও) বিরক্তি, এই দুইই সাধনার পরিপন্থী। যেখানে অনুরাগ, সেখানেও যেমন তুমি আত্মবশ নও, তোমার ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তিই তাহার কারণ; তেমনই যেখানে তুমি ঘৃণা বোধ কর, সেখানেও ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনা আছে, সেখানেও তুমি আত্মবশ নও। অতএব যাহা মানুষের মোহগ্রস্ত চৈতন্যের একটা বৃত্তি মাত্র, তাহাকেই উৎকৃষ্ট বিচারবুদ্ধির গৌরব দান করা মিথ্যাচাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ঐ বুদ্ধি উৎকৃষ্ট তর্কবুদ্ধি মাত্র; উহা দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায়—উহারই অনুশীলনে আত্ম-পর-ভেদ আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রেম—উহা সেই জ্ঞানের পরিপন্থী,—"To know all is to pardon all"—এই মহাবাক্যের বিরোধী। অতএব উহা উৎকৃষ্ট মানব-ধর্ম্মের সহায় হইতে পারে না। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, নবযুগের নূতন প্রবৃত্তিকে বরণ করিবার যে ভাবগ্রাহিতা-শক্তি, যে মেধা ও মনন-শক্তি তাহার পরিচয় আমরা এ যাবৎ যথেষ্টই পাইয়াছি, কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে আত্মসাৎ করিয়া জাতির সুচিরাগত ঐতিহ্য ও রক্তগত সংস্কৃতির রসে তাহাকে পরিপাক করিযা নূতন সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি তখনও দেখা দেয় নাই। তথাপি সেই কারণেই ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তির ভাবও জাগিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগকে যে ভাবে বরণ করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ করেন নাই। যুগের প্রতি তাঁহার সেই মনোভাব ও সেই মনোভাবের মূলে যে গভীর ও অপেক্ষাকৃত জটিল ভাব-গ্রন্থি ছিল, তাহা একটু খুলিয়া দেখিতে পারিলে,—বঙ্কিমের সেই দৃষ্টি ও তাঁহার সেই সৃষ্টির স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। আমি তাহাই বুঝাইবার জন্য এত ভূমিকা করিতেছি। বঙ্কিমের সেই মনোভাব সম্বন্ধে প্রথমেই একটা অপবাদের উল্লেখ করিব—তিনি য়ুরোপীয় ভাব ও আদর্শকে একটু গভীর ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সমাজের অনেকেই ইহা সত্য মনে করিতেন। আমিও অনেকবার, এমন কথাই বলিয়াছি। এক্ষণে এই অপবাদের সূত্র ধরিয়াই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব পরীক্ষা করিব। আমি একথাও বার বার বলিয়াছি যে, বঙ্কিমের প্রতিভা

সমন্বয়-সাধনের প্রতিভা, এবং তাহারও কারণ তাঁহার প্রতিভা সৃষ্টি-প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্র যুগকেও যেমন, সনাতনকেও তেমনই বরণ করিয়াছিলেন, বরং সনাতনের উপরে দৃঢ় নির্ভর ছিল বলিয়াই, তিনি যুগধর্ম্মের মর্ম্মও যেমন অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন—তেমনই তাহার সেই সত্যকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছিলেন। আমি এইখানেই সাহিত্যিক সৃষ্টি-প্রতিভার একটু ব্যাখ্যা করিব।

✓ভাবের দেহনির্ম্মাণই সৃষ্টি—এবং সৃষ্টিতে ভাবের ভাব-রূপ অপেক্ষা দেহ-রূপই অধিকতর মূল্যবান। দেহবিযুক্ত যে ভাব তাহা যতই সূক্ষ্ম সুন্দর বা উচ্চ হউক—তাহার গৌরব স্বতন্ত্র; দেহের উপাদানে তাহাকে স্পর্শগোচর করিতে হইলে, তাহার যে সীমাবন্ধন আবশ্যক, তাহার মত দুরূহ কাজ আর কিছুই নাই। কারণ, তখন তাহাকে একাধারে সসীম ও অসীম হইতে হইবে। প্রাকৃতিক সৃষ্টির যাবতীয় দৃশ্যে, এইজন্যই, খণ্ড ও অখণ্ড, মুহূর্ত্ত ও অনন্তের আভাস আছে—তাই সৃষ্টি এমন রহস্যময়। যাহার যেমন দৃষ্টি সে জগতের বস্তুনিচয়কে তেমনই দেখিয়া থাকে; কিন্তু যে কেবল জড়বস্তুকেই দেখে, সে সৃষ্টিকে দেখে না। সৃষ্টি কথাটির এই অর্থ অনেকেই জানেন না—সাহিত্যের সম্পর্কে এই অর্থ অতিশয় সুস্পষ্ট হইযা উঠিয়াছে। জগৎ ও জীবনের সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রকাশ বা ঘটনা—শুধু রূপ নয়, শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্র নয়—রূপকও বটে। এই রূপক-রূপ দেখিবার যে দৃষ্টি তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-দৃষ্টি। এখানে বস্তুরই রূপক-রূপের কথা বলিতেছি। বস্তুর মধ্যেই যে গভীরতর ইঙ্গিতময রূপ প্রকাশমান—বস্তুর উপরে ভাবের আলোকপাত নয়, তাহাকেই আমি বস্তুর রূপক-রূপ বলিতেছি। যেমন, যে মানুষটিকে আমি দেখিতেছি তাহার সেই ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই আমি এমন একটা কিছু সাক্ষাৎ করিতেছি যাহা তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ, অথচ সৃষ্টির সমগ্র-রূপ হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন নয়,—তাহার সেই ব্যক্তিসত্তার অর্থ ও সৃষ্টির অর্থ একই। এই দৃষ্টিই স্রষ্টার দৃষ্টি, এইজন্য ভাব অপেক্ষা বস্তুই স্রষ্টার পক্ষে অধিকতর মূল্যবান। এমনও বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর মধ্যে পূর্ণ আত্মপ্রবেশ করাইতে না পারিলে—Matter-এর মধ্যে Spirit-এর অনুপ্রবেশ না ঘটিলে—নিজেই বস্তুময় হইতে না পারিলে—স্রষ্টা হওয়া যায় না। এইজন্য প্রকৃত সৃষ্টিকর্ম্মে স্রষ্টার যে কল্পনাশক্তি নিয়োজিত হয়, তাহা মুখ্যতঃ বস্তুপরায়ণ—বস্তু আগে, ভাব পরে। জীবনকে আপনার মত করিয়া নয়—জীবনকে জীবনের মত করিয়া দেখা—সে-দেখার শক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ। সেইরূপ দেখার ফলেই বস্তুর বস্তু-রূপ রূপক-রূপে পরিণত হয়—অর্থাৎ সকল রূপক একই অর্থে অর্থবান হইয়া উঠে—যাহাকেই দেখি তাহাকেই একটা এক-কিছুর সাঙ্কেতিক বিগ্রহ বলিয়া মনে হয়।

সৃষ্টি অর্থে যদি বাস্তবেরই গূঢ়তর রূপের প্রকাশ বুঝি, বাস্তবকেই গভীরতর অর্থে অর্থবান করাই যদি সৃষ্টিকর্ম্ম হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টি-প্রতিভা

এক অর্থে বাস্তবপন্থী—ভাবপন্থী নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি সৃষ্টিকর্ম্মে দেহই মুখ্য—abstract নয়, concrete-ই আসল। সেখানে জীবন বলিতেও এই দেহই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়; জীবনকে দেখিতে হইলেও যেমন—দেখাইতে হইলেও তেমনই, এই দেহের রূপ ও রেখার সাহায্যে তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই দেখা যে কি, তাহাও বলিয়াছি—তাহাই সৃষ্টি-শক্তির মূল। ভারতের মহাকবি তাঁহার কাব্যের মঙ্গলাচরণকল্পে, শব্দার্থের মত নিত্য-সম্পৃক্ত পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন—ইহার যে গভীর অর্থটি সর্ব্ববিধ সৃষ্টির সম্বন্ধেই সত্য, তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াই ঐ উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কবিগণের উক্তি এমনই নিত্য-সত্যের বাহন হয়। আমাদের দর্শনের ভাষায় 'অর্থ' বলিতে যাবতীয় 'বিষয়' বা রূপ বুঝায়; 'এবং' শব্দ বলিতে তাহার সূক্ষ্মতর প্রতিরূপ বা Idea বুঝায়। একই তত্ত্বের স্থূল প্রকাশ—ঐ বস্তু, এবং তাহারই সূক্ষ্ম প্রকাশ—ওই শব্দ, নাম বা concept। সৃষ্টিতে ওই রূপ বা দেহই বড়। কিন্তু তাহা যথার্থ হইতে হইলে Idea-র যথাযথ প্রকাশও তাহাতে হওয়া চাই, অর্থাৎ সেই দেহ তাহারই দেহ হওয়া চাই। তাই কবি শব্দ ও অর্থকে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত নিত্যসংযুক্ত বলিয়াছেন। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রের মতে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর একেরই দুই রূপ,—শব্দ ও অর্থে কোন ভেদ নাই; তাই সৃষ্টির যে রূপ, তাহা ওই স্থূল দেহ-রূপ; দেহের জবানিতেই Idea-কে প্রকাশ করিতে হইবে—Idea-র পৃথক সত্তা নাই। ঐ Idea-ই রূপের সেই রূপক—রূপকে রূপক করিয়া তোলা, বস্তুকে বৃহত্তর বাস্তবের অর্থ-মহিমায় মহিমান্বিত করা, দেহের গণ্ডিতে ভাবের পদ্মাসন রচনা করা, জীবনের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিধি আবিষ্কার করা—প্রকৃত সৃষ্টিকর্ম্ম।

যে এই কাজ করে সেই সৃষ্টি করে, এইজন্য তাহার দৃষ্টিতে ভাব কখনও বস্তুরূপবর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারে না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এইরূপ সৃষ্টি-প্রতিভার মূলে আছে—ভাবকে সর্ব্বদা বস্তুরূপে দেখিবার শক্তি; আরও একটু গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই যে ভাবকে বস্তুরূপে দেখিবার শক্তি, এ শক্তি সাধারণ শক্তি নয়, কারণ ইহা সীমার বন্ধনে অসীমকে বাঁধিযাছে। শক্তি—অথবা, দেহের উপাদানে আত্মাকে রূপ দেওয়ার শক্তি—সীমাকে ভাঙিয়া অসীম করার শক্তি নয়; দুই বিপরীতের এই যে সারূপ্যসাধন ইহাকেই আমি সমন্বয় নাম দিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাইবে, এই সমন্বয়-সাধন যাহার প্রতিভার ধর্ম্ম সে তাহার ঐরূপ সৃষ্টিকর্ম্মের জন্য বস্তুকেই আগে বরণ করিবে, না ভাবকে—দেহকে, না আত্মাকে?—যদিও একটার সঙ্গে অপরটাকে যুক্ত করাই তাহার কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ স্রষ্টা—তাই জীবনের সেই রূপের উপাসক। তথাপি যুগকে বরণ করিবার কালে সনাতনকে তিনি অবহেলা করেন নাই, বরং ক্রমে

সেই সনাতনের আশ্বাস যত বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই তিনি মানুষের এই দেহদর্শী জীবনের ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করিয়া দেখিয়াছেন, এবং সেই য়ুরোপীয় ভাব-কল্পনার মোহে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিকৃতি আমাদের জীবন-চেতনাকে স্তিমিত করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে আমরা সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া শেষে সেই অবস্থাতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলাম—এই মানব-অধিকারবাদের উগ্র ভাবধারা সেই বিষয়েরই বিষৌষধ-স্বরূপ আশু-ফলপ্রদ হইয়াছিল। দেহই যে সকল সাধনার সাধন-বেদী, বস্তুজ্ঞানই যে ব্রহ্মজ্ঞানের আদি সোপান—এ জ্ঞান আবার ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। জাতির সেই প্রবুদ্ধ চেতনার পূর্ণ প্রস্ফুরণ হইল বঙ্কিমের প্রতিভায়। য়ুরোপ মানবীয় সাধনার মূল ভিত্তি দেহকে দৃঢ়রূপে ধরিয়াছে। সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ভর করিয়া সে যদিও মনুষ্যত্বের শিখরে উঠিতে পারে নাই, তথাপি তাহারই জীবন-বেদীতে যজ্ঞানল জ্বলিতেছে; এবং রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিতে না পাইলেও, সে তাহার অপর মুখে নিজ নিয়তির মহিমময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সে ভোগ-জীবনের চরম পরিণামকে—আত্মনাশের ট্র্যাজেডিকেই প্রাণের পূজা নিবেদন করিয়াছে। তথাপি মূর্চ্ছিত আত্মার মোহাবস্থা অপেক্ষা জাগ্রত দেহের মৃত্যুচেতনাও গরীয়সী। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সেই বিপরীত সাধনায় মানুষের যে অজেয় বীর্য্য,—তাহার অমৃত-পিপাসা নয়—মৃত্যু-পিপাসার যে অপরূপ রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই জীবনমন্ত্রে তাঁহার প্রথম দীক্ষালাভ। তথাপি য়ুরোপীয় ভাবধারায় তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হইলেও তাহার পরিণতি ঘটিয়াছিল ভারতীয় ভাব-দৃষ্টির আশ্রয়ে। তিনি মানুষের মনুষ্যত্বের উভয় সীমা—তাহার ঊর্দ্ধ ও অধস্তল—সমান বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে তাহার কেন্দ্রস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান যে দেহ, এবং প্রতিষ্ঠান যে আত্মা, এই দুইয়ের সংযোগ-স্থলে পরম সত্যের যুগ্মবেণী-সঙ্গম রচিত হইয়া আছে; এবং সেই সঙ্গমতীর্থের পুণ্য-বারির নাম প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্রের মানব-পূজার মূলমন্ত্রের একটু আভাস দিলাম, পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

নব জাগরণের গভীরতর কারণ

আমি বাংলার নবযুগ, সেই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি, জাতির চিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়া, এবং তদ্‌ঘটিত যে সমস্যা—ও সেই সমস্যারই সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার যে অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি, এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ তাহারই আলোচনা করিতেছি ; এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় এখানে অবান্তর। তথাপি এ আলোচনা মুখ্যতঃ সাহিত্যিক, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে ; তাই যুগ ও জাতির নানা তত্ত্ববিচারকালে সাহিত্যের তত্ত্বও আসিয়া পড়িতে বাধ্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেই সকলের মধ্যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ কতটুকু, এবং কোথায়। বিষয়টি জটিল ও বিস্তৃত হইবার আরও কারণ, ইহাতে দুইটি বিপরীত কাল্‌চারের সংঘর্ষ ও সমন্বয়-প্রয়াসের তত্ত্ব রহিয়াছে ; সেই সমন্বয়ে শুধুই ব্যক্তির প্রতিভা নয়, একটা জাতির অতিশয় মিশ্র ভাব-সংস্কার, এবং তাহারও অন্তস্তলে এক প্রাচীনতর সংস্কৃতির সমান প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা সেই সকল সংস্কার ও সংস্কৃতি—ভাব ও চিন্তার—সমাহার ও সামঞ্জস্য সন্ধান করিব ; তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান, দুইয়েরই সাহায্য লইতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙালীর তথা ভারতীয় মনঃপ্রকৃতিতে মানুষের জীবনকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টির মূলে কেবল ব্যক্তির দৈবী প্রতিভাই ছিল না, জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিও তাহার পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভাকে আমি বস্তু ও ভাবের অভেদ-দৃষ্টির প্রতিভা বলিয়াছি ; ইহাও বলিয়াছি যে, য়ুরোপীয় জীবনবাদ হইতেই তিনি সে বিষয়ে সাক্ষাৎ সজ্ঞান প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও সংস্কৃতির কথাও কিছু বলিয়াছি, এ কথাও বলিয়াছি যে, সকল উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা, যতই ব্যক্তিগত অথবা নৈর্ব্যক্তিক হউক—তাহা জাতি-মানসেরও প্রতিভূ। ভারতবর্ষের নবযুগ-উদ্বোধনে বাঙালীই যে পৌরোহিত্য করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ইহাই নয় যে, ইংরেজী বা য়ুরোপীয় বিদ্যার সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহারই হইয়াছিল ; সেই শিক্ষাকে বরণ করিবার আগ্রহ ও আত্মসাৎ করিবার শক্তিই মূল কারণ। ইহারও কারণ কি ? পূর্ব্বে বাঙালী-চরিত্র সম্পর্কে তাহা বলিয়াছি। বাঙালী যেমন সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়-নিরপেক্ষরূপে ভোগ

করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ী-পদ্মে তত্ত্বমধু-ভুঞ্জনের পক্ষপাতী—সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া মহাকাশের নির্ব্বিকল্প সমাধি-রস আস্বাদন করিতে সে চায় না; "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—ইহা বাঙালী কবিরই মন্ত্র-বচন, এমন কথা কোন যুগের কোন ভারতীয় কবি বলে নাই; ব্যক্তিবিশেষের কবিকণ্ঠে তাহা উদ্গীত হইলেও বাঙালীর পক্ষে ইহা নূতন নয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি, সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই সেই জাতির অবচেতন মন হইতে রস-প্রেরণা লাভ করে; অতএব এমন প্রতিভার সম্যক বিশ্লেষণ বা পূর্ণ পরিচয় করিতে হইলে জাতির ঐতিহ্য—তাহার চিরাগত সাধনার সন্ধান অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গক্রমে একটা অতিশয় অপ্রিয় সত্য এইখানে না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার পরিচয়মূলক গ্রন্থ ইতিমধ্যে একাধিক লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠে ইহাই প্রতীতি হয় যে, দেশ ও জাতির ইতিহাস, অন্তর্জ্জীবন ও অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহাদের অজ্ঞতা অপরিমেয় এবং যাহারা ইংরেজী ও (অনুবাদে) য়ুরোপীয় সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী (কারণ, সে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কাল্‌চার ও জীবন-সংস্কার সম্বন্ধেও সমান অজ্ঞ) তাহারাই বাংলা সাহিত্যের উপরে ইংরেজীবিদ্যার উচ্ছিষ্ট ছড়াইতেছে। সম্প্রতি বাংলার একখানি বিশাল-কলেবর ইতিহাস প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও কতিপয় মহাপণ্ডিত, নিজ নিজ বিদ্যা অনুসারে গণ্ডি-ভাগ করিয়া, অন্ধের হস্তিদর্শনকর্ম্ম অতিশয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ; অতএব একের সহিত অপরের বিষয়গত কোন যোগ নাই, না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এমন গ্রন্থে বাঙালীর জাতি জন্ম ও গোত্রের ধারাবাহিক পরিচয় এবং তাহার সংস্কৃতি ও সাধনার একটি অনবচ্ছিন্ন বিকাশ যে কেমন বিবৃতি হইতে পারে, তাহা সহজবুদ্ধিতে সকলেরই অনুমেয়। কিন্তু ইহাকেও 'বাঙালীর ইতিহাস' বলিতে হইবে। অথবা হয়তো ভুল আমারই, গ্রন্থের নাম, 'বাঙালীর ইতিহাস' নয়—'বাংলার ইতিহাস'; তাহাই বিজ্ঞানসম্মত। এমন ইতিহাসে কোন প্রকার অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রয়োজনই নাই, কেবল বহির্দ্দৃষ্টি থাকিলেই হইল; বুদ্ধির গজকাঠি ও ফিতা, শাবল ও কোদাল সেই ইতিহাস-উদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট। কেবল, ইট পাথর সংগ্রহ, ও তাহাতেই লেবেল মারিয়া খণ্ড খণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ ছাড়া আর যে কিছুই করিবার নাই, কারণ, উহাই যে খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! কল্পনার তো কথাই নাই, Intuition নামক যে চিৎ-বৃত্তি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য্য সহায়, তাহার একান্ত অভাবকেই, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির অজুহাতে চাপা দিয়া, এইরূপ পাণ্ডিত্যের জৌলুস বৃদ্ধি হয়। এই বাংলার ইতিহাস-গ্রন্থে এমন ব্যক্তিও পুরা-কালীন ইষ্টকসংগ্রহের মজুরবৃত্তি করিয়াছেন, যাঁহার সাধারণ বিদ্যার পরিমাপ করা অবশ্য আমার সাধ্য নয়, কিন্তু সংস্কৃত-

বর্ণজ্ঞানও যাঁহার আছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যই হউক, Economics-ই হউক, আর ইতিহাসই হউক, দেশীয় বিদ্যার সর্ব্বঘটেই এই-জাতীয় পাণ্ডিত্য পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। আমি পূর্ব্বে ভারতীয় সনাতন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছি; এক্ষণে আর একবার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শনের প্রেরণা ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য বাঙালীর সেই জাতিগত সংস্কার ও সাধনা-বিশেষেব একটু পৃথক পরিচয় দিব। ভারতীয় ভাবের দ্বারা যতই প্রভাবিত হউক, দেশের প্রাকৃতিক প্রভাব ও জাতির রক্তগত স্বভাবের গুণে বাঙালীর সাধনায় যে একটা বিশেষ লক্ষণ না বৈলক্ষণ্য আছে, তাহার প্রমাণ বাংলার বৈষ্ণব ও তন্ত্র-ধর্ম্ম। এই দুইয়ের মধ্যে তন্ত্রই আদি বা মূল বলিয়া মনে হয়, কারণ, বৈষ্ণব-সাধনার পদ্ধতি তান্ত্রিক না হইলেও তাহার মূলতত্ত্বে তন্ত্রের প্রভাব আছে; তাহার রাধা-তত্ত্ব তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বেরই প্রকার ভেদ। বৈষ্ণবের নাম-জপ বা নাম-কীর্ত্তনের তত্ত্বও তন্ত্রের মন্ত্রতত্ত্বের অনুরূপ। তাহা ছাড়া, তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নানা শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তান্ত্রিক সাধনা বাঙালীর ধাতুগত। তথাপি, তন্ত্রের জ্ঞানমার্গ ও বৈষ্ণবের ভাবমার্গ যতই বিপরীত হউক, এই উভয় সাধনায়, বেদান্ত যাহাকে নাম-রূপ ও অবস্তু বলিয়া পরিহার করে, বাঙালী তাহাকেই বস্তুর সহিত অভিন্ন করিয়া, সৃষ্টিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া, তাহারই সাহায্যে পরমের উপলব্ধি করিতে চায়। এজন্য বাঙালীর বৈষ্ণব-মন্ত্র বিশেষ করিয়া 'রসো বৈ সঃ'-এর মন্ত্র, এবং তাহাতে সে যেমন রূপকেই আশ্রয় করিয়া, এই জীবন ও জগৎকে ভাব-মন্ত্রে শোধন করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলোকেই অতীন্দ্রিয় রসপানের যন্ত্র করিয়া লইয়াছে,—তেমনই, তন্ত্রের জ্ঞানমার্গেও সে এই সৃষ্টিকে এই বিষয়-জগৎকে, আরও সাক্ষাৎ ও দৃঢ়ভাবে ধরিযা, বস্তুকে—ভাব-রূপে নয়, তাহাব অন্তরতম বস্তুরূপেই অপরোক্ষ করিয়া, আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে। এই দুই সাধনার কোনটিতেই খাঁটি সন্ন্যাস-বৈরাগ্য নাই; একটিতে অতিসূক্ষ্ম আত্মবিগলিত ভোগ, অপরটিতে অপ্রমত্ত বিষয়-সেবা; ভোগের এই দুই রূপেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে। তথাপি আমার মনে হয়, বাঙালীর দেহ-মন প্রাণের পূর্ণ প্রস্ফুটনের ইতিহাস ওই তন্ত্র-সাধনাতেই মিলিবে। একদিকে প্রকৃতির বজ্রকঠিন প্রবৃত্তি-বন্ধন, অপর দিকে পুরুষের আত্মিক মুক্তি-পিপাসা, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য—প্রকৃতি ও পুরুষের সামঞ্জস্য—বাঙালীর সাধনাতেই ঘটিয়াছে। বেদান্তের সেই অবস্তুকেই বস্তুতত্ত্বের অধীন করিয়া, তাহার সেই অবিদ্যাকেই মহাবিদ্যার আসনে বসাইয়া, সে সেই সনাতনেরই আরাধনা করিয়াছে। এমন আর কোন জাতি করে নাই; সেই তত্ত্বকেই সে যেন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে!

তাই বাঙালী সাধকের কণ্ঠে জীবন-সোমযাগের এমন নির্ভীক আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল,—

শ্রীসুন্দরীপূজনতৎপরাণাং হালাভিরালোহিতলোচনানাম্।
অস্মাকমানন্দিতমানসানাং মহেশ্বরাণাং দিবসাঃ প্রয়ান্তু॥
বিধায় ধারাং বদনে সুরায়াঃ শ্রীকৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য কুলক্রমেণ।
আস্বাদয়ন্তঃ পিশিতং মৃগাক্ষীমালিঙ্গ্য মোক্ষং সুখিনো লভন্তে॥

*　　*　　*

যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীপূজনতৎপরাণাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥

এ ধর্ম্মের মাহাত্ম্যই এই—

যোগো ভোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কৌলধর্ম্মে কুলেশ্বরি॥

"মোক্ষায়তে হি সংসারঃ"—এমন কথা আর কে বলিতে সাহস করিয়াছে?

উপরি-উদ্ধৃত প্রথম দুইটি শ্লোক আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর রুচিকর হইবে না। কিন্তু তথাপি ভয় পাইবার কারণ নাই; ওই তত্ত্ব বা ওই সাধনা এ যুগের উপযোগী নয়, এ যুগের জীবন-সাধনায় অতখানি তত্ত্বজ্ঞানের স্থান নাই—জীবনকে আর এক রূপে দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে; এই শুধুই জ্ঞান নয়, প্রেমের সাধনাও চাই; ব্যক্তির আত্মাকে দেহের জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াই পূর্ণ শক্তিমান করিয়া তোলার উপায় বা অনুকূল অবস্থাও আর নাই। আমিও কোন বড় তত্ত্ব বা ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসি নাই। যাঁহাকে এযুগের প্রতিনিধি বলিয়াছি, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও এই সাধনা বা সাধনতত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন না, সম্ভবতঃ ইহার সকল সংবাদও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু যুরোপীয় ভোগবাদের স্বরূপ তিনি বুঝিয়াছিলেন—সেই ভোগবাদকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই; বরং যে জীবন-দর্শন তাঁহার প্রতিভায় ধরা দিয়াছিল তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ এই দুইয়ের সম্বন্ধ তিনি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং মানুষের জীবনে এই দুইয়ের বিরোধকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে যে অভিনব ট্র্যাজেডির মহিমা দান করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে ভারতীয় মোক্ষবাদ ও অপরদিকে য়ুরোপীয় ভোগবাদ যেন লুকাচুরি খেলিয়াছে। দুইয়ের প্রতিই এই যে সমান শ্রদ্ধা, অথবা একটাকে বড় করিতে গিয়াও অপরটার প্রতি যেন প্রাণের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত—ইহার মূলে যে বাঙালীর সেই রক্তগত সংস্কারের—সেই তান্ত্রিক মনো-ভাবের—অজ্ঞান প্ররোচনা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; সেই শাক্ত প্রকৃতি-পূজার বহুতর লক্ষণ তাঁহার কাব্য-কল্পনায় ও ভাবনাচিন্তায় স্ফুটতর হইয়া আছে। সে আলোচনা যথা-প্রসঙ্গে করিব। এক্ষণে এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে, আমি বাঙালীর সেই জাতীয়

সাধনার—সেই তান্ত্রিক ভোগবাদের—আর একটু পরিচয় দিব, পরে কাজে লাগিতে পারে।

তন্ত্রোক্ত ভোগবাদ সেই সনাতন ভারতীয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অন্য দেশে কোন তত্ত্বই সাধনতত্ত্ব নয়—দার্শনিক চিন্তাবিলাস মাত্র; একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রই পালনীয়। এ দেশে তত্ত্বহিসাবেই কোন তত্ত্বের মূল্য নাই, যাহা সাধনমন্ত্ররূপে জীবনে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ নয় তাহার সত্য তত্ত্বের সত্য নয়। আমাদের সাধন-তত্ত্বে এই দেহকে পিণ্ডাণ্ড বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে—বিশাল বিশ্ব (macrocosm) এই ক্ষুদ্র বিশ্বে (microcosm) সমান বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই দেহঘটিত যাহা কিছু তাহার সর্ব্ব অঙ্গ ও সর্ব্ব বৃত্তি—সেই এক তত্ত্বের অধীন হইয়া একযোগে তাহারই পরিচর্য্যা করিতেছে। য়ুরোপীয় ভোগ-বাদের মূলে এরূপ কোন তত্ত্ব নাই, তাই এক হিসাবে তাহা খাঁটি প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা দেহধর্ম্ম বটে। তাহাতে ভোগের সহিত মোক্ষের, প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির কোন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই—morality নামক যে সংস্কার ক্রমে সেই ভোগ-প্রবৃত্তির অনুষঙ্গরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও নিবৃত্তি-সংস্কার নয়—ত্যাগের সহিত তাহার কোন সহজ সম্বন্ধ নাই; তাহাও সেই ভোগপ্রবৃত্তির নিয়ামক মাত্র। ভোগও যে একটা বৃহত্তর সত্যের অনুগত, এই বোধ তাহাতে নাই; বরং ভোগকে অবিশ্বাস করার ভাব আছে, এজন্য এই mora-lity-সংস্কার মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—তাহা য়ুরোপীয় জীবনের একটা বড় ব্যর্থতার কারণ। অথচ মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে ইহার মত স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। ইহাই মনুষ্যজীবনের একটা বাস্তব রূপকে অতিশয় প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের নবযুগে যে নব জীবন-বাদ এত শীঘ্র প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহারও একটা কারণ এই। ওই দ্বন্দ্বই আমাদের পক্ষে খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল—উহা হইতেই আমরা মনুষ্য-জীবনের বাস্তবতা যেমন নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, তেমনই উহারই কারণে, অধ্যাত্ম নীতির উপরে ঐ চরিত্রনীতিকে স্থান দিবার এমন আগ্রহ জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবধর্ম্মচিন্তায় ইহারই প্রভাব কিছু অধিক-মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়—তিনি ইহাকে স্বীকার করিয়াই ইহাকে অতিক্রম করিবার যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া-ছিলেন, তাহার আলোচনা পরে করিব—সে প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও বলিবার রহিল। এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, নবযুগের নবমানব-ধর্ম্ম এইরূপ ভোগবাদ ও তদনুধর্ম্মী চরিত্রনীতির গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নাই—ওই ভোগবাদের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধাও কিয়ৎ-পরিমাণে যুক্ত হইয়াছিল, নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় মনোবৃত্তি তাহাতে আকৃষ্ট হইত না।

কিন্তু আমি যে তান্ত্রিক ভোগবাদের কথা বলিতেছিলাম—তাহাতে কেবল দেহের

নয়—সমগ্র মানব-সত্তার শ্রেষ্ঠতম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় আছে ; প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ-তত্ত্বের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সে ভোগ প্রজ্ঞাবান আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের ভোগ—তাহা যোগযুক্ত ভোগ ; তাহাতে দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য-সাধন হয়। তাই তাহা একাধারে ভুক্তি ও মুক্তি। এ তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ; তথাপি পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমি কেবল একজন বিদেশী পণ্ডিত ও সাধকের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব, এবং তাহাও তাঁহারই ভাষায় ; তাহাতে সুবিধাই হইবে, কারণ ওই ভাষাই আধুনিক বাঙালীর রাজভাষা, দেবভাষা, এবং এক অর্থে পিতৃভাষাও বটে ; তাই অতি সহজেই শ্রদ্ধা জাগিবে, এবং সেই হেতু অর্থগ্রহণে কিছুমাত্র বাধা ঘটিবে না। একখানি বিখ্যাত তন্ত্র-গ্রন্থ * সম্পাদনকালে সুদীর্ঘ ভূমিকার শেষে উক্ত মনীষী তন্ত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

(১) The Shakta Tantra claims to give both enjoyment (ভুক্তি) in this and the next world, and liberation (মুক্তি) from all worlds. The claim is based on a profoundly true principle. If the ultimate reality is the one which exists in two aspects—if quiescent enjoyment of the self in liberation from all form, and—of active enjoyment of objects (বিষয়), that is, as pure spirit, and spirit in matter, then a complete union with Reality demands such unity in both of its aspects ...... There is no real incompatibility between the two, provided action is taken in conformity with the universal law of manifestation.

(২) It is the one Shiva who is the supreme blissful experience, and who appears in the form of man with a life of mingled pleasure and pain. Both happiness here and the bliss of liberation here and hereafter may be attained if the identity of these Shivas be realised in every human act. This will be achieved by making every human function, without exception, a religious act of sacrifice and worship.

(৩) It is not merely the separate individual who thus acts and enjoys, it is Shiva who does so *in* and *through* him...His life and all its activities are conceived as part of the divine action in Nature (শক্তি) manifesting and operating in the form of man. He realises in the pulsing beat of his heart the rhythm which throbs through, and is the sign of the universal life. To neglect or to deny the needs of the body, to think of it as something not divine, is to neglect and deny that greater life of which it is a part, and to falsify the great doctrine of the unity of all and of the ultimate identity of Matter and Spirit.

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে আমার আর কোন কথা যোগ করিবার নাই।

* The Serpent Power, being the Shat-Chakra-Nirupana, Translated from the Sanskrit with Introduction and Commentary, by Arthur Avalon, Ganesh & Co. Madras, 1924

কেবল ইহাই আর একবার স্মরণ করাইব যে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদে যাহার অঙ্কুর, শাক্তের এই শক্তিতত্ত্বে তাহারই পূর্ণ বিকাশ ; এবং ইহাও স্মরণ করিতে বলি যে, হিন্দু-সাধনার ইতিহাস উপনিষদের যুগেই শেষ হইয়া যায় নাই—সেই এক তত্ত্বের অনেক experiment—জীবনে তাহার উপলব্ধির নানা পন্থা—সেই ইতিহাসকে বৃহৎ বিচিত্র ও গৌরবময় করিয়াছে। আরও স্মরণ করাইতে চাই যে, যে বাঙালী-জাতিই এই নবযুগের নব ভাবগঙ্গাকে জহ্নুর মত পান করিয়া জানু-পথে বাহির করিয়া দিয়াছে—সেই জাতি ওই তত্ত্বকেই একদা তাহার সাধন-বস্তু করিয়াছিল, এবং এখনও তাহার দেহমনের তন্ত্রীরাজিতে সেই স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

এই যে তন্ত্র-তত্ত্ব ইহা আধুনিক 'ফিলজফি' নয়—চিরযুগের জীবন-সত্য ; সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু—মুখ্যতঃ experimental। এই তন্ত্রধর্ম্মে আধুনিক জীবনবাদের সাদৃশ্য বা সমর্থন কতটুকু আছে, তাহা আশা করি আর দেখাইয়া দিতে হইবে না ; কোথায় ইহার সহিত বরোধ, তাহাও সহজেই বুঝা যাইবে। এ যুগের সাধনা সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের সাধনা—সাধারণ মনুষ্যপ্রকৃতির উপরেই তাহার ভিত্তি। কিন্তু এই সাধনা ব্যক্তির—সমষ্টির নয়, ইহাতে সমাজ মুখ্য নয়, ব্যক্তিই মুখ্য। তথাপি ইহার যে সত্য তাহাও সনাতন, তাহার প্রমাণ, ইহার বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি যেমনই হউক—ইহার ওই তত্ত্ব আজিকার মানবধর্ম্মবাদের মধ্যেও উঁকি দিতেছে, কেবল সাধনার পদ্ধতিটাই আধুনিক জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। জীবনের কিছুকেই বর্জ্জন নয়, গ্রহণ করিবার যে আকূতি—এই দেহটা যে কোন অর্থে অশুচি নয়, ভোগের অধিকার যে একটা বড় অধিকার—মানুষের প্রাণের সেই নূতন অনুভূতি, ইহাতে, শুধুই অনুমোদন নয়, একটা বড় তত্ত্বের আশ্রয় পাইতেছে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে উপরে যে ইংরেজী বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাদের সম্পর্কে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিব। উহাতে যে তন্ত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আধুনিক বাঙালী কবি ও মনীষীর অতি গভীর সাহিত্যিক প্রেরণায় তাহার প্রভাব যে কত স্পষ্ট, তাহা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বকে পূরাপূরি গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তিনিও যে, নিজের অজ্ঞাতে এই মন্ত্রে কতখানি প্রভাবিত হইয়া ছিলেন, তিনিও যে কত বড় শাক্ত, তাহা যথাস্থানে দেখাইব ; এখানে শুধুই 'বন্দে মাতরম্'-গানটির দেবতা ও তাহার সেই বাঙ্ময় মন্ত্র-রূপটির প্রতি একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ ও ভারতীয় ব্রহ্মবাদ, এই দুইয়ের মধ্যপন্থার সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তন্ত্রপন্থী হইতেই হইবে। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মবাদ যাঁহার কবিশক্তিকে এমন উজ্জীবিত করিয়াছিল, সেই রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনাতেও এই তন্ত্র-তত্ত্ব কত রূপে ও কত রঙে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে

বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের সত্যই কোন কারণ নাই, আমি তাহাই বার বার বলিয়াছি ; রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব যত বড়, তাঁহার বাঙালীত্বও যে তত গভীর। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিহিসাবে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ 'সনাতন'-পন্থী ; তিনি ভারতের সেই সনাতনকেই যুগের উপরে সর্ব্বদা তুলিয়া ধরিয়াছেন—যুগের মধ্যে সনাতনকে না দেখিয়া যুগকেই সনাতনের মধ্যে দেখিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালীর সেই রক্তগত ভোগবাদ, অতি সূক্ষ্ম আকারে—উপনিষদের আনন্দবাদের ছদ্মবেশে, তাঁহার কবি-জীবন অধিকার করিয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যে, ভাব ও বস্তুর মিলনাত্মক সৃষ্টি-কর্ম্ম তেমন সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও—ভাবই এমন রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপ-পিপাসাই তাঁহার তান্ত্রিকতা। ইহার একটি উদাহরণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।··· অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ" ; ইহার সহিত "মোক্ষায়তে হি সংসারঃ" বচনটির গূঢ় তাৎপর্য্য মিলাইয়া দেখিলেই হইবে ; তাঁহার "জীবন-দেবতা"ও ওই তান্ত্রিক সাধনাতত্ত্বের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—উপরে (২)-চিহ্নিত ইংরেজী বাক্যগুলি সেই সাক্ষ্যই দিবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি—ওই (৩)-চিহ্নিত ইংরেজী কথাগুলি যেন তাহারই গদ্যানুবাদ।—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্,
সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন।

এবারকার আলোচনায় দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইল—প্রথম, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে নবজাগরণ হইয়াছিল, তাহার সবটাই যুগপ্রবৃত্তি বা য়ুরোপীয় প্রভাবের বশে ঘটে নাই ; যখন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিল তখন জাতির গূঢ়তর চৈতন্যে সাড়া জাগিয়াছে, অতএব বাঙালীর নিজস্ব দানও তাহাতে ছিল। দ্বিতীয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কবি-মনীষিগণ ভুঁইফোঁড় ছিলেন না—তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রতিভায় জাতির সংস্কার এবং সংস্কৃতিও শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল।

অতঃপর আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনমন্ত্রের সন্ধান করিব।

বাংলার নবযুগ প্রসঙ্গে আমি যে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি, তাহাতে দুইটি বস্তুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি—একটি, ওই যুগের নব মানব-ধর্ম্মের প্রেরণা ; এবং দ্বিতীয়টি, দেশ ও জাতির তদানীন্তন অবস্থায়, তাহারই প্রভাববশে একটা গভীরতর ও জটিলতর সমস্যার উদ্ভব—দীর্ঘকালের জড়তা ও অবসাদের উপরে একটা প্রবল ধাক্কার

ফলে, সেই নব-জাগরিত চেতনায় একটা সংশয়-সঙ্কটের দিশাহারা ভাব। ইংরেজী-শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কট এত দিকে এত আকারে, জাতির ভাবচিন্তা, ও আত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতেছিল যে অবশেষে তাহার একটা সমাধান না হইলে যেন জাতিহিসাবে টিকিয়া থাকাও দুরূহ হইয়া উঠিবে। প্রায় দিশাহারার মতই নানা পথে ছুটাছুটির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল—মূল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পরিবর্ত্তে, কতকগুলা উপসর্গ নিবারণের চেষ্টাই চলিতেছিল ; সমষ্টিভাবে উদ্ধারের উপায় চিন্তা না করিয়া, ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ভাবে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক আদর্শের সাধনাই—সমাজের উচ্চ স্তরে ক্রমশঃ বরণীয় হইয়া উঠিতেছিল। নব মানব-ধর্ম্মের প্রেরণাও একটা অতিশয় অগভীর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, কেবল কতকগুলি বাহ্যিক ও অনুকরণমূলক সংস্কারকর্ম্মে চরিতার্থ হইতে চাহিল। এই আদর্শের প্রধান সাধন হইল—জ্ঞানবিচারের বুদ্ধিবৃত্তি, এবং সাধ্য হইল—morality বা নৈতিক শুচিতা। দেহধর্ম্মকে গৌণ এবং মনোধর্ম্মকেই মুখ্য করিয়া এই যে মনুষ্যত্ব-সাধনা, ইহার নিঃশ্রেয়স হইল একরূপ ব্যক্তিগত আত্মসন্তোষ—সৃষ্টির সর্ব্ববিধ রূপে এবং সর্ব্বজনের জীবনে ব্রহ্মের প্রকাশ না দেখিয়া, ব্যক্তির মার্জ্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিবেক নামক এক নবলব্ধ অহঙ্কারপ্রবৃত্তির উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যে আত্মোন্নতিসাধন—তাহাই হইল মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা। ইহাতে মানব-প্রেমের উদারতা ছিল না—মানব-কল্যাণ নির্দ্ধারণের ঔদ্ধত্য ছিল ; একরূপ আত্মপ্রবঞ্চনাই ছিল। আত্মপূজাতেই যাহার পূর্ণ-পরিণতি—যাহা শেষ পর্য্যন্ত একরূপ self-righteousness বা আত্মগৌরবমূলক ধার্ম্মিকতা, যাহা সহজ ও ব্যাপক মানবীয় সহানুভূতি বা মানবপ্রীতির অন্তরায়, তাহাকেই মানবনির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠ কল্যাণলাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বা করাইতে বাধিল না। নব মানবধর্ম্মের মূল ও প্রধান প্রেরণা যে মানব-প্রীতি এবং মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ—তাহার প্রয়োজন ইহাতে ছিল না, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। এ আদর্শ প্রেমহীন ; ইহার সত্যও মনের সত্য—প্রাণের সত্য নয় ; অতিসূক্ষ্ম অহঙ্কারপ্রসূত বুদ্ধিই ইহার উপজীব্য।

অতএব ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব সমুদ্রবৎ বিস্তার লাভ না করিয়া ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র পল্বলে বদ্ধ হইতে চাহিল ; ইহার যে গভীরতা তাহাও ওই পল্বলের তলগভীরতা ; এ যেন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া সেই সমুদ্রের সৈকতে কূপ খনন করিবার প্রবৃত্তি, এবং তাহারই গণ্ডিতে সমুদ্রকে ধরা দিবার জন্য আহ্বান করার স্পর্দ্ধা। কিন্তু পশ্চিম হইতে যে ডাক আসিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না, এই পূর্ব্ব-ভূভাগের যে গভীরতর জলরাশি এতদিন অনুদ্বেল অবস্থায় যুগ-সঞ্চিত বালুকার বাঁধে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—সেই ডাকের আঘাতে তাহাতেই সাড়া জাগিল—Deep called

unto deep ;—তাহার মধ্যে যেটুকু সত্য ও চিরন্তন তাহারই কল্লোলধ্বনি—বাস্তব ও সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের সেই চেতন-বাণী এ পারের দেহচৈতন্যহীন সুষুপ্ত আত্মাকে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলিল।

প্রতিভাকে দেশ কাল ও জাতি-নিরপেক্ষ একটা পাত্রগত বা ব্যক্তিগত দৈবীশক্তির স্ফুরণ বলা হইয়া থাকে ; মতান্তরে, জাতির মগ্নচৈতন্যে যাহা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাই কোনও যুগসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই, ব্যক্তিবিশেষে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া—সেই জাতিরই আত্মরক্ষা বা আত্মস্ফুরণের প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্যশক্তিরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই দুই মতই সত্য, এবং প্রতিভারও প্রকারভেদ আছে। দেশ, কাল ও জাতিকে অতিক্রম করার প্রবৃত্তিও এক শ্রেণীর প্রতিভার লক্ষণ বটে ; সেখানে যুগ বা জাতির নয়—সনাতনের প্রেরণাই প্রবল। এরূপ প্রতিভা জাতির শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে অতিক্রম করে ; সে যেন সর্ব্বজাতিকে জাতিবিশেষের দান। তথাপি সেই দানে একটা বিশিষ্ট জাতির বিশেষ সংস্কৃতির জয় ঘটিয়া থাকে ; যাহা মূলে কোন এক অংশে সর্ব্বমানবীয় তাহাই—একটা বিশেষ জাতির প্রতিভায় বিশেষরূপে ধরা দিয়া থাকে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রতিভাও আছে, তাহা সেই জাতিরই ইতিহাস—কালধর্ম্মে—তাহারই বিশেষ প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়, জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার উদ্যম যেন সেই একের ভিতরে পূর্ণশক্তি ধারণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণীব প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের যত-কিছু চিন্তা —তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ও কর্ম্ম—স্বজাতির কল্যাণচিন্তাতেই গণ্ডিবদ্ধ হইয়া আছে ; তাঁহার সাহিত্য-তপস্যার কোথাও একটি পঙ্‌ক্তি নাই যাহাতে সেই অসাধারণ কবি ও মনীষীর আত্মভাব বা আত্মচিন্তার প্রচারচেষ্টা আছে। স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশ— এই তিনে-এক বা একে-তিন ছাড়া তাঁহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না ; জাতির জীবনে এমন করিয়া আপনাকে মিলাইয়া বিলাইয়া দেওয়া—ওই ধরণের প্রতিভায় কুত্রাপি ঘটিয়াছে কি না জানি না, ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনে করি ; ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা বা মনুষ্যজীবনের অর্থসন্ধান—যাহাই তিনি করুন না কেন, সকল চিন্তাই স্বজাতির কল্যাণচিন্তায় শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই ; যথোপযুক্ত উপকরণ ছিল কি না—এখনও আছে কি না, জানি না ; থাকিলে সেই উপকরণ হইতে বঙ্কিমের ন্যায় পুরুষের পূর্ণায়তন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিবার মত সৃষ্টিশক্তি একালে কাহারও আছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, বরং ভয় হয়, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পাছে একটা অপকর্ম্ম ঘটে। কিন্তু তেমন জীবনবৃত্ত না থাকিলেও বঙ্কিমকে চিনিয়া লইবার পক্ষে তাঁহার রচনাবলী এক অর্থে যথেষ্ট, কারণ, বাংলাসাহিত্যে Personality বা পুরুষ-বৈশিষ্ট্যের এমন প্রবল ও স্বচ্ছ প্রকাশ আর কোথাও নাই।

সে পুরুষ সূক্ষ্ম ভাব-চিন্তার একটা সাহিত্যিক শরীরধারী পুরুষই নয়; সেখানে রক্ত-মাংসের বাস্তব মূর্ত্তিকে আড়াল করিয়া তাহারই একটা ভাবময় প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইয়া নাই; সেই রচনাবলীর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সকল জ্ঞান বুদ্ধি কল্পনা ও বিচারশক্তিকে প্রদীপ্ত করিয়া যেন একটা প্রাণের নিশ্বাস স্ফুরিত হইতেছে—তত্ত্বও একটা মানুষের মুখাবয়ব ধারণ করিয়া জীবন্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। এমনই সর্ব্বত্র, এ পুরুষকে কোথাও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। সেই রচনাবলীর মধ্যে সেই পুরুষের রাগ ও বিরাগ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, প্রেম ও বিদ্বেষ, আশা ও ভয় যেমন সুস্পষ্ট তেমনিই অকপট, অথচ এ সকলের একটিও ব্যক্তিঘটিত নয়—তেমন অভিপ্রায়ের দূরতম আভাস কোনখানে নাই। দেশ, জাতি ও সমাজের হিতার্থে এই যে আত্মবিলোপ, ইহার পৃথক প্রমাণ চাহিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করাই হইবে—তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তিই তাহার প্রমাণ; বরং একালে ইহাই তাঁহাব অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিশ্বমানবের প্রেমে যাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ ও দেশ ভুলিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিমের এই মনোবৃত্তিকে তাঁহাদের নিজেদের উচ্চভাবের তুলনায় অতিশয় সঙ্কীর্ণ বিবেচনা করিযা অতি-আধুনিক 'কুলচুরী' সমাজে তাঁহার নামোল্লেখ করিলেও লজ্জাবোধ করেন—ইহা অত্যুক্তি নয়। তথাপি প্রসঙ্গের খাতিরে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সঙ্কীর্ণতার—স্বজাতির কল্যাণ-কামনায় আত্মাভিমান ত্যাগের—একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। ঘটনাটি এই—

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ও জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, তখন বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্ম মনীষিগণ তাহার প্রতিবাদে, 'তত্ত্ববোধিনী', 'সঞ্জীবনী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি পত্রিকায তাঁহাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া কতকগুলি সমালোচনা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উত্তরে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু শেষে 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের একটি আক্রমণ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, তাই আদি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্দেশ করিযা তিনি একটি কৈফিয়ৎ বা নিবেদন 'প্রচারে' প্রকাশিত করেন। আমি এই ঘটনাটিকেই বড় করিয়া, সেকালের সেই বাদবিসম্বাদের সাম্প্রদায়িক দলাদলি উপভোগ করাইতে চাহি না—তাই সেই বাদ-প্রতিবাদের সবটুকুই বাদ দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ৪৫।৪৬,—তখনও বৃদ্ধ হন নাই, এবং তখন তিনি রবীন্দ্রনাথেরই মতে "বাংলা দেশের প্রধান লেখক", "মুখ্য লেখক" (রবীন্দ্রনাথ নাকি উক্ত বক্তৃতা পাঠকালে এই 'মুখ্য' শব্দটির একটু তীব্রতর উচ্চারণ করিয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদও পাইয়াছিলেন)। কিন্তু খ্যাতি ও সম্মানের সেই শিখরে বসিয়াও, এবং বয়োধর্ম্মে রক্তের উষ্ণতা হ্রাস না পাইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই নিবেদনের ভাষায় ভাবে ও ভঙ্গীতে যে বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে, বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ আচরণ স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

সেই উক্তিগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের উন্নতি ও জাতির মঙ্গলকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য করিয়াছিলেন—তজ্জন্য ধর্ম্মবিষয়েও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ব্যক্তিগত মান-অপমানবোধ তিনি অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। মত যতই বিরুদ্ধ হউক, যাহাদের দ্বারা দেশের ও দশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহাদের নিকটে নিজের হীনতা স্বীকার করিতেও তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২।২৩ বৎসর মাত্র; সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পবিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহের অন্ত ছিল না; তাই ববীন্দ্রনাথেব আক্রমণে অতিশয় আঘাত পাইলেও, সেই মমতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বশে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা জাতিগতপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপযুক্ত। নিম্নে সেই লেখাটির মাত্র দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইযাছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারাযণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ-বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইযাছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গলা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিরাছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয নাই, বা হইতে পারে না—যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ-বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি বিবাদ-বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব, এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় অবশ্য করিবেন।

(২) উপসংহারে রবীন্দ্রবাবুকে একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপরে আমার বড় ঘৃণা আছে।…(এইরূপ সত্যানুরাগ) এখন বিলাত হইতে ইংরেজীর সঙ্গে বড় বেশি পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্র-প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, "Lie direct" সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু তভটা কপটতা ছিল না। দুইটিই মহাপাপ।…কিন্তু ইংরেজী পাপটা বড বাড়িয়া উঠিতেছে। · রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিষা দিতেছি! ঘটিযাছে এমন বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এইটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এইজন্য বলিলাম। তিনি এত অল্পবয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতিসাধন করুন। [বঙ্কিমচন্দ্রের এই আশীর্ব্বাদ ও সাবধানবাণী—দুইই আমি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে বলি—দুইই prophetic।]

এই প্রসঙ্গে আর এক স্থান হইতে বঙ্কিমচন্দ্রেব কযেকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেও তাঁহার অন্তরের সেই এক আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 'বঙ্গদর্শনের' দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন

কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে, দুর্গম কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।...কিন্তু কই, আমি ত' কুলীমজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত' শুনিলাম না।

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই গুরুতর সমস্যা-রূপিণী Sphinx-রাক্ষসীর সম্মুখে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি, তথা ভারতীয় প্রতিভার প্রতিভূরূপে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি কোন নেতৃত্বের কাজ করেন নাই; কেবল ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সেই সকল প্রয়াসে স্থায়ী সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে—তৎসম্পর্কিত ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি জাতির চিত্তকে কর্ষণ করিবার ভার লইয়াছিলেন; জাতীয় সংস্কৃতিকেই একটা নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ—শুধুই তাঁহার নিজের কালে নয়, পরবর্ত্তী কালেও একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই পাওয়া যায়। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এখনও এ জাতির চিত্তে যে নূতন ভাবচিন্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা লক্ষিত হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাবনাতেই তাহা মিলিবে; অর্থাৎ সেইরূপ প্রবৃত্তির জাগরণ তাঁহা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক সমস্যার চিন্তা তিনি করেন নাই—সে কাজ তাঁহার ছিল না। তিনি আরও ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছিলেন; যাহাকে আধুনিক যুগ বলে সেই যুগের যুগোচিত জীবন-দর্শন তাঁহারই প্রতিভায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনিই সর্ব্বপ্রথম পুরাতনের দৃষ্টিকোণকে নূতনের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন; ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার মুখ্য কীর্ত্তি। শুধুই বাংলার নয়—সে যুগের সারা ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয় ছিলেন তিনিই, তাই সেকালের এক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রকে—"The greatest man of the nineteenth century" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধন-মন্ত্র এই অর্থে আধুনিক যে, তাহা মানুষের স্বভাব বা দেহ-ধর্ম্মের অনুকূল; আবার আর এক অর্থে তাহা পুরাতনও বটে,—কারণ, তাহা জাতির মজ্জাগত সংস্কার ও ইতিহাসগত সংস্কৃতির বিরোধী নয়। নবযুগের সেই নবভাবের প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্রকে অতি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল,—শুধুই সাহিত্যিক কলাবিলাস বা তত্ত্বানুশীলনের সুখকর উৎকণ্ঠা নয়, অথবা ব্যক্তি-জীবনের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির ভাবনাই নয়—নিজ জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাঁহার সাহিত্য-কর্ম্মকেও কঠিন তপশ্চর্য্যায় পরিণত করিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই সমাজের মুক্তিকেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহার বীজ কবে কোথা হইতে তাঁহার চেতনায় উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়, অথবা ইহাও তাঁহার প্রতিভার মতই একটা প্রাক্তন সংস্কার—তাহা বলা কঠিন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচয়িতারূপেই বাংলা সাহিত্যে

তাঁহার প্রথম আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বে তিনি কোন্ সাধনায় কোন্ পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সেই অধ্যায় এখনও রহস্যাবৃত হইয়া আছে। সাহিত্যস্রষ্টা কবিরূপে তাঁহার সেই প্রথম প্রয়াসের পূর্ণসাফল্য বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়; কারণ ঠিক তদুপযোগী সাহিত্যিক চর্চ্চার কোন নিদর্শন তাহার পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। বাংলা ভাষার সেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ রোমান্সখানিতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে বঙ্কিমচন্দ্র নামক একজন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী যুবক বিলাতী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রস ও রূপ একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এই রসও সম্পূর্ণ আধুনিক; ইহাতে নর-নারীর হৃদয়বৃত্তিকে যে ধরনের কাব্যমহিমায় মণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে মনুষ্যচরিত্রের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি; কল্পনার সেই ঐশ্বর্য্য বাস্তবেরই পূজাসম্ভার, তাহার দেশ কাল ও পাত্র যতই ঊর্দ্ধগত হউক—মানুষের বাস্তব হৃদয়ের কাহিনী ও মনুষ্যজীবনের নিয়ত-নিয়মের লীলা তাহার পার্থিবতাও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের ইহাই প্রথম পরিচয়—যে পরিচয় একজন জীবন-রস-রসিক কবি-পুরুষের পরিচয়। এই পরিচয় উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল; বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ কাব্য-সৃষ্টিতেই মাতিয়া উঠিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই এই কাব্যকল্পনা 'কপালকুণ্ডলা'য় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল—বঙ্কিমের প্রতিভা যে কত বড় কবি-প্রতিভা, এবং তাহার উন্মেষ যে কত দ্রুত, ওই কাব্যই তাহার প্রমাণ। ইহারও অনতিকাল মধ্যে তাঁহার ঔপন্যাসিক রসকল্পনার আবেগ 'বিষবৃক্ষে' সৃষ্টিশক্তির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যেন শান্তি-লাভ করিল। এতদিন তিনি যেন কাব্যকল্পনার সম্পূর্ণ বশীভূত ছিলেন, অতঃপর সেই কল্পনাকে তিনি নিজেরই বশীভূত করিয়া তুলিলেন। ইহার পূর্ব্বে কেবল 'মৃণালিনী'তেই, নিছক রসপ্রেরণায় কিঞ্চিৎ ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল; কিন্তু পরে এই ভাবান্তর গূঢ়তর, এবং দৃষ্টি গভীরতর হইয়া, শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' পর্য্যন্ত, কেবল প্রত্যক্ষ মানব-চরিত্র বা মানুষের নিয়তিই নয়,—সমগ্র মানব-জীবনের রহস্য-সন্ধানে, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই দিককেই, কাব্যকল্পনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। নিছক কাব্যকল্পনা আর একবার মাত্র, প্রায় সর্ব্বশেষে—'রাজসিংহে'র সেই জেবউন্নিসা-মোবারক কাহিনীতে—শেষ ও চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল; তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমের কবি-দৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল—তিনি জীবনকে যখন যে দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকুন, কোথাও সেই কবিদৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমের কবি-জীবন ও সাহিত্যিক প্রতিভা; বঙ্কিম-সাহিত্যের দুই ধারা; বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন ও স্বজাতি-প্রেম; নবযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবনের এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ইহা হইতে দুইটি বিষয় অনুমান করা যায়, সে কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। প্রথম—য়ুরোপীয় কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ফলে,—মধুসূদনের মত, বঙ্কিমচন্দ্রেরও—মনুষ্যপ্রকৃতি ও মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে অতি গভীর শ্রদ্ধা ও গৌরব-বোধ। বঙ্কিমচন্দ্র শুধুই য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের অনুশীলন করেন নাই, তিনি য়ুরোপীয় ইতিহাস বিজ্ঞান ও দর্শন, বিশেষতঃ ইতিহাস-চর্চ্চা, কিছু অধিক পরিমাণেই করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার চিত্তেও—য়ুরোপীয় বিদ্যার নানা অঙ্গে হেলেনীয় (Hellenic) জীবন-দর্শনের সেই প্রভাব—য়ুরোপীয় রেনেসাঁর সেই প্রকৃতিবাদ-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই, মনুষ্যজীবনের গৌরব ও তাহার সত্যকার দাবিকে নিঃসংশয় করিয়া তুলিয়াছিল; সেই বীজ হইতেই তাঁহার সাধনা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়,—পরে, তাহারই পরিপোষকরূপে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন তাঁহার মনে—প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও সেই সৃষ্টির অন্তর্গত এক মহানিয়মের ধারণাকে দৃঢ়মূল করিয়াছিল। একদিকে সেই সাহিত্যের যেমন 'Power' বা প্রাণ-শক্তির দিক, অপর দিকে তেমনই তাহার অপরাংশের সেই 'Knowledge' বা তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের দিক—এই দুই-ই তাঁহার সহজাত প্রতিভার সমান পুষ্টিসাধন করিয়াছিল; চিত্তের এমন পূর্ণ-জাগরণ সেকালে আর কাহারও হয় নাই; প্রাণের জাগরণ ও মনের জাগরণ প্রায় একই সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। তথাপি প্রথম যৌবনের স্বভাবধর্ম্মে তিনি মনুষ্যজীবনঘটিত কাব্যরসের সেই বিষামৃত-আস্বাদনেই অধিকতর প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে কবিমানসের সেই রসপিপাসায় আর এক পিপাসা যুক্ত হইল; জীবনের কেবল সেই প্রত্যক্ষ রূপের কাব্যমহিমাতেই তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই; তাহার পশ্চাতে যে অপ্রত্যক্ষ নিয়তি, যে দুজ্ঞের্য় রহস্য উঁকি দিতেছে—যাহাকে এক ইংরেজ কবি 'Burden of the Mystery' বলিয়াছেন—তাহার অতি-গম্ভীর ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘায়ত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসার দিকও প্রবল হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা—ক্ষুদ্র বা খণ্ড আকারে জিজ্ঞাসা নয়, একেবারে মনুষ্য-জীবনের বা মনুষ্যত্বের মূল-সন্ধান। এই জিজ্ঞাসাও প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে—প্রাকৃতিক বিধানকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া; অর্থাৎ, মানুষের দেহ জীবনের যত-কিছু তথ্যকে, তাহার স্বভাবের সকল লক্ষণকে—

সৎ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া। Humanity বলিতে সেই যে অতি প্রত্যক্ষ—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবীয় সত্তা, তাহাকেই তিনি সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন; এবং, কোন আধ্যাত্মিক যোগ-মার্গে নয়—প্রকৃতি-মার্গে, স্বভাবের নিগূঢ় নিয়মে—সেই Humanity-র পরিণতি কিরূপ হইতে পারে, প্রথম হইতেই তাঁহার অন্তরে সেই জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল। ইহার একটা কারণ—যুগধর্ম্মের গূঢ়তর ও পূর্ণতর প্রভাবই বটে; কিন্তু অপর কারণটি প্রতিভার দৈবীপ্রেরণার মতই রহস্যময়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি একাধারে কবি ও তত্ত্বদর্শী না হইতেন, তবে তাঁহার সাধনায়, হয় কাব্য, নয়, তত্ত্বই পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিত—মনুষ্যত্বের এমন সমগ্র-দৃষ্টি সম্ভব হইত না। য়ুরোপীয সাহিত্য-কলার মাদক প্রভাবে আমাদের Renaissance যে মুখ্যতঃ সাহিত্যিক Renaissance-এ পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি; যুগ-প্রবৃত্তির বশে, ভাব-চিন্তা ও তত্ত্বপিপাসার উগ্র প্রেরণায় যে সকল অগভীর ও অসম্পূর্ণ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কথাও বলিযাছি; কিন্তু এইবার, কেবল ভাবও নয়, কেবল চিন্তাও নয়—এক বহিরন্তরব্যাপী উদার কবিদৃষ্টিকে সহায় করিয়া তত্ত্বই তথ্যকে—কল্পনা বাস্তবকে—আলিঙ্গন করিল; যাহা অতি-উর্দ্ধ ভাবলোকে বিহার করিত, তাহাই প্রত্যক্ষ সৃষ্টিতে শরীরী হইযা দেখা দিল; জীবনের কোন অসম্পূর্ণ রূপ নয—একটা পূর্ণতর রূপ কাব্যে এক নূতন রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-দর্শন বা পূর্ণ-মনুষ্যত্বের সন্ধান তাঁহার সাহিত্যিক সাধনায় দুইটি পৃথক ধারায প্রকটিত হইয়াছে। দুই ধারার লক্ষ্য একই; এক ধারা—রসের বা আর্টের ধারা, আর এক ধারা—তত্ত্বচিন্তার বা বুদ্ধি-বিচারের ধারা। এই দুই বিভাগের একটির নাম উপন্যাস; তাহাতে মনুষ্যজীবনের নিয়তিকে কতকগুলি বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে, এবং স্থান-কালের নাটকীয সংস্থানে—ঘটনা-চক্রের গতিমুখে ফেলিয়া, একটা অনিবার্য্য পরিণামরূপে, প্রত্যক্ষ-গোচর করা হইয়াছে। সেখানেও প্রশ্ন আছে—কিন্তু সে প্রশ্নের সমাধানে কোন সরাসরি সিদ্ধান্ত নাই—সাক্ষাৎ অনুভূতি-রসে প্রশ্ন ও উত্তর এক হইয়া যায়, একটি মুহূর্ত্তব্যাপী রস-সংবেদনায় মনুষ্যত্বের আদি ও অন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেখানে তত্ত্বই যেন বস্তুরূপে—সৃষ্টির নিয়তিলীলার প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে, মানুষের রক্তমাংস-গঠিত দেহের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াবলীর পরিণামরূপে—জীবন-সত্য হইয়া উঠে। ইহার কারণ, ওই তত্ত্ব কোন অংশে বস্তুনিরপেক্ষ নয়—উহা আদৌ চিন্তাপ্রসূত নয়, কবির অপরোক্ষ-দৃষ্টির ফল। ভাব ও বস্তুর এই অভেদ-দৃষ্টিকেই আমি সৃষ্টি-শক্তির কারণ বলিয়াছি; এবং সকল সৃষ্টি যে এই অর্থেই সমন্বয়-মূলক, তাহাও বলিয়াছি; প্রত্যেক উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে ওই দুইয়ের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-রহস্য ফুটিয়া উঠে। ভাগবতী সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়া থাকে, কিন্তু সে দৃষ্টি সকলের নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে এই দৃষ্টিলাভ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ওই কাব্যগুলি; কিন্তু সেই দৃষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই—দেশ-কালের এমন একটা তাগিদ তাঁহাকে সর্ব্বদা বস্তুর সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন করিয়াছিল যে, এইরূপ রসদৃষ্টি সত্ত্বেও সজ্ঞান সমস্যা-চিন্তা এড়াইবার উপায় ছিল না; যাহাকে দেখিয়াছি তাহাকে শুধুই দেখানো নয়,—সেই দেখাকেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচারের দ্বারা বুদ্ধিগোচর করা চাই; ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাক্ষ্য চাই; নিজের সেই আত্মগত প্রত্যয়কে জ্ঞান-বুদ্ধির আদালতে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা চাই। কবির পক্ষে—সিদ্ধ সাধকের পক্ষে—ইহার কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তরেও সেই এক কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা ব্যক্তির নয়—সমাজের; যুগ ও জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সেই প্রতিভাকে—জগন্নাথের রথরজ্জু হইয়া—সেই রথকে সচল করিতে হইবে, ইহাই ছিল বিধাতার নির্দ্দেশ। তাই বঙ্কিম লোকহিতার্থে তাঁহার সেই বোধি-দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া, স্বেচ্ছায় তাহাকে নিম্নাধিকারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; যাহাকে নিজের অন্তরে দেখিযাছি ও পাইয়াছি, তাহাকে নিরপেক্ষভাবে প্রচার করিতে বাধিয়াছিল—কবিকেও রীতিমত শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি তাঁহার অপরবিধ সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন—সেখানে বঙ্কিমের সাধক-মূর্ত্তি অন্যরূপ। কাব্যকার ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, ও তত্ত্ব-প্রচারক বঙ্কিম, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেও, তাহারা সহসা যেন পৃথক মূর্ত্তি বলিযাই মনে হয়। আমাদের সাহিত্যে 'Age of Prose and Reason' এখনও দেখা দেয় নাই। যে জাগ্রত ও সংযত বিচার-বুদ্ধি, অতিশয় স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত তত্ত্ব-দৃষ্টি, এবং বিষয়বস্তুর প্রতিপাদনে যে অবান্তর বাহুল্যবর্জ্জন বা যুক্তি-ধারার একমুখিনতা খাঁটি গদ্যসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—সেই লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে, তাহার উৎকর্ষ তো দূরের কথা—সাহিত্যের সেই ধারাই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; বিদ্যার অভাব, চিন্তাশক্তির দৈন্য, বিচার-বুদ্ধির বা মনন-শক্তির হীনতা, এবং তজ্জনিত ভাষা ও রচনারীতির ক্রম-অবনতি,—এই সকল কারণে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে আদর্শ-গদ্যের বড়ই অভাব ঘটিয়াছে। এ প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনায় এই সকল লক্ষণের যেরূপ সদ্ভাব দেখা যায়—তাহাতে সে যুগের গদ্য-লেখক হিসাবেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মনে হয়, পরবর্ত্তী যুগেও তাঁহার সেই স্থান অক্ষুণ্ণ আছে। আমি অতঃপর তাঁহার রচিত অপর সাহিত্য (উপন্যাস প্রভৃতি) ত্যাগ করিয়া এই খাঁটি গদ্য-সাহিত্য হইতেই নব মানবধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞানের পরিচয় দিব; সে পরিচয় যথাসম্ভব তাঁহার নিজের জবানিতেই দিব, তাহার অধিক আবশ্যক হইবে না; কারণ, তাঁহার দিক দিয়া তিনি

সেই চিন্তার ধারাকে যেমন স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তেমনই তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ রাখেন নাই।

সাহিত্য-সমালোচনা, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনবিষয়ক নানা প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া আধুনিক বিদ্যাচর্চ্চায় প্রবৃত্ত করা; শুধুই 'বঙ্গদর্শনে' নয়, 'প্রচারে' ও 'নব-জীবনে'ও তাঁহার সেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রমের কর্ম্ম ছিল—নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবনা-কামনাকে দিক্‌ভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট হইতে না দেওয়া; সেই শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, জাতির স্বধর্ম্মকেও মানবধর্ম্মের আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক শিক্ষার সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মুখে, শাস্ত্র-বিধি বা পুরাতন সংস্কারের মোহ টিকিবে না; আবার, যুক্তিমূলক যে ধর্ম্ম বা নীতি, তাহার দ্বারাও মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে বশ করা যাইবে না—শিক্ষিত মানুষও দেহ ও মনের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ঐরূপ শিক্ষায় আত্মস্থ হইতে পারিবে না, সর্ব্ববিষয়ে শ্রদ্ধাহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইবে। য়ুরোপের আদর্শ ভারতের আদর্শ হইতে পারে না—তাহার কারণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক; স্বধর্ম্মে ও পরধর্ম্মে যে বিরোধ তাহা প্রাকৃতিক কারণেই অখণ্ডনীয়। আবার, যে ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে এদেশে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে; য়ুরোপের পক্ষে যে শিক্ষা সে সমাজের উপযোগী, এবং—শেষ পর্য্যন্ত যেমনই হউক—উপস্থিত তেমন ভয়াবহ নয়, আমাদের পক্ষে তাহাই আশু ধ্বংসকরী হইবে। অতএব সেই বিদ্যার সুফল যে-কারণে যতই লোভনীয় হউক—এবং তাহার প্রবাহ রোধ করা সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় না হউক—তাহাতে ভাসিয়া যাওয়ার বিপদ অল্প নহে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেও যেমন অকুণ্ঠিত, তেমনই স্বজাতির স্বভাবে তাহার বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে তেমনই নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই নব্যশিক্ষিতের দলই অতঃপর এ সমাজের নেতৃত্ব করিবে—রঘুনন্দনের স্মৃতির শাসন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে; অতএব জাতিকে বাঁচাইতে হইলে নূতন সংহিতার প্রয়োজন, এবং তজ্জন্য এই শিক্ষার সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে চাই—চিত্তশুদ্ধি। এই অভিপ্রায়ে, তিনি একেবারে গোড়ায় দৃষ্টি করিলেন, এবং মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া সেই ধর্ম্মের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন করিলেন। এই গ্রন্থই একহিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী ধ্যান ও চিন্তার পরিণত ফল—তাঁহার অন্তর্জ্জীবনের ইতিহাস বা আত্মপরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। আমি এই গ্রন্থ হইতেই তাঁহার সেই আদর্শ ও সাধন-মন্ত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে তাঁহারই কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিব।

(১) অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ-জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন-জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।

(২) আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের যে স্থূলমর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি।

(৩) ধর্ম্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে।

(৪) আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না। ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি।

(৫) এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। তাহার (সেই বিজ্ঞানবিদ্যার) কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায়, যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি।...আর আমার বিবেচনায় পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না।...এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে; ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ-দুঃখের উপরেও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে।

(৬) তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য।

(৭) যেদিন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।

উপরের কথাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যুগ-প্রভাব ও যুগ-সমস্যার উৎকণ্ঠা—দুইয়েরই সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; এই দুই কারণে, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদের দৃঢ় সংস্কার লক্ষ্য করা যায়, অতঃপর তাহারও কিছু পরিচয় তাঁহার কথাতেই দিব।—

(৮) মানব-প্রকৃতিতেই তাহার (হিন্দুধর্ম্মের) ভিত্তি। [হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার-সত্য তাহার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এই কারণেই; কোঁৎ-এর Humanity-ধর্ম্মও যে প্রায় এই তত্ত্বেরই পরিপোষক তাহা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—] এখন হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোঁৎ-মতের কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষে হিন্দুধর্ম্মের সেইটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? [ইহাও একপ্রকার ধমক দিয়া, Comte-এর নিকটে তাঁহার আদি-ঋণ অস্বীকার করিবার চেষ্টা]।

(৯) নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। (খাঁটি তন্ত্র-মত)।

(১০) চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন-ধর্ম্মের (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধন) নহে, সন্ন্যাসধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। [এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।]

(১১) ভূতকে (প্রকৃতি বা বহির্জ্জগৎ) জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?—বহির্বিজ্ঞানে; অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন্। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদিগকে গুরু করিবে।

তারপর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে ?—বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে ; অর্থাৎ কোম্তের শেষ দুই—Biology, Sociology—এ জ্ঞান পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি যে প্রকৃতি—সেই ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ যে জীবন ও জগৎ, তাহা বঙ্কিমকৃত 'সচ্চিদানন্দ'-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় ; যথা (বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্যগুলি আমার)—

গুরু। জগতে আছে কে ?

শিষ্য। সৎ বা সত্য (World of Reality)।

গুরু। ইহার ভিতর ঐক্য দেখিতে পাও না ?—কিসে দেখ ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যাহাকে Herbert Spencer বলেন—inscrutable power in nature (তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়)।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাক। সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি ?

শিষ্য। জীবনের উপযোগিতা, বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম।...অর্থাৎ সৎ-কে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা (বস্তুবিজ্ঞান) ; চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা (দার্শনিক চিন্তাবৃত্তি) ; তারপর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা ?—সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি (Aesthetic faculty)।

অতঃপর আমি বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ও মনুষ্যধর্ম্মের পরিচয়, তাঁহার কথাতেই সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিব (বন্ধনীর মন্তব্যগুলি আমার)—

(১) মনুষ্যের ধর্ম্ম কি তাহা সন্ধান করিলেই পাওয়া যায় (অর্থাৎ কোন যোগমার্গ বা Revealed Scripture-এর শরণাপন্ন হইতে হয় না)। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম. তাহার নাম মনুষ্যত্ব (ইহাই খাঁটি Humanism)।

(২) যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

(৩) আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।

ইহার পর, সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অনুশীলন যে সহজসাধ্য বা সর্ব্বজনসাধ্য নয়, "ধর্ম্ম যে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত" —এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

ধর্ম্ম যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তা না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম।...যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগী বলাও উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা, সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, একসময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।

ইহার অর্থ,—ধর্ম্ম সর্ব্বমানবনির্ব্বিশেষে সকলেরই সাধ্য—কারণ তাহা সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের (Common Humanity) মধ্যে বীজরূপে নিহিত আছে—আদর্শের অভিমুখে তাহাকে পূর্ণ বিকশিত করাও চাই। এই আদর্শ কি ? এই আদর্শের স্থাপনাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস।

এই আদর্শও মানুষ,—মনুষ্যত্বের বা মনুষ্য-প্রকৃতির পূর্ণতম বিকাশ। মানুষের দেহ-মন-প্রাণের সকল বৃত্তির পূর্ণ ও সমান পরিণতি—মনুষ্যজীবনে যতখানি সম্ভব—তাহাই সেই আদর্শ। দেহ ও মনের ক্ষেত্রে এই পরিণতির সীমা আছে সত্য, এবং বঙ্কিমচন্দ্র আপাততঃ ততখানিতেই সন্তুষ্ট থাকিলেও—অনুশীলনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মনে করিলেও—তাহার পরেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব এই বলিয়া মনে হয় যে, ওই সীমায় পৌঁছিলে তারপর যাহা তাহা আপনিই ধরা দিবে; তাহার জন্য উপস্থিত, এই জীবনের ক্ষেত্রে, কোন চিন্তা বা বিচারের প্রয়োজন নাই। তথাপি, সেই সীমাকেও তিনি যথেষ্ট সম্মুখে রাখিয়াছেন—ইহার নাম দিয়াছেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে তিনি মনুষ্য-প্রকৃতির বাহিরে স্থাপন করেন নাই—মানুষের মানুষী জ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন নাই; হিন্দুর দার্শনিক ঈশতত্ত্বের সমর্থন লাভ করিয়া, সে বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছেন। এই ঈশতত্ত্ব—মানুষের সেই মনুষ্যত্বসাধনার শেষ সোপান ইহা আপনিই আসিয়া যাইবে, যদি না আসে তবে ওই ঈশ্বরেরও যেন কোন সত্তা নাই। এই জন্যই, এই ঈশ্বরও Personal,—নির্গুণ; Impersonal ঈশ্বরের ধ্যান মনুষ্যধর্ম্মের বিরোধী; কারণ, "ঈশ্বরই (মানুষের) সর্ব্ব গুণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।" মানুষের জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখনই এই আদর্শের ছায়া তাহার চিত্তে পড়িবে; তখন—

> তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র মঙ্গলময়-শক্তি কামনা করিতে হইবে।…তাহা হইলেই ক্রমশঃ আমরা ঈশ্বরের নিকট হইব—সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব।…ইহাকেই 'মোক্ষ' বলে। মোক্ষ আর কিছুই নহে—ঐশ্বরিক আদর্শ-নীতি স্বভাব-প্রাপ্তি।

কেবল হিন্দুকেই এই ঈশ্বরের সন্ধানে জগতের বাহিরে যাইতে হয় না, এইজন্য হিন্দুব ঈশ্বর-তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ—

> খৃষ্টীয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র।…হিন্দুর ঈশ্বর সেইরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময়। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনই তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে। সকলেই তিনি বিদ্যমান।

উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্যধর্ম্মের সঙ্গে 'ঈশ্বর'-নামক যে আদর্শের গ্রন্থি-বন্ধন লক্ষ্য করা যায়—তাহাতে চমকিত হইবার কারণ নাই; কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বঙ্কিমের ওই ঈশ্বরও সম্পূর্ণ humanistic। তাঁহার ওই Personal God-ও যেমন অতিস্থূল anthropomorphism-এর দোষযুক্ত নয়, তেমনই তাহা কোন অপ্রাকৃত বা অতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্তাও নয়। বরং সেই অলৌকিক ধ্যানকল্পিত বস্তুকেই লৌকিক মনুষ্যত্বের ভূমিতে অবতরণ করাইয়া, এবং মানুষকেই একটা উচ্চতর ভূমিতে উত্তোলন করিয়া, এই সাযুজ্যসাধন হইয়াছে। ইহাও মানুষেরই পূজা—হিন্দুর অবতারবাদকেই একটা নূতন

অর্থে শোধন করিয়া লওয়া। শেষ পর্য্যন্ত ইহা মানুষেরই আদর্শ—মনুষ্যধর্ম্মেরই অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

শিষ্য। এরূপ আদর্শ (মানুষ) কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন।...তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন।

তারপর—

অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা...অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।

এবং—

খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা।...কিন্তু এই সকল আদর্শের উপরে হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে...যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। ...তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য এবং অপরিমেয় বলে পরিণত, তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত; এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত।...তিনি (সেই কৃষ্ণ) ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

অতএব দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরও একটা মানবীয় আদর্শ—মানুষেরই apotheosis। হিন্দুর ঈশ্বর অবতারী—তিনি মনুষ্যরূপে অবতরণ করেন; বঙ্কিমচন্দ্র তেমন ঈশ্বর ও তাঁহার অবতারিত্বে বিশ্বাসী হইলেও—এখানে তিনি মানুষকেই সেই পদবীতে আরোহণ করাইবার জন্য মানুষের আদর্শরূপেই তাঁহার ভাবনা করেন। এজন্য, তাঁহার এইরূপ ধর্ম্মমতের জন্য, সেকালে তিনি বহু Theist ও ভক্ত হিন্দুর চক্ষে নাস্তিক ছিলেন।

এইবার অতিশয় সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সারসংগ্রহ করিব।

মানুষের ধর্ম্ম কি? মনুষ্যত্ব কি? এই জীবন লইয়া কি করিব? এই প্রশ্নের উত্তর হইল—মানুষের ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবেই নিহিত আছে, এবং মানুষের সেই প্রকৃতিকে উত্তমরূপে বুঝিয়া লইলে মনুষ্যত্বের ধারণা করা যাইবে। মানুষের সেই স্বভাবের পূর্ণ পরিণতির যে অবস্থা তাহার আদর্শকেই ঈশ্বর নাম দিতে হইবে। 'মুক্তি'ও এই অবস্থা—আর কোন অর্থে 'মুক্তি' বলিয়া কিছু নাই। সেই মুক্তি লাভ করিতে হইলে কর্ম্মই একমাত্র সাধন; এবং জীবনও স্বভাবতঃ কর্ম্মময়, প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষকে সর্ব্বদা কর্ম্মচঞ্চল থাকিতে হয়, যথা গীতার উক্তি (বঙ্কিম কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

এই কর্ম্মকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে, অর্থাৎ তাহাতে পূর্ণ 'দক্ষতা' লাভ করিতে হইলে, প্রকৃতিদত্ত সর্ব্ববৃত্তির সমান ও সুসঙ্গতিযুক্ত অনুশীলন প্রয়োজন; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে

চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধির প্রাথমিক লক্ষণ—মনে শান্তি, ও হৃদয়ে প্রীতি। প্রীতি অর্থে—মানবপ্রীতি, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আনন্দময় উৎসাহের ভাব। এই প্রীতিও সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করে না—ঈশ্বরে ভক্তির অভাবে; কারণ সেইরূপ ভক্তিযুক্ত না হইলে মানুষের প্রতি প্রীতির কোন অর্থই হয় না—তাহা একটা অন্ধ হৃদয়াবেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেরূপ প্রীতির দ্বারা মানুষের সত্যকার কল্যাণ হইতে পারে না—হিতসাধন সম্পূর্ণ হয় না; কেবল একটা আত্মতৃপ্তিই ঘটে, এজন্য তাহার গূঢ় লক্ষ্য—পরার্থ নয়, স্বার্থ। অতএব নিষ্কাম প্রীতি ব্যতিরেকে সত্যকার পরহিতসাধন অসম্ভব। এই নিষ্কাম প্রীতির জন্যই ঈশ্বরে ভক্তি একান্ত আবশ্যক। এই ভক্তিও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরই নামান্তর; কারণ তাহা ঈশ্বরজ্ঞানেরই ফল—সে জ্ঞানও মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি-অবস্থার উপলব্ধি; ঈশ্বর তাহাই। অতএব ঘুরিয়া আবার সেই একই তত্ত্বে ফিরিয়া আসিতে হয়—এক নূতন অর্থে, জীব ও ব্রহ্ম এক; Humanityই ব্রহ্ম। যে জ্ঞানে সেই একত্বের উপলব্ধি হয়, তাহা লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ওই প্রীতি-মূলক মানবসেবা-কর্ম্ম; এই মানবপ্রীতিই উৎকৃষ্ট কর্ম্মসকলের প্রেরণাও বটে। এইরূপ কর্ম্মই জীবনের সার, ইহার যে সুখ, তাহাই মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স। অতএব এই কর্ম্মযোগই যেমন উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তেমনই, ইহার শ্রেষ্ঠ জীবন-যোগ।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। তাহাতে এই কয়টি তত্ত্ব পাওয়া গেল: (১) প্রকৃতিবাদ। (২) আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বরতত্ত্ব মনুষ্যের জীবনের যতটুকু অনুগত ততটুকু যথেষ্ট। (৩) সমাজসেবার মধ্য দিয়া 'মানব-দেবতা'র (Humanity) সেবাই পরমধর্ম্ম। (৪) তাহাতে সর্ব্বভূতের কল্যাণ ও ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণে কোন বিরোধ থাকে না। মুক্তির জন্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন যেমন নাই—তেমনই, মুক্তি-সাধনা অর্থে কোনরূপ স্বার্থপর আত্মসাধনা নয়; মানুষ হইয়া, মানুষের সমাজে থাকিয়া, নিজ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ-সাধনের দ্বারাই সত্যকার মুক্তিলাভ হয়। (৫) এই মনুষ্যত্ব-সাধনাতেই শ্রেষ্ঠ সুখ; তাহাতে দেহ-মন-প্রাণের যে পুষ্টি হয়, তাহাই পুরুষের উৎকৃষ্ট ভোগ—কারণ তাহাই স্থায়ী সুখ; অন্য সুখ, স্থায়ী সুখ নয় বলিয়া, তাহা সুখ নয়—দুঃখ; ইহা মানুষমাত্রেই জানে। অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ সুখবাদ বা ভোগবাদ; ধর্ম্মের কষ্টিপাথর—এই সুখই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, ইহাই অনতিদূর ভবিষ্যতে একমাত্র জীবন-বাদ হইয়া উঠিবে। ইহার সকল উপকরণ মানুষের দেহে ও ইহ-জীবনেই সুলভ হইয়া আছে—এ সাধনায় জগতের দিকে চক্ষু বুঁজিয়া পরকালের ধ্যান করিতে হয় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মতত্ত্ব এক নব-জীবনবাদের—আধুনিক প্রকৃতিবাদের—সমর্থক; অথচ মানুষের জীবনকে

সার্থক করিবার একটা অতিশয় যুক্তিপূর্ণ সাধন-তত্ত্বও বটে। এখানে ধর্ম্ম অর্থে—যাহা ধারণ করে, রক্ষা করে; মানুষের স্বপ্রকৃতিকে বিকৃত না করিয়া—তাহারই নিয়মে—তাহার স্বাস্থ্যবৃদ্ধি করে। এই ধর্ম্মতত্ত্বও একরূপ Ethics, বা ধর্ম্মার্থকামের সুবিধি-শাস্ত্র। ইহাতে পরমার্থজিজ্ঞাসা নাই—পুরুষার্থজিজ্ঞাসা আছে, সে পুরুষার্থও ভোগ-সর্ব্বস্ব নয়। এই ধর্ম্ম যে পূরা আধ্যাত্মিক নয়, তাহার প্রমাণ, ইহাতে সৃষ্টির আদিকারণ-জিজ্ঞাসা নাই; যথাপ্রাপ্ত জীবন ও জগৎকে লইয়াই ইহার কারবার। আধিভৌতিক বা বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণ-তত্ত্বকেই এ ধর্ম্মের প্রামাণ্য করা হইয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বার বার বলিয়াছেন—তিনি নৈসর্গিক ভিত্তির উপরেই ধর্ম্মের স্থাপনা করিযাছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি ব্যক্তির অধ্যাত্ম-সাধনকে সমাজের হিত-সাধনের উপরে স্থান দিতে বিমুখ। তাই যে ধর্ম্ম-মীমাংসা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব প্রয়োজন, যাহাতে আধ্যাত্মিক সংশয়ের অন্ত নাই—তাই জিজ্ঞাসাও সহজে তৃপ্ত হয় না—ব্যক্তির সেই স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার স্থান ইহাতে নাই। ইহার দার্শনিক ভিত্তিও খুব দৃঢ় নয়। এ ধর্ম্ম 'মানুষে'র ধর্ম্মই বটে, এবং তাহাও একটা যুগের বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদকে—অন্তর্ভুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে; কারণ যুগকে না মানিলে সনাতনেরও রক্ষা নাই। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে—সে ঈশ্বরও প্রচলিত শাস্ত্রের বা ভক্তি-ধর্ম্মের ঈশ্বর নয়; সে ঈশ্বর পরকালে লভ্য হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে ইহকালেই লভ্য হইতে হইবে। আসলে, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণকে যদি একটা সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শরূপে ভাবনা করা যায়, তবে তাহাই এ ধর্ম্মের উপাস্য—তাহাই ঈশ্বর। এই 'আদর্শ-নীত' ঈশ্বরত্ব-লাভের জন্য, অর্থাৎ মানবপ্রীতি ও সমাজসেবার দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণপরিণতি লাভের জন্য, যে নব 'অভ্যাস-যোগ' ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম—'অনুশীলন'। এ ধর্ম্মের যথার্থ নাম Religion of Humanity; এবং এইজন্যই বৃত্তিসকলের অনুশীলনই এ ধর্ম্মের সার। "The substance of Religion is Culture"—পাশ্চাত্য মনীষীর এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রও শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

তথাপি এই 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ও সৃষ্টিশক্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই 'ধর্ম্মে'র প্রণয়নকার্য্যে তিনি তাঁহার নিজের আবশ্যকমত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক চিন্তাকে কাজে লাগাইয়াছেন—কোনখানে বিজ্ঞান বা দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বকে আমল দেন নাই। এজন্য তাঁহার এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সমালোচনায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য নিতান্তই অবান্তর। ইহাতে তত্ত্ব-হিসাবেই কোন তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই—ইহা জীবনেরই অনুরূপ একটা জীবন-বাদ, ইহাও একটা সৃষ্টি। মানুষের জীবনকে দেখিবার একটা বাস্তব-রূপ-সন্ধানী দৃষ্টি ইহাতে আছে; সে দৃষ্টিতে ভাব আছে, চিন্তা

আছে, কল্পনাও আছে; কবি বা ভাব-সাধকের অন্তর্দৃষ্টিও আছে—একটা harmony বা সঙ্গতি আবিষ্কারের পিপাসা আছে। সেই দৃষ্টি-জাত যে দর্শন, তাহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র একরূপ যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। খাঁটি জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যতটুকু বিজ্ঞান ও দর্শন মিলিতে পারে—কেবল ততটুকুই ইহাতে মিলিয়াছে; তাহার ফলে এই ধর্ম্মতত্ত্ব একটা নূতন দার্শনিক তত্ত্ব হইয়া উঠে নাই জীবনেরই এক নূতনতর ব্যাখ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিক নহেন—স্রষ্টা ও কবি।

সেই কবি-প্রতিভার সমন্বয়-শক্তিও ইহাতে অল্প প্রকাশ পায় নাই। যে তত্ত্বগুলিকে তিনি কোঁৎ-মিল-স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানপন্থী ধর্ম্মপ্রণেতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত সেই প্রকৃতিবাদকেও তিনি ভারতীয় চিন্তার দ্বারা শোধন ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। অ-ভারতীয় ধর্ম্মসকলের Theology-ও তিনি যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তেমনিই তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই—সেই প্রকৃতিবাদকে একরূপ হজম করিয়াই, তিনি তাহার সেই মানব-হিতবাদ ও মানব-প্রীতিবাদকে—তাহার সেই স্বকর্ম্মবাদকে (Ethics)—যেভাবে 'ঈশ্বরে-ভক্তি'র দ্বারা 'অনবস্থা'-দোষ-মুক্ত করিয়াছেন, তাহাতেও তাহার সমন্বয়-শক্তির পরিচয় আছে। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে এই যোগ-সাধন, ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি; ইহাই নবযুগের গূঢ়তম প্রবৃত্তি—এই সমন্বয়-প্রতিভাই সে যুগের যুগ-প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'রই অন্তর্গত কতকগুলি ভাব ও চিন্তার সাহায্যে আমি বাংলার নবযুগের নায়কহিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবুকতা ও মনস্বিতার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্কিম-সাহিত্যের মূলপ্রেরণা—বাঙালী ও ভারতীয় সংস্কার ; 'ধর্ম্ম-তত্ত্বে' সনাতন ও যুগ ধর্ম্মের সমন্বয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবধর্ম্মের প্রেরণামূলে তাঁহার জাতিগত বাঙালী-সংস্কার, কতটুকু রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না। আমি পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই, এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রসঙ্গে এক স্থানে তাহার প্রমাণ আছে ; তিনি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই অনুশীলন-ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, বরং একটু বিরোধ আছে ; অতএব সে ভক্তিবাদের আলোচনায় আমি প্রবৃত্ত হইব না।" আসল কথা, সে ধর্ম্ম বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই ; কারণ, তাহাতে জ্ঞান, ও বিশেষ করিয়া কর্ম্মের, প্রাধান্য নাই ; তা ছাড়া, সে এক প্রকার মিষ্টিক রস-সাধনার ধর্ম্ম ; তাহা আধুনিক যুগধর্ম্মের অনুকূল নয়। কিন্তু তাঁহার এই অনুশীলন-ধর্ম্মের মূলে তন্ত্রধর্ম্মের প্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিবাদমাত্রেই তন্ত্রতত্ত্বের অধীন—সেই তান্ত্রিক সংস্কার যে-জাতির মজ্জাগত, তাহার পক্ষে জীবন ও জগৎকে—প্রত্যক্ষকে—ধর্ম্মসাধনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সহজ ওস্বাভাবিক ; এইজন্যই য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্ম-পিপাসার এই যে সংযোগ, ইহা বাঙালীর প্রতিভাতেই সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুট হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মতত্ত্বেও দেহই আদিম ও প্রধান সাধন ; জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য ; এখানেও দেহের ও মনের বৃত্তিগুলির পূর্ণ-উন্মেষের দ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হয়। ইহাতে শিব-শক্তি বা পরা শিবের তত্ত্ব, কুণ্ডলিনী-শক্তি, ও সেই শক্তির জাগরণ ও লয়-যোগ প্রভৃতির তত্ত্ব নাই বটে—কারণ, ইহার ভাব ও ভাষা উভয়ই কিছু ভিন্ন—তথাপি, মূলে একটা সাদৃশ্য আছে। এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, এখানে সেই তন্ত্রধর্ম্মের আধ্যাত্মিক গুহ্য সাধনাকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া তাহাকে সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের উপযোগী করা হইয়াছে। তন্ত্রের সেই মায়ারূপিণী মহামায়া—এখানে অপরিণত মনুষ্যত্বের স্বার্থকলুষিত জগৎ-চেতনা ; এবং সর্ব্বমানবময়ী মহাদেবীই (Humanity) সেই ব্রহ্মময়ী সত্যস্বরূপিণী মহামায়া। এখানেও অনুশীলন, শক্তির পূর্ণবিকাশই ইহার লক্ষ্য ; কেবল, সেই শক্তি মানুষেরই হৃদয়-মনের শক্তি, এবং ভক্তিও কোন আধ্যাত্মিক ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি নয়, মানবীয় আদর্শের যে ঈশ্বর—ভক্তিও তাঁহার প্রতি। এখানেও, ভুক্তি এবং মুক্তি দুইয়েরই অবকাশ আছে ; মুক্তি—

প্রকৃতির সর্ব্ববিধ বন্ধন স্বীকার করিয়া এবং তাহারই সাহায্যে; ভুক্তি—"ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম"—স্নেহ-প্রেম প্রীতি ও দয়া—সর্ব্ববিধ হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্মের ঘোরতর বিরোধী। এই যে ভোগবাদ—হৃদয়বৃত্তিকে উচ্ছেদ করার এই ঐকান্তিক অপ্রবৃত্তি, ইহাই বাঙালীর মজ্জাগত সংস্কার, ইহাই বাঙালীর তান্ত্রিকতা। এই তান্ত্রিকতাই নবযুগের নূতন প্রবৃত্তিতে একটা নূতনতর সাধনপদ্ধতির সন্ধান করিয়াছে। সেকালে ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তন্ত্রের প্রতি একটা কুসংস্কারজনিত অবজ্ঞার ভাব ছিল, একালেও আছে; বঙ্কিমচন্দ্রও শ্রদ্ধার সহিত তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনা করেন নাই; তথাপি ভিতরে ভিতরে তাঁহার সেই জাতিগত সংস্কার অটুট ছিল। গীতার মধ্যেও তিনি যে তাঁহার এই প্রকৃতিবাদমূলক অনুশীলন-ধর্ম্মের পূর্ণ-সমর্থন আবিষ্কার করিযাছিলেন, এবং সেইজন্য তাহার প্রতি এত শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন, ইহাও কম কৌতুককর নহে। গীতায় ভক্তিবাদ তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল—শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম তেমন উপাদেয় মনে হয় নাই; তাহার কারণ, গীতায় কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের, জ্ঞানের সহিত ভক্তির, এবং সকলের সহিত পুরুষকার বা আত্মিক শক্তিসাধনার খুব বড ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গীতার প্রকৃতি যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতি নয়, এবং তাহার সেই নিষ্কাম কর্ম্মবাদের মূল প্রেরণা—যে-ঈশ্বরে ভক্তি সে-ঈশ্বরও বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বর' নয়, তাহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই। গীতার সেই 'আত্যন্তিক সুখ'ও প্রেম-প্রীতি-স্নেহের সুখ নয়, তাহা 'আদ্যন্তবন্ত' বলিয়া 'ন তেষু রমতে বুধঃ'। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিকে দৃষ্টি করেন নাই। সন্ন্যাসকে তিনি বড ভয় করিতেন। বঙ্কিম আধুনিক মানবধর্ম্মের যে জীবনবাদকে একটু পরিশুদ্ধ আকারে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন—গীতায় ঠিক সেই জিনিস নাই; সেখানে Humanism নয়—Divinism-ই মূল তত্ত্ব, তাহা মূলে তান্ত্রিক নয়, বৈদান্তিক। তথাপি সেই গীতার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বাঙালীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শুধুই ধর্ম্মতত্ত্বে নয়, তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহিত্য-কর্ম্মে, এই তান্ত্রিক মনোধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়; বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা—তাঁহার অত্যুচ্চ কবিভাবও ভাবের সহিত বস্তুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কোথাও অস্বীকার করিতে পারে নাই—পুরুষকে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তারূপে ধারণ করিতে পারে নাই; তাঁহার উপন্যাসগুলিও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সেখানেও বাহিরের বাস্তব তথ্য বা ঘটনাকে স্বীকার করিয়া, তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ গতিবেগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া—কুলালচক্রে মৃৎপিণ্ডের মত—পুরুষ-চরিত্রের যে গঠন-পরিণাম, তাহাই সত্য। তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলে সর্ব্বত্র শক্তির এই স্ফুরণ-লীলা অপরিণত হইতে পরিণতির এই গতিতত্ত্ব অনুস্যূত হইয়া আছে। অর্থাৎ নিছক ধ্যান-যোগী বা ভাবপন্থীর মত তিনি একেবারেই একটা শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব ভাব-তত্ত্বে আরূঢ় হইয়া

থাকার অবস্থাকে সম্ভব বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; জীবনকে একটা আদর্শের অভিমুখে গতিশীল দেখিয়াছেন—একেবারেই আদর্শে উপনীত, অতএব স্থিররূপে দেখেন নাই। সেরূপ সাধনা শক্তিসাধনার বিপরীত ; সে যেন জীবনকে প্রথম হইতেই অস্বীকার করা। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে নরনারী-চরিত্র—বিশেষত নায়ক-চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতেও এই দ্বন্দ্ব, প্রয়াস ও সংগ্রামই জীবনের মূলতত্ত্বরূপে দেখা দিয়াছে ; তাই তাহাদের পরিকল্পনাও নাটকীয়। কাব্যে জীবনকে এইরূপে দেখিবার ভঙ্গী আমাদের সাহিত্যে নূতন বটে, এবং তাহা যে য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত হইয়াছে, তাহাও সত্য ; কিন্তু এইরূপ সংক্রমণ কেবল অনুকরণের ফলেই ঘটে নাই ; যাহাকে নাড়ীর যোগ বলে সেই যোগ না থাকিলে ঐরূপ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হইত না। অনুকরণে কিরূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, আজিকার দিনের বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের দুর্গতিই তাহার প্রমাণ। জীবনকে—সৃষ্টির সত্যকে—স্বীকার করা, এবং মুক্তিকেও ভুক্তির পথেই লাভ করিতে হইবে—এই বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল ; সেই বিশ্বাস বাঙালীর জাতীয় সংস্কারে সহজ বলিয়াই এত শীঘ্র নবযুগকে বরণ করিবার সামর্থ্য বাঙালীরই হইয়াছিল—আর কোন ভারতীয় জাতির হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এখানে বেশি কিছু বলিব না—যথাস্থানে ও যথাপ্রসঙ্গে সবিস্তারে সে আলোচনা করিব—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেরূপ কাব্যসমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি বর্ত্তমান আলোচনার এই বিশেষ প্রসঙ্গে দুই-একটি আরও প্রমাণ তাহা হইতেই দিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান ভাবগ্রন্থি—স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ বা দাম্পত্য-প্রেম। একমাত্র ইহারই প্রবল আকর্ষণে পুরুষের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; নারীই তাহার অদৃষ্টচক্রের প্রধান কীলক, তাহাতেই ঘূর্ণ্যমান হইয়া তাহার দশান্তরের অবধি নাই। কাব্যের বহিরঙ্গে নাটকীয় স্থান-কাল-পাত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য যেমনই হউক সেই সকলের তলদেশে তান্ত্রিক শিব-শক্তিবাদের একটা অতি গূঢ় প্ররোচনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় ; প্রকৃতি-রূপিণী নারীকেই পুরুষের জীবনে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুরূপে—দক্ষিণা বা বামা মূর্ত্তিতে—এই যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, ইহাও কম লক্ষণীয় নয়। সর্ব্বত্র ওই এক কঠিন শিলাতটে পুরুষের পৌরুষ যেন আছাড়িয়া পড়িয়া তাহার শক্তির চরম পরীক্ষা দিতেছে ; সেই পরীক্ষাই যেন জীবনের আদি ও শেষ পরীক্ষা, সকল শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধিলাভ যেন ওইখানেই বাঁধা রহিয়াছে। প্রকৃতির ওই বন্ধনও যেমন সত্য, পুরুষের পক্ষে উহার অধীন হওয়াও তেমন পুরুষোচিত বটে ; কারণ,—"রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া"। যতক্ষণ সে দুর্ব্বল ততক্ষণ সে জীব, বা ক্ষুদ্র মানবক —ততক্ষণ ওই নারীও মায়াময়ী 'মায়া' ; সেই মায়ার মহামায়া রূপ দেখিতে পারিলেই ঐ

দ্বন্দ্ব হইতে সে মুক্তিলাভ করে, এবং তখন সেই মহামায়ার অঙ্কশায়ী হইয়া 'শান্তং শিবং' অবস্থার পরমানন্দ-ভোগে অধিকারী হয়। 'কপালকুণ্ডলা'য় সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব উঁকি দিয়াছে; সেখানে নায়িকার প্রকৃতি-মূর্ত্তি অতিশয় সরল—স্বভাব-উদাসীন; তাহার নারী-রূপও অসম্পূর্ণ, তাই নায়ক কোন সাধনারই সুযোগ পাইল না। এই মূর্ত্তিরই আরও দুইটি জটিলতর রূপ—শ্রী ও মনোরমা; দুইই শক্তির নারীমূর্ত্তি বটে, কিন্তু সে যেন 'মায়া' নয়—দুর্ব্বল আত্মভ্রষ্ট পুরুষের নিদারুণ শাস্তিরূপিণী 'মহামায়া'। নগেন্দ্রনাথের শক্তি অনুকূলা হইলেও দুর্ব্বলা তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে কোনরূপে রক্ষা পাইল, প্রকৃতির দয়ায় প্রাণ পাইল মাত্র, কিন্তু পৌরুষ রহিল না। গোবিন্দলালের শক্তি প্রতিকূলা, কিন্তু সে বীরাচারী সাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। ব্রজেশ্বর বড় ভাগ্যবান—প্রাক্তন পুণ্যফলে তাহার শক্তি যেমন সবলা তেমনই স্নেহময়ী—সে নিজেই তাহার জন্য সব সহিয়াছে। প্রতাপ জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ—স্বভাব-ত্যাগী, তাই, মায়া তাহার পথরোধ করিতে পারে নাই। অমরনাথ তাহার শক্তির মূর্ত্তিকে ঠিকই চিনিয়াছিল, কিন্তু সাধনার প্রথম প্রহরেই মন্ত্র ভুল করিল—ইহজন্মে আর সিদ্ধিলাভ হইল না; তখন একমাত্র আশ্বাস—'যদি পরজন্ম থাকে'! কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা 'যোগবাশিষ্ঠ' রচনা করিতেছি,—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছি; বরং ঠিক তাহার উল্টা—যাহা আধ্যাত্মিক তাহাকেই জীবনলীলায় রক্তমাংসের মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাতে অধ্যাত্ম-রস নয়, কাব্যরসই উছলিয়া উঠিবে; সেই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিই আরও বিরাট, রহস্যগভীর হইয়া উঠিবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূলে যে কবি-কল্পনা আছে, তাহা খাঁটি য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডি-কল্পনা নয়;—কারণ, তাঁহার প্রকৃতিবাদও খাঁটি য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ নয়। এখানে প্রকৃতিও অন্ধ প্রকৃতি নয়—তাহাই সর্ব্বার্থসাধিকা; তাই পুরুষও কেবল প্রবৃত্তির বেগে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত একেবারে ভস্মসাৎ হয় না; সেই বেগের মধ্যেও একটা বিপরীতমুখী আকর্ষণ আছে—সেই ধ্বংসের মধ্যেও একটা আশ্রয়লাভের আশা ও আশ্বাস থাকে। ইহাই ভারতীয় সংস্কার, য়ুরোপ হইতে যাহা লইবার তাহা লইয়াও এই সংস্কার ত্যাগ করা যাইবে না—করিলে, তাহা সত্যকার সৃষ্টি হইবে না; কারণ পদ্মের ডাঁটায় গোলাপ ফুটিতে পারে না। তাই এ কাব্যের রস-বিচার য়ুরোপীয় আদর্শে করা যাইবে না; এ কাব্য কাব্যহিসাবেও স্বতন্ত্র—ইহা য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দুই দৃষ্টির সমন্বয়ে এক নূতন সৃষ্টি। কিন্তু এখানে এ সকল কথা অবান্তর।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নব জীবনবাদ বা নব মানবসংহিতার মূলে, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও যেমন, তেমনই ভারতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাব যে সমভাবে বিদ্যমান, তাহাই দেখাইবার জন্য অপর দিকটিরও কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম; যুগ-বন্যার সেই প্রবল

উচ্ছ্বাসে পদভ্রষ্ট না হইয়া, তিনি কোন্ শক্তির বলে সেই তরঙ্গের বেগ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সেই স্রোতকে স্বধর্ম্মের অনুকূল করিয়া তাহার একটা প্রবাহপথ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তাহাই সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ছাড়াও 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'গীতার ব্যাখ্যা'য় তিনি সেই এক ধর্ম্মের নূতন আদর্শ সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে, যতদূর সম্ভব মানুষের সহজ জ্ঞান বুদ্ধি ও সংস্কারকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার যে আর এক দিক আছে সেই দিক সযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি তত্ত্ববাদী (mystic) সাধক বা যোগী ছিলেন না—তিনি ছিলেন খাঁটি Humanist; Humanism-কেই যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যায় তিনি তাহাই করিয়াছেন, এই কথা মনে না রাখিলে তাঁহার সেই সাধনা ও বিশিষ্ট প্রতিভার মূল্যনির্ণয়ে ভুল হওয়াই সম্ভব। এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-রাজির মধ্যে প্রধান কয়েকটি যুগোপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রধানতঃ গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বজাতির কল্যাণ-কামনায় তাঁহার সাহিত্য-ব্রতের অনেকখানিই যে শিক্ষকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই তিনি তাঁহার কবিস্বভাবের রস-পিপাসাকেও সংযত করিয়া প্রাণের বন্ধন-মুক্তি অপেক্ষা চরিত্র বলকেই বড় করিযাছিলেন—ভাবের স্বাধীনতা অপেক্ষা বাস্তবের সহিত যুদ্ধে জযলাভকে অধিকতর স্বাস্থ্যকব অতএব হিতকর মনে করিয়াছিলেন; এবং এইজন্যই বিলাতী morality-কেও ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। তথাপি এই morality-কে তিনি সেকালেব শুচিবায়ুগ্রস্ত সংস্কারপন্থীদের মত সর্ব্বস্ব করিয়া তোলেন নাই, তাহাব প্রমাণ তাঁহার ওই কাব্যগুলি। সেখানে এক দিকে যেমন চরিত্র-বলের অত্যুচ্চ আদর্শ-ঘোষণা, তেমনই অপর দিকে যাহাদের অধঃপতন হইতেছে তাহারাও প্রায আদর্শ পুরুষ—ভবানন্দের মত ত্যাগী বীর-সন্ন্যাসীরও পদস্খলন হয়, গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথের তো কথাই নাই। তিনি দেহদশাধীন পুরুষের সেই নির্ম্মম নিয়তিকে কোথাও অবজ্ঞা বা অস্বীকার কবেন নাই; বরং তাঁহার সেই রক্তরশ্মির জ্বলন্ত প্রভায় পুরুষ চরিত্রগুলি আত্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। শৈবলিনীর নাম দিয়াছেন 'পাপীয়সী' তথাপি তাহার পাপের সেই নিদারুণ ব্যথাই সমগ্র কাহিনীকে কাব্যরসোচ্ছল করিয়াছে; সেই পাপই হীরার মত সামান্যা নারীকেও অসামান্যা করিয়া তুলিয়াছে। এই পাপকেই তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাহাই যে মানুষের মনুষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য মূল! দেহের যৌবন-বনে প্রকৃতির সেই অশোক-কিংশুক যে ফুটিবেই!—বসন্তের সে চক্রান্ত ভাঙিয়া দিবে কাহার সাধ্য? তাই সে পাপকে তিনি ভয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই; প্রকৃত তান্ত্রিকের মত তাহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া, তাহার হস্ত হইতেই মুক্তির বরাভয় প্রার্থনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও প্রকৃতিবাদী—শক্তিসাধক, শুচিবায়ুগ্রস্ত moralist নহেন। কিন্তু গুরু ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নাধিকারীর পক্ষে এ বিষয়ে কিছু কঠোর; তাঁহার দৃষ্টি ছিল মনুষ্যসাধারণের দিকে; এইজন্যই তাঁহার নব ধর্ম্মসংহিতায় তিনি যেমন কোথাও সন্ন্যাস বা Puritanism-কে প্রশ্রয় দেন নাই; তেমনই সাধনপথে দেহের বা প্রবৃত্তির শুচিতাকে সযত্নে রক্ষা করার পক্ষপাতী। 'Flesh is weak', অথচ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এ কথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, এজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে সাম্য-রক্ষাই ছিল তাঁহার মতে উৎকৃষ্ট মানবধর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে, এ কথা যতই পুরাতন হউক—সেকালে ইহাও ছিল নূতন।

তথাপি কেবলমাত্র নৈতিক শুচিতাকেই তিনি সর্ব্বাধিক মনে করিতে পারেন নাই; বরং হৃদয়ের প্রসারকেই সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত নৈতিক শুচিতাও যে একরূপ স্বার্থপরতা, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; যাহারা মহৎ বা মহাপ্রাণ তাহাদেরও চরিত্রস্খলন যেমন সম্ভব, তেমনই, যাহারা অতিশয় হীনচেতা তাহারাও ঐরূপ স্খলন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'কাম-কাঞ্চন ত্যাগে'র উপদেশ মনে পড়ে, এবং সেই সম্বন্ধে আর একটি যে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় তাহা এই যে, আধ্যাত্মিক শ্রেয়োলাভের জন্য যদি ওই দুই-ই বর্জ্জনীয় হয়, তথাপি, বরং প্রথমটাও ভাল, তাহাতে মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক বিলোপ না হইতেও পারে (হয় নাই, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে)। কিন্তু দ্বিতীয়টির লালসায় মানুষের মনুষ্যত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্থ-গৃধ্নু মানুষের মত অমানুষ—পিশাচ আর নাই, এমন চরম অধোগতি আর কিছুতেই হয় না। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র ওই নৈতিক শুচিতা বা moralityর পরিবর্ত্তে 'চিত্ত-শুদ্ধি'কেই প্রাথমিক প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন; যথা—

> ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা; চিত্তশুদ্ধির তাহা অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে।...ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব না; কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমার গুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল।...আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক—আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন।...সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষা এই আত্মাদর এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন।

ইহার মত সত্য আর নাই; এমন মানুষ অনেকেই দেখিয়াছেন—যাহারা অতিশয় কাঞ্চনলোভী ও কৃপণ বলিয়া পঞ্চ-মকারের ঘোরতর বিদ্বেষী—বিশেষত পঞ্চমটিকে অতিশয় ভয় করে; কারণ তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অর্থনাশক; অথচ সেই কারণে নৈতিক শুচিতার আস্ফালন করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যে চিত্তশুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও 'ভূতশুদ্ধি' অথবা দেহ-মনের পাপ-ক্ষালন নয়—সর্ব্ববিধ স্বার্থের কলুষ-মোচন; চিত্তের যে প্রসার ঘটিলে পর-প্রীতি ও আত্ম-প্রীতি এক হইয়া যায়, তাহাই চিত্তশুদ্ধি। অর্থাৎ,

শুচি-অশুচি বাহিরের বিষয়—অন্তর পবিত্র হওয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ; এই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র লক্ষণ—পরার্থে আত্মবিলোপ, মানবপ্রীতি। যে-morality ব্যক্তির একটা আত্মাভিমান মাত্র, যে সত্যনিষ্ঠাও একরূপ আত্মনিষ্ঠা মাত্র—বঙ্কিমচন্দ্র সেই truth ও সেই morality-কে কোনও পৃথক মর্য্যাদা দেন নাই। মনুষ্যসেবার নিঃস্বার্থ কর্ম্মে, বৃহত্তর কল্যাণ বা হিতসাধনের সমস্যাসঙ্কটে, ঐরূপ আত্মাভিমানপ্রসূত truth বা morality-র দম্ভ একরূপ রিপু হইয়া দাঁড়ায়—চিত্তশুদ্ধির অভাবই তাহার কারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে চারিত্রিক শুচিতারও একটা ব্যবহারিক মূল্য থাকা চাই, তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হওয়া চাই ; কেবল ভাব, চিন্তা বা যুক্তির একটা দৃঢ়-বন্ধন মানুষের নৈতিক বল বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিলে মানুষ বড় ছোট হইয়া যায়—তাহার জীবন বড়ই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠে। নিঃস্বার্থ লোকহিতসাধনের পক্ষে যেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রয়োজন—সত্যকার morality তাহার অধিক কিছু নয় ; যে চারিত্রিক শুচিতা জীবন-বৃক্ষের প্রসারিত শাখায় ফুলে ফলে বিকশিত হইয়া না উঠে, তাহা একরূপ বন্ধ্যা বলিয়াই মূল্যহীন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের সেই নৈতিক শুচিতাব্যাধিকে একটা উদার ও বলিষ্ঠতর আদর্শে শোধন করিয়া লইযাছিলেন ; morality-কে আদৌ অস্বীকার করেন নাই, তাহাকে মনুষ্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন ; সত্যকেও তিনি একটা হিতাহিত-নিরপেক্ষ নীতির ভাবাতিশয্য হইতে মুক্ত করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের কষ্টিপাথরে যাচাই না করিয়া পারেন নাই। এখানেও বাস্তব এবং আদর্শের সমন্বয় হইয়াছে।

কিন্তু সে যুগের প্রধান সমস্যা ছিল—মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরবের দাবি ও তাহার পূরণ ; ইহাই সকল সমস্যার মূল। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের মূল্য ও মনুষ্যত্বের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে ; তজ্জন্য ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহার কল্যাণসাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিহিত হওয়া চাই। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা ভাবিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী যে ব্যবস্থার একটা খসড়া তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তথাপি সে সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি মূল চিন্তার একটু ব্যাখ্যা ও বিচার আবশ্যক। প্রথমেই দেখা যায়, তিনি একটা আদর্শ সমাজ কল্পনা করিযাছেন ; সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইয়ের কল্যাণ যেমন একই, তেমনই ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র স্বার্থ বা অধিকার নাই, অতএব অধিকার-সাম্যের প্রশ্নও নাই। পরস্পরের সমান অধিকার নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার আছে—সে অধিকার মানুষ হওয়ার অধিকার। ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—তাহা শিক্ষা, এবং তাহাতে মানুষমাত্রেরই অধিকার থাকিবে। শিক্ষার মূলে একটা আদর্শ থাকিবেই ;—সমাজই মনুষ্যত্বের ভিত্তি বটে, কিন্তু তাহারও একটা আরোহণীয় চূড়া আছে ; মানুষ সকলেই

সমান এই অর্থে যে, সেই আরোহণ-সামর্থ্য সকলেরই আছে। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী, নতুবা তাঁহার মত বাস্তববাদী সে যুগে আর কেহ ছিল না।

এই শিক্ষারই শ্রেষ্ঠ পন্থা—অনুশীলন। তথাপি সাধারণ অর্থে যাহাকে শিক্ষা বলা হয়, তাহারও বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও কম মূল্যবান নহে, বরং আজিকার দিনে আরও সত্য বলিয়া মনে হইবে। নবযুগের নূতন শিক্ষা-সমস্যাও তিনি দৃষ্টিমাত্রে বুঝিয়া লইয়াছিলেন—তাহার কারণ, তাঁহার সেই দৃষ্টি সমগ্রের উপরে নিবদ্ধ, তিনি সর্ব্ববিষয়ে পূরা মানুষকেই দেখিয়াছেন—হাত-পা'কে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না, এবং কতকগুলো বই পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।

(২) যে লেখাপড়া জানে না তাহাকে মূর্খ বলিও না; আর যে লেখাপড়া করিয়াছে তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে।

(৩) জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ [আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর], কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া.........এ দেশে বাঙালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে, কোন দেশে রণপ্রিয় পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে; ইহারই প্রভাবে য়ুরোপে এত যুদ্ধ, দুর্বলের উপর এত পীড়ন।

(৪) আধুনিক শিক্ষার দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয়ে শিখিবার প্রয়োজন নাই।......সকলে আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথায়?

(৫) এই জ্ঞানার্জ্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদের শিক্ষার ফল—মানসিক অজীর্ণ, বৃত্তিসকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ—জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট বলিতে পার; তারপর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইল...সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে। (বঙ্কিমচন্দ্র গর্দ্দভদের কথাই বলিয়াছেন, কারণ আধুনিক অশ্বতরগণের তখনও উদ্ভব হয় নাই।)

(৬) ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের কুশিক্ষার মূল য়ুরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়তো আরও নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না।

শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগোচিত সত্যসন্ধান যে কত গভীর ও দূরপ্রসারী ছিল, এই কথাগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

কিন্তু আসল কথা ওই সমাজ। সমাজ বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অনুধাবনযোগ্য; কারণ, তাঁহার সমগ্র জীবনদর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বকে ধারণ করিয়া আছে এই সমাজ। তাঁহার মতে সমাজ অর্থে প্রথমতঃ—একটা বিশেষ স্থান ও কালগত সংস্কৃতি বা জাতিসংস্কারসম্পন্ন জন-সংহতি; পরে, সেই জনগণের আত্মবিকাশের জন্য

ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত যে একত্র-জীবন—তাহারই আধার এই সমাজ। অতএব সমাজ বলিতে একটা জাতি ও দেশের সীমাযুক্ত জনমণ্ডলীই বুঝায়—স্বজাতি ও স্বদেশ বুঝায়। এইরূপ প্রত্যেক সমাজের স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিকাশের অধিকার স্বীকার করিলে, স্বকীয় ও পরকীয় অধিকার সমভাবে মানিয়া চলিলেই—মানুষের এইরূপ সমাজবদ্ধ জীবনে মনুষ্যজাতির বৃহত্তর কল্যাণ আপনা-আপনি সাধিত হইবে,—অনুশীলনধর্ম্মের অন্তর্গত জগৎপ্রীতির সহিত স্বজাতি-প্রীতির সংঘর্ষ ঘটিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ইহার সত্য ও সম্ভাব্যতা বিশেষ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন। একেবারেই অতি উচ্চ আদর্শ খাড়া করিয়া ভাবের স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতে তিনি এখানেও বিশেষ সাবধান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি আধুনিক রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক শ্রেয়োলাভকেই মানুষের পরম পুরুষার্থ মনে করেন নাই—মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তাই আজিকার যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, ও তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার যে সংগ্রাম-নীতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার দূরতম সম্পর্ক নাই। ব্যক্তি বা মানুষমাত্রের মনুষ্যত্ববিকাশের অধিকার ইহাতে যেমন স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনই ইহাতে মানুষের সেই কল্যাণের ধারণাও স্বতন্ত্র—একালের ভাষায় তাহা নিতান্তই 'পেতি বুর্জোয়া'। তথাপি ইহারও অভিপ্রায—মনুষ্যসাধারণের সুখসাধন; মানুষের জীবনকে নির্ব্বিষ করিয়া, তাহার প্রকৃতিকেই সুস্থ ও সবল করিয়া একটা স্থায়ী কল্যাণেব অভিমুখে তাহাকে চালনা করা। সেই কল্যাণ কি, এবং তাহার কোন স্থায়ী বা ধ্রুব আদর্শ আছে কি না—মতভেদ সেইখানেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ তেমন অবুঝ নয়; তিনি সেই আদর্শকে গন্তব্যরূপেই সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। সকলেই একই সঙ্গে, একই কালে সেই এক গন্তব্যে না পৌঁছিলে সাম্যতত্ত্বের হানি, অথবা অবাস্তবতা-দোষ ঘটে বলিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। জীবনকে যে দিক দিয়া দেখার ফলে আধুনিক সাম্যবাদ একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মানুষের সুখ-স্বাধীনতাকে যে মাপকাঠিতে মাপিয়া লওয়ার ফলে এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ-নীতি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবন ও মানুষের সুখ এই দুইকে সে দিক দিয়া দেখিতে পারেন নাই—চাহেন নাই বলিয়া নয়, তাহা মনুষ্যপ্রকৃতির অনুকূল নয় বলিয়া। প্রকৃতির নিয়মেই পুরুষের যে-উন্নতি সম্ভব তাহাকেই—তাহার স্বভাবের মধ্যেই যে মহত্ত্বের বীজ আছে তাহার পূর্ণবিকাশ-সাধনকেই, তিনি বাস্তব ও আদর্শের সামঞ্জস্যমূলক—অতএব অতিশয় সত্য—বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যে গাণিতিক জড়-বিজ্ঞানের অনুসরণে—কোনরূপ নিঃশ্রেয়স্ নয়—দেহ-মনের সর্ব্ববিধ অভাব-মোচনই পরম পুরুষার্থ, এবং সেইজন্য সর্ব্বমানবকে সেই এক ক্ষুধার বন্ধনে বাঁধিয়া, সকলের অধিকার সমান করিয়া,

একটা মহামানবসমাজ প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা মানুষের প্রকৃতিতে ও জড়কে চিৎ-এর উপরে বসাইয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র জড়কে চিৎ-এর উদ্ভব-ক্ষেত্র নয়—বিকাশক্ষেত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি যে সমাজের ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐরূপ সমানাধিকার বা একাকারের সাম্য যেমন প্রকৃতি-বিরোধী, তেমনই নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই জানিতেন,—বঙ্কিমচন্দ্র ততটা বাস্তববাদী ছিলেন না। এরূপ বাস্তববাদও সত্য নয়—ইহাও একান্তী, অর্থাৎ এক অন্তের বিপরীত অপর অন্ত মাত্র। যাহারা চৈতন্যকে অস্বীকার করিয়া জড়কেই পরম তত্ত্ব করিয়াছে তাহারাও একচক্ষু। সৃষ্টিকে জড়শক্তির একটা আবর্ত্তশীল প্রকাশধারা, এবং মানুষের চৈতন্যকে তাহারই অন্তর্গত একটা আদি-অন্তহীন বিবর্ত্ত-বিলাস বলিয়া যাহারা স্থির করিয়াছে, তাহারা মনুষ্যত্বের মাথাটাই কাটিয়া দিয়াছে—তাই সে বিষয়ে তাহাদের কোন মাথাব্যথাও নাই। ইহারা খাঁটি নাস্তিক হইতে চায়, ধ্রুব সত্য বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে নারাজ। ইহাদের যুক্তিও নিশ্ছিদ্র হইবারই কথা—কারণ, ইহারা মূল সমস্যাটাই উৎপাটিত করিয়া সব তর্কের জড় মারিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বাস্তবজীবনের কোন প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নাই, কেবল সেগুলিকে একটি মহা প্রয়োজনের অধীন করিয়া দেখিয়াছেন। কেবল প্রাণী-হিসাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হইতে পারে না; মনুষ্য-জাতির ইতিহাস, বাহিরের দিক দিয়া যেমনই হউক—ভিতরের দিক দিয়া তাহারই সাক্ষ্য দিবে। উপসর্গ যত বড় হউক, তাহার চিকিৎসাই আসল চিকিৎসা নয়। সব পাইয়াও মানুষের দুঃখ দূর হয় না, আবার সব হারাইয়াও মানুষ পরম সুখ লাভ করে;—ইহা ভুল শিক্ষা, কুসংস্কার, আত্মপ্রবঞ্চনা, অথবা এক শ্রেণীর দ্বারা অপর এক শ্রেণীর উপরে উৎপীড়নের ফলে একরূপ চিত্তবিকার নয়। ইহা যদি ব্যাধিও হয়, তবে তাহা মানুষের জন্মগত ব্যাধি। সৃষ্টিবিধানের একটা রহস্যময় নিয়মই এই যে যাহাতে বন্ধন তাহাতেই মুক্তি, যাহাতে মৃত্যু তাহাতেই জীবন, যাহা ব্যাধি তাহাই আরোগ্যের নিদান। মানুষ যেমন বাহিরকে জানিয়াছে এবং চিরদিন তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে ও করিতেছে—তেমনই তাহার অন্তরের মধ্যেও সে আপনাকে নিত্য নিরীক্ষণ করিতেছে; একটার দিকে অন্ধ হইয়া অপরটাই দেখিতে চাহিলে, তাহা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—পরিত্রাণও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যাহারা ঐ জড়-শক্তির লীলাকেই বিশ্বাস করে আর কিছুই বিশ্বাস করে না, তাহারা অবশ্য কোনরূপ পরিত্রাণেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু ইহাও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, অথবা গাণিতিক জড়-বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তির কথাও নয়; ইহাও ওই জড়তত্ত্বের মতই একটা অতিশয় বাস্তব তত্ত্ব—চোখ বুজিলেই তাহাকে অস্বীকার করা যাইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র কোন তত্ত্বকেই অস্বীকার করেন নাই—তাহার কারণ এখানেও সকল তত্ত্বের মূলে এক তত্ত্বই আছে; সেই এক তত্ত্ব জড়ও নয়, চিৎও নয়—মানুষ। আবার

প্রত্যেক জাতির স্বধর্ম্ম ও দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সমাজ গড়িয়া উঠে তাহা যেমন স্বাভাবিক তেমনই সঙ্গত: স্বাভাবিক বা প্রাণধর্ম্মী বলিয়া তাহা গণিত-বিজ্ঞানের শাসন মানে না, এবং সঙ্গত বলিয়াই তাহা সত্য—কেবলমাত্র তত্ত্বের সত্য নয়। তাই বলিয়া সমাজভেদে মনুষ্যত্বের ভেদ নাই; এক দেশে শীত যেমন স্বাস্থ্যকর, অপর দেশে গ্রীষ্মও তেমনই; কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাটা দেশোপযোগী হয়, তাহাই হইয়া থাকে—না হইয়া পারে না। অতএব এই অর্থে সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ব্যবস্থাভেদ জাতি ও দেশহিসাবে যেমনই হউক, তাহার মূল নীতি সকল সমাজের পক্ষেই এক—তাই তাহা সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের অনুগত। এইরূপ অসংখ্য সমাজই সেই মহামানবজীবনে 'সূত্রে মণিগণা ইব' গ্রথিত হইয়া থাকে। সমাজের আত্মরক্ষাকে তিনি খুব বড় প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলেও—স্বাধীনতার অর্থ করিয়াছেন অন্যরূপ। প্রত্যেক সমাজের স্বকীয় সংস্কৃতি ও স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া বাঁচিবার যে নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা, তাহারই নাম স্বাধীনতা—আধুনিক ভাষায় ইহারই নাম 'self determination of nations'। রাজার শাসন বা রাষ্ট্রীয় বিধান যদি তাহার প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য; কেবল তাহা বিঘ্নকর না হইলেই হইল। তারপর সেই রাষ্ট্রশক্তির বৃদ্ধিসাধন, অথবা তাহার বৈষয়িক উন্নতিই যদি সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য, কারণ তাহাতে মনুষ্যত্ববিকাশ রুদ্ধ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, এবং কেনই বা সেই সমাজকেই মানুষের কল্যাণসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আমি যথাসাধ্য তাহার একটা বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিলাম, তাঁহারই ভাবনা-চিন্তার অনুসরণ করিয়া তাঁহার আদর্শের একটু পরিচয় দিলাম—তাঁহাকেই বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমি তাহাই করিয়াছি—যুক্তিতর্ক আমার নহে, তাঁহারই। এইরূপ সমাজ সম্ভব কি না, তাহা ভবিষ্যতের মানুষ বলিবে—যদি চায়, তবেই তাহা সম্ভব হইবে। বর্ত্তমান যুগের এই মহামারীর মধ্যে এক দিকে আধুনিক মনুষ্যসমাজের ভিতরে-বাহিরে যে দারুণ হিংসা ও হানাহানি, অপর দিকে ব্যক্তির স্বাধিকারমূলক যে সার্ব্বভৌমিক সমাজনীতির উগ্র আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কেবল ইহাই মনে হয় যে, মানুষের দুঃখের আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে যেমনই হউক, মূল সমস্যার সমাধান হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে; মানুষের মনুষ্যত্ব নামক ধর্ম্মকে মানুষ যতদিন না পূরাপূরি স্বীকার করিবে, এবং সেই ধর্ম্মসাধনের জন্য ব্যক্তি, জাতি বা সমাজবিশেষের 'একোঽহং'-অভিমানও যেমন তেমনই 'বহু স্যাম'-কামনার নিছক সাংখ্য-নীতিও পরিহার করিয়া, যতদিন না ওই দুইয়ের সামঞ্জস্যমূলক 'নর-নারায়ণ'-বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ততদিন, মানুষের ইতিহাসে যে মন্বন্তর আসন্ন হইয়াছে তাহার শান্তি হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র-পরিকল্পিত

এই সমাজ একটা ভাবস্বর্গ বা অবাস্তব Utopia নয়; তাহা যে মনুষ্য-প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব, তাহা যে বুদ্ধি ও যুক্তি-সঙ্গত, এ কথা সকল সুস্থ মানুষ স্বীকার করিবে। ওই আদর্শকে ব্যবহারিক রূপ দিতে হইলে, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মনীতির যে পরিবর্ত্তন ও তদনুযায়ী বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাও খুব বড় মিস্ত্রীর কাজ; তেমন প্রতিভাও দুর্ল্লভ হইবে না—যদি 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া মানুষের প্রাণে ওই মনুষ্যত্ব-পিপাসা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র সেইকালেই যে সমস্যাকে মূল সমস্যা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আজিকার দিনে তাহাই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার যে উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাও একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে নাই। একটা বিশিষ্ট যুগ ও জাতির সম্পর্কে তাঁহার সেই চিন্তাই আজ জগতের সর্ব্বজাতির চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাব কারণ, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-সন্ধানে মানুষেরই কল্যাণ-চিন্তা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সম্পর্কে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি চিন্তা উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা।

(২) সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী, আর কতকগুলি অনুপযোগী। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতে ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায় প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ। ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষ আর একটি উদাহরণ। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়।

(৩) রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য, এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিবলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি, তাহা ইঁহাদের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু।

(৪) রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। বিবিধ সমাজের উপরে কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না সভ্য ইউরোপের এই রীতি।...অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই।

শেষের উক্তিটির অর্থ এই যে, যেহেতু পৃথিবীর সকল সমাজেব উপরে একজন রাজা বা একটা শাসনতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান এবং অপক্ষপাত হইয়া বিরাজ করা প্রায় অসম্ভব, এবং সেইহেতু কাড়াকাড়ি হানাহানি হইবেই, অতএব প্রত্যেক সমাজকে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইতে হইবে। এই স্বদেশ ও সমাজ একই বস্তু। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক কালে বিশ্বমানব নামে যে একটা ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এই সমাজ অর্থে-ই 'নেশন' বুঝিতে রাজী আছেন, এবং Nationalism-এর উপরে Internationalism স্থাপনা করিতে চান। এদিক দিয়া তিনি খাঁটি Realist, কারণ, প্রকৃতিবাদী—তত্ত্ববাদী বা ভাববাদী নহেন; অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টির, তথা মানবপ্রকৃতির মহানিয়মকে মানেন; মানবের মানবত্ব কোন অর্থে যতই

সার্ব্বভৌমিক হউক—ভৌগোলিক প্রকৃতি, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন এবং রক্তের পার্থক্য, এই তিনের সমবায়ে সমাজে সমাজে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী; নির্ব্বিশেষ নয়—বিশেষের অভিমুখেই সৃষ্টির গতি। এই বৈশিষ্ট্য মনুষ্যজাতির মঙ্গলের অন্তরায় নয়, বরং ক্রমোন্নতির সহায় বা সোপানরূপে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ যেমন, সমাজ ও মহাসমাজের সম্বন্ধও তেমনই। ব্যক্তির আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তির স্বতন্ত্র-স্ফুরণ এবং সমাজের বৃহত্তর জীবনের সহিত তাহার সামঞ্জস্য-রক্ষা যেমন একই কালে হইতে পারিলে উভয়ের যথার্থই কল্যাণ হয়, তেমনই, কোন সমাজ স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিলেই তাহার যে জ্ঞান ও শক্তি লাভ হইবে—তাহাতেই পর-সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ সহজ ও সুস্থ হইবে; যদি না হয়, তবে তাহার সেই স্বধর্ম্মও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ—তাহা 'স্ব' হইতে পারে, কিন্তু 'ধর্ম্ম' নয়। এ বিষয়ে তিনি "স্বদেশপ্রীতি" প্রসঙ্গে অতিশয় নিপুণ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, পরে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। এইজন্যই সমাজ অর্থে তিনি জাতি ও দেশের গণ্ডি বিশেষভাবে স্বীকার করিতেন, মহামানব-সমাজ নামে কোন অত্যুচ্চ অপ্রাকৃত আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। তাই—

> আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলের স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি, 'লিবর্টি' শব্দের অনুবাদ;...ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।"—শুনিলে একালে সকলেই চমকাইয়া উঠিবেন, কিন্তু এই কথা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজতত্ত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা রক্ষাকেই মনুষ্যত্ব-বিকাশের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া মানিতেন না; তাহাকে আদি প্রয়োজন বলিয়া মানিলেও—অরাজকতা বা কুরাজকতাকে মানুষের ধর্ম্মসাধনের একটা বড় বিঘ্ন বলিয়া জানিলেও, এবং তন্নিবারণকে একটা প্রধান, এমন কি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও—সেই সংক্রান্ত ব্যাপারকে তিনি অত্যধিক মূল্য দেন নাই, লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্যকে বড় করেন নাই। রাজা বা শাসক-সম্প্রদায়কে তিনি একটা পুলিশ-পাহারার মতই আবশ্যক মনে করিয়াছেন—সেটা যেন সমাজের কতকটা বাহিরের ব্যবস্থা, ভিতরে সমাজ-পরিচালনের আসল ভার অন্যত্র ন্যস্ত থাকিবে; যাঁহারা মহামনীষী এবং ধর্ম্মপ্রাণ—সমাজের সেই শিক্ষকগণ রাজারও গুরু। অর্থাৎ আসল শাসনটা সামাজিক—রাষ্ট্রিক নয়; এবং সেই

শাসনও সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ববিকাশের প্রয়োজনমূলক; সেখানে স্বাধীনতা অর্থে পোলিটিক্যাল আত্মপ্রসাদ বা ইকনমিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য নয়। ইহাও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির দিকটা ঠিক থাকিলেই অন্যগুলি আপনিই উৎকর্ষ লাভ করিবে; আমরা এখন তাহাই বুঝি—সেই যুক্তিকেই অকাট্য মনে করি। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ভুল করেন নাই—যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ওই মনুষ্যত্বের আদর্শই ভুল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা-মন্ত্র, ও তৎপ্রচারিত মানব-ধর্ম্মবাদের সার মর্ম্ম ; যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও সৃষ্টি-গৌরব।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবধর্ম্মে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তা-মন্ত্রের স্থান কি তাহার একটু সবিশেষ আলোচনা করিলেই বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা একরূপ শেষ হইবে। যে স্বাজাত্যবোধ একদা বাংলা দেশেই জন্মলাভ করিয়া সমগ্র ভারতে একটা নূতন ধর্ম্মচেতনার মত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার আদি-প্রবক্তা যে বঙ্কিম, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের আর সকল তত্ত্ব ওই এক তত্ত্বে আসিয়া ঠেকিযাছে— জাতি ও সমাজ এই দুইয়ের এক অর্থ দাঁড়াইয়াছে—স্বদেশ। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে, ক্রমে ভারতবাসী সকল শিক্ষিত-সমাজের মন, স্বদেশ-প্রেম নামক যে একটা বিলাতী সেণ্টিমেণ্টে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অবশেষে একটা ধর্ম্মবিশ্বাসের মত গভীরতা লাভ করিল বাঙালীর এই মন্ত্রদৃষ্টির প্রভাবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বাংলাদেশে ওই ভাবের যে যজ্ঞানল জ্বলিয়াছিল— তাহার মন্ত্রোচ্চারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অক্ষরগুলা ছিল বটে, কিন্তু ধর্ম্মের বিশুদ্ধি ছিল না ; বঙ্কিম যে বিলাতী patriotism-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, সেই বস্তুই ভাবোদ্দীপনার সহায় হইয়াছিল। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি মনুষ্যত্বসাধনারই একটা অঙ্গ— সেই বৃহত্তর ধর্ম্মেরই একটা বড় সাধন। ইহার মূল প্রয়োজন রাষ্ট্রিক নয়—সামাজিক ; স্থূলভ পরজাতি-বিদ্বেষ নয়—স্বজাতি-প্রীতিই ইহার একমাত্র প্রেরণা ; এমন কি, জগৎ-প্রীতি ও ভগবৎ-প্রীতিতেই তাহার শেষ পরিণতি। এই স্বদেশপ্রীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বলাভের অতিশয় সহজ ও নিশ্চিত উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালের মত গোড়া হইতেই ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ-সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিলে একালে আর চলিবে না ; ভগবানের জন্য সংসার-ত্যাগ নয়—মানুষের জন্যই আত্মত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না ; ভগবান-লাভ তো পরের কথা, আপনাকেও হারাইতে হইবে,—এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; এবং য়ুরোপীয় জাতিসকলের স্বাজাত্যনিষ্ঠা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি সেই patriotism-কে শোধন করিয়া—তাহাকেই মানুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে গড়িয়া লইয়াছেন। তাঁহার সেই অনুশীলন-ধর্ম্মের সকল অঙ্গ সংযোজন ও সুসম্পূর্ণ করিয়া লওয়ার পরে, তিনি যেন শেষে এই মন্ত্রটিকে বিদ্যুৎবিকাশের মত আপন

অন্তরে দর্শন করিলেন—"ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম"। তারপর—

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তাহার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্ম-ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য Herbert Spencer বলিয়াছেন, "The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units", অর্থাৎ আত্মরক্ষা অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(২) আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা…জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাস্তবিক জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন? [মহাত্মা গান্ধীর আচরণ স্মরণীয়।]…জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

(৩) আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।…জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্যধর্ম্ম না লিখেন।

এইখানে বোধ হয় একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যেমন ঐরূপ দেশবাৎসল্যের একটা উৎকট উন্মাদনা বাঙালীকে প্রায় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—তেমনই, তাহার কিছু পরেই অতি-উর্দ্ধ ভাব-স্বর্গ হইতে ঠিক বিপরীত ধর্ম্মের একটা সূক্ষ্ম বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে—তাহাতে সেই বিধ্বস্ত সমাজের অবশিষ্টগণের ক্লীবত্ব ঢাকিবার বড় সুযোগ হইয়াছে। এই ধর্ম্মের নাম বিশ্বমানব-প্রেম ; ইহার প্রধান লক্ষণ হইল—দেশ ও জাতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করা ; খুব-বড়কে মৌখিক পূজা নিবেদন করিয়া, মাঝারি-বড়কে ধিক্কৃত করা, এবং তদ্দ্বারা খুব-ছোটর উপাসনাকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া আত্মসুখসাধন। সেই উন্মাদনার প্রতিক্রিয়া-মুখে এই ধর্ম্ম বড়ই আরামদায়ক হইয়াছিল, Nationalism যে কত বড় অধর্ম্ম—ভাবস্বর্গবাসী কবির মুখে তাহা শুনিয়া কুলটুরবিলাসী আত্মসুখলম্পটের আনন্দ আর ধরে না! অথচ, এইরূপ Nationalism-কে গালি দেওয়া যে নূতন নয়, এবং

তাহাকে গালি দিয়াও স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি যে একটা বড় ধর্ম্ম হইতে পারে—একথা এক পুরুষ পূর্ব্বেও একজন মহামনীষী প্রচার করিয়াছিলেন—সে সন্ধান কেহ লইল না, এ জাতির ঐতিহাসিক আত্মজ্ঞান এমনই। এক এক প্রহরে এক-একটা ডাক ডাকিলেই হইল—একজন যে ডাক ধরাইয়া দিবে, আর সকলে তাহাই ডাকিবে; কণ্ঠের কণ্ডুয়ননিবৃত্তি হইলেই হইল। যে ভূমা ও বিশ্বমানবপ্রীতির আজ এত প্রসার হইয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে এক মুহূর্ত্তও অস্বীকার করেন নাই; এবং ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, জাগতিক প্রীতির সহিত দেশপ্রীতির সামঞ্জস্যসাধন করিতে না পারায়, ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন মনুষ্য-ধর্ম্ম অবনতিগ্রস্ত হইয়াছে—আমাদের সামাজিক অবনতির একটা বড় কারণ ইহাই।

ভারতবর্ষীযদিগের ঈশ্বর-ভক্তি ও সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইযা দিযাছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই কথাই, বোধ হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা খুব বড় কথা। পারমার্থিক আদর্শ, ও সেই আদর্শের সাধনায় ভারতবর্ষে জন-জীবন যে দিক দিয়া যতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকুক, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী তাহার সমাজ যতই সুবিহিত হউক—তাহার ঐতিহাসিক কর্ম্মজীবনের ধারা যে বার বার রুদ্ধ হইয়াছে, এবং মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা ঘটিয়াছে, ইহার মত সত্যও আর কিছু নাই। এই সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করেন নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য যে সমস্যা, তাহাকে এমনভাবে জাতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের অনুকূলে একটা নূতন ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রের দ্বারা সমাধান করা, ইহাই তাঁহার মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। জাগতিক প্রীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ইহাই বটে; কিন্তু তত্ত্বকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে—মানুষকে নিঃস্বার্থ করিবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়—এ যুগে এমন আর কিছু নাই। মনুষ্য ধর্ম্মের সকল দিক চিন্তা করার পর সর্ব্বশেষে এই যে তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টির গভীরতাও যেমন—তেমনই তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠাও প্রকাশ পাইয়াছে। মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম নিশান হইল এই দেশপ্রীতি। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও চিন্তাপ্রণালী যিনি আমূল পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না; বরং জাতির চিন্তার ইতিহাসে তাঁহার এই দান যেমন অমূল্য, তেমনই যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। ভারতীয় ধর্ম্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্ব্বে কেহ করে নাই।

উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমাজ ও

স্বদেশ একই, অর্থাৎ দেশই সকল সমাজের অধিষ্ঠান-ভূমি। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে, দেশ-কালের গূঢ়তর প্রভাবে, মনুষ্যজাতির গোষ্ঠীবিভাগ অনিবার্য্য, এবং সেই কারণে স্বাজাত্যবোধও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার চেতনা নানা কারণে কোথাও অপরিস্ফুট, কোথাও বা অসুস্থ আকারে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষে একরূপ সমাজচেতনাই ছিল—এইরূপ জাতীয়তার চেতনা কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। পরে সেই প্রাচীন সমাজধর্ম্মও অটুট থাকে নাই, যুগান্তরের প্রয়োজন সত্ত্বেও, মানুষের ধর্ম্মকে সমাজধর্ম্মের সহিত যুক্ত করা হয় নাই—সমাজ একটা বাহিরের বন্ধনমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; মানুষ তাহার মধ্যে স্ব ও পরের কল্যাণকে এক করিতে না পারিয়া শেষে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল—তাহার আধ্যাত্মিক সাধনাও স্বার্থসাধনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, জীবনে আত্মোৎসর্গের অবকাশ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; জাগতিক প্রীতি বা সর্ব্বভূতের হিতসাধন—কর্ম্মে নয়, ধ্যানে ও ভাববিলাসে স্থান লাভ করিয়াছিল; শাস্ত্র-বচনের মত তাহা কেবল উচ্চারণ করিয়াই মনকে পবিত্র করা যাইত। তাই নবযুগের নবধর্ম্মের প্রেরণা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজকে সেই ধর্ম্মের প্রধান সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিলেন, তাহাতে এই দেশপ্রীতি হইল প্রত্যক্ষ সাধন; এমন কি ভগবৎ-প্রীতির এক ধাপ নীচেই তাহার স্থান! বহুর কল্যাণ-কামনায় একের আত্মোৎসর্গই যে বিশেষ করিয়া এ যুগের মানব-ধর্ম্ম, ইহা তিনিই প্রথম স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন; এই অনুভূতিই পরে অপর এক মহাপুরুষের ধ্যানে ও কর্ম্মে আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমা লাভ করিয়াছিল—সে কথা পরে বলিব। আজিও জগৎ ব্যাপিয়া যে সাগর-মন্থন চলিতেছে তাহার বিষবাষ্পে মূর্চ্ছিত ও উৎসন্নপ্রায় মানবসমাজ আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না—ওই অমৃতই একমাত্র ভরসা। উহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। উহার দ্বারাই মানুষ যেমন 'বলবান্' হইযা 'আত্মা'কে লাভ করিবে, তেমনই দেশকে সমাজকে রক্ষা করিয়া, শুধু স্বজাতির নয়—সমগ্র মানবজাতির অকল্যাণ দূর করিবে।

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শে তাঁহার ওই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা মূলে সেই প্রাচীন আদর্শ; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির পরিবর্ত্তে তিনি মনুষ্যধর্ম্মনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তথাপি সেই সমাজকে তিনি এই যে একটি মন্ত্রের গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই সেই প্রাচীনকে সম্পূর্ণ আধুনিক পন্থায় স্থাপন করা হইয়াছে—সেই আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই এ যুগের প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে বরণ করা হইয়াছে। ওই আদর্শ ও যুগের এই প্রয়োজন এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, যদি একটা সমাজ-ব্যবস্থা সম্ভব হয়, এবং রাষ্ট্রনীতির সহিত সে ব্যবস্থার বিরোধ না ঘটে—এ দেশে এমন কোন লোক-গুরুর আবির্ভাব হয় যাঁহার প্রতিভায় জাতির জীবনে ঐ মন্ত্র কার্য্যকরী হইয়া

উঠে, তবেই এই মহামন্বন্তরে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, নতুবা নহে—বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই আশা ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে আর একবার বঙ্কিমের এই মানবধর্ম্ম-বিষয়ক চিন্তার একটা সার-সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি—তাঁহার নিজেরই কথায় তাহা প্রকাশ পাইবে, আমি সেইরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করিব মাত্র।

(১) এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়া ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম।...এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা পৈশাচিক পরিকল্পনা।

(২) "হিংসকদিগের হিংসা-নিবারণের জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।...যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম"—ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পর উদ্ধৃত করিতেছি—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য।" এখানে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

(৩) শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে এইরূপ জীবন্মুক্তির কামনা করিয়াই ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন।

গুরু। মুক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ।...যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত সে ইহলোকে মুক্ত।...তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া সে কর্ম্ম স্বদেশের ও জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কর্ম্মীদের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না।...এ-দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির পদপ্রাপ্ত হইবে।

(৪) ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইবে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। শেষের উক্তিটিতে তাঁহার নিজের সেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সে বিষয়ে কত সজ্ঞান ছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা তত্ত্বের সত্য মাত্র, তাহা মানুষের ধর্ম্ম নয়—জীবনে তাহাকে অনুভবগোচর করিতে না পারিলে, সেরূপ তত্ত্ববিচার নিষ্ফল। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, এইরূপ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নহে—সেই সত্যকে প্রাণেও প্রত্যক্ষ করা চাই। যাহা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু, তাহার ফল সমাজের উচ্চস্তরেই কিছু ফলিতে পারে; যদি উচ্চ হইতে নিম্নে সর্ব্বস্তরে একটা সামাজিক সমানুভূতির ধারা অব্যাহত থাকে, এবং যদি সেই তত্ত্ব জীবন-রস-বর্জ্জিত না হয়, তবেই তাহা উচ্চ হইতে নিম্নস্তরে আপনা-আপনি সংক্রামিত (filter down) হইতে পারে; তাহার যেটুকু জীবনীয় অংশ তাহা সর্ব্বস্তরের একটা সাধারণ কালচার বা চিত্তোৎকর্ষ রূপে ফলদায়ক হইয়া থাকে। তথাপি আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য-পুরাণের শক্তি এবং সাফল্যের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই—জীবনেরই একটা রূপকে আশ্রয় করিয়া সেই যে মানবধর্ম্মের ব্যাখ্যা ভারতবর্ষীয় জনগণের চিত্তে এতকাল ধরিয়া একটা

সংস্কৃতির স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি জানিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, নূতন যুগের সাহিত্যসৃষ্টিতে, শেষের দিকে, তিনিও এই অভিপ্রায় করিয়াছিলেন—পৌরাণিক ধর্ম্মের আধুনিক সংস্করণও যেমন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তেমনই সেকালের কাব্যপুরাণকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া—জীবনের নূতন রূপ-সৃষ্টির কথাও ভাবিয়াছিলেন ; তাই নব ধর্ম্মতত্ত্ব বা জীবন-তত্ত্বের ভাষ্যরূপে কাব্যরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক উপন্যাসের রচনা-কৌশল ও ধর্ম্মব্যাখ্যার সেই প্রাচীন প্রণালী, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য একরূপ অসাধ্যসাধন বলিলেই হয় ; তাহাতে তিনি কি পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর ; এ প্রসঙ্গে আমি কেবল তাঁহার সেই অভিপ্রায় ও তাহার যে কারণ অনুমান করিয়াছি, তাহাই বলিয়া রাখিলাম।

নবযুগের সমস্যা ও তাহার সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তার যে পরিচয় আধুনিক বাঙালী পাঠকসমাজে দিলাম, তাহাতে, আশা করি—আর কিছু না হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ এই বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিপটে ক্ষণিকের জন্যও প্রতিফলিত হইবে। বাঙালী নাকি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি—কি অর্থে জানি না। সে আপনাকে বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিগত ভাবে নয়—জাতিগত ভাবে। কালকে সে বাঁধিয়া রাখে 'সাতপুরুষের ভিটা'য় অন্তত এককালে রাখিত ; এবং ইতিহাস বলিতে সে নিজের ঊর্দ্ধতন পঞ্চাশ পুরুষের বংশতালিকাই বুঝিত ; নতুবা, কাল তাহার নিকটে নিরন্তরই বর্ত্তমান, অতীত মৃত ; ভবিষ্যৎ অলসের সুখস্বপ্ন মাত্র, এমন কি, তাহা নাস্তি বলিলেও হয়। সেই মৃত মহাকালের বক্ষে বর্ত্তমান-রূপিণী মহাকাল-জায়ার নৃত্য তাহার চেতনাকে কিঞ্চিৎ আঘাত করে—জীবনে ক্ষণপতঙ্গবৃত্তিই তাহার স্বধর্ম্ম ; এতকাল এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিয়াছে। জাতীয় জীবনধারার অতিশয় অপ্রশস্ত পথে সে যেমন কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে নাই, তেমনই, বৃক্ষ-জলাশয়-প্রতিষ্ঠাও করে নাই—ভবিষ্যতের পাথেয়-সঞ্চয় তো পরের কথা। কিন্তু আজ এতকাল পরে, তাহার সেই আত্মবিস্মৃতি নয়—ব্যক্তিসুখস্বপ্নের ঘোর আর টিকিতেছে না। মধ্যে সে ঘর ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া শ্মশানে পঞ্চমকার-সাধনায় মাতিয়াছিল, এখন তাহাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—কারণ, সবই যে শব, কে কাহার উপরে বসিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকারেই হঠাৎ একটু আলো জ্বলিয়াছিল—জাতীয় চেতনার একটা স্তরে জাগরণের লক্ষণ সত্যই দেখা দিয়াছিল,—আরও পূর্ব্বকালে যেমনই হউক, গত শতাব্দীর প্রায় প্রথম হইতেই তাহার প্রাণেমনে জীবনের সাড়া জাগিয়াছিল, এবং সে স্পন্দন ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য—তার পরেই মহামৃত্যুর দ্রুত আক্রমণ ; দেশ গিয়াছে, বাস্তু গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে, স্বধর্ম্ম

গিয়াছে—জাতিহিসাবে বাঁচিবার যাহা কিছু সবই গিয়াছে; দেহে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, মনেও মহামানবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে; ভাব যেমন ক্লীব, ভাষাও তেমনই কুলটা হইয়াছে। শিরে সর্পাঘাত হইলে তাগা বাঁধিবে কোথায়? তথাপি মৃত্যুকালে তারকব্রহ্মনাম শুনাইতে হয়—আমার এ প্রয়াস তদপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত বা আশাপ্রদ নয়।

সে যুগের যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনা—সে যুগের সকল উৎকণ্ঠাকে, জাতির হইয়াই একটি চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করা, এবং মুক্তির একটা প্রশস্ত পন্থা নির্দ্ধারণ—তিনি যেমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমন করেন নাই। তাঁহার সেই চিন্তার কতখানি এখনও এই বহু-মতের তুমুল সংঘর্ষে টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, এবং ভবিষ্যতেও তাহার কতটুকু সাধনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে বিচার এখানে নিস্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী বাংলা দেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে যে দিক দিয়া যে ভাবে বিচলিত করিয়াছিল—তাহা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি উভযের যে সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছিলেন, আজিও সেই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে; শুধুই যুগ বা জাতি নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাস গতি ও স্থিতির একটা সংশয-সঙ্কটে আসিয়া অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে—মানুষের মানুষ্যত্বের এক মহা পরীক্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য Humanism-এর যে প্রেরণা আমাদের চিত্তে জন্মিয়াছিল—রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্য্যন্ত তাহা প্রায় একমুখে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে একটা বাস্তব কিছুকে আশ্রয় করিয়া স্থির হইতে চাহিয়াছিল; চিত্তের সেই অস্থিরতার মধ্যে স্থিরত্বলাভের প্রয়াস বঙ্কিমের চিন্তাতেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়—সমগ্র-দৃষ্টি ও স্থির-দৃষ্টির লক্ষণ তাহাতেই আছে। দৃষ্টির ওই ভঙ্গীটাই বড়, তাহাই অধিকতর মূল্যবান। আমি যুগনায়করূপেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তিনি যুগকেও কোথায় কতটুকু অতিক্রম করিয়াছেন, প্রসঙ্গত তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিলেও, আমি মুখ্যত সেই যুগের কথাই বলিয়াছি; এবং তাঁহার নিজস্ব ভাবচিন্তা যেমনই হউক, তিনি যে তাঁহার কাল এবং তাঁহার সমাজকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহাও বার বার স্মরণ করাইয়াছি। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ একটা কথা আজিও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সেই যুগপ্রয়োজনের যতই বশীভূত হউক, তথাপি তাহা আরও গভীর অর্থে আধুনিক। যাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই, এবং যত দিন যাইতেছে ততই যাহা মানুষের ভাবে-চিন্তায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—নূতন জীবন-দর্শনের সেই সমন্বয়-তত্ত্ব তাঁহার প্রতিভাতেই প্রথম—শুধু চিন্তায় নয়—সৃষ্টিকর্ম্মেও ধরা দিয়াছিল। এইজন্যই আমি এই সমন্বয় শক্তিকে তাঁহার প্রতিভার প্রধান গৌরব বলিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সর্ব্ববিধ চিন্তায়, এমন কি ভাব

কল্পনায় ও কাব্যসৃষ্টিতেও, ইহাই যেন একমাত্র প্রেরণা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ভাষা নির্মাণে তিনি যেমন সাধু ও চলতি ভাষাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও—কাব্য, নাটক ও আখ্যান—এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিশ্র-রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই রূপও বাস্তব এবং আদর্শের মিলিত রস-রূপ। এখানেও ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস, প্রেম ও morality—এক রসকল্পনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় সাধনার মিলন চাহিয়াছিলেন, তেমনই মানুষের ধর্ম্মসাধনাতেও, ব্যক্তি ও সমাজ, জ্ঞান ও ভক্তি, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এই সকলকে এক সত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই ভারতীয় দৃষ্টি; নূতন যুগের নূতনতর সমস্যায় সেই সনাতনই আবার সাড়া দিয়াছিল; সর্ব্ব বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সমতা সাধনেই যে সকল সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়—বর্জ্জন নয়, গ্রহণেই পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র সেই তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; কেবল সে বিষয়ে তাঁহার নূতনত্ব এই যে, তিনি যুগসমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের বাস্তবকে—মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত সংস্কারকে—আদৌ স্বীকার করিয়া, সেই সমন্বয়ের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার তত্ত্ব যত বড় বা আদৌ যত উচ্চ হউক, তিনি সেই বাস্তবকে কিছুতেই হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী যে অপর দুই মহাপ্রতিভাশালী পুরুষ বাঙালীর এই জীবনযজ্ঞে প্রায় শেষ মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে; তাঁহাদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যতই সঙ্কীর্ণ বা তাঁহার সাহস যত অনধিক বলিয়া প্রতিভাত হউক—তথাপি এই বাস্তব-বুদ্ধিই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিছক আধ্যাত্মিকতাকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, এবং ভাবের তুরীয়-স্বর্গকে বিশ্বাস না করিয়া—কেবল একরূপ যুক্তি ও বিচারমূলক ভাবুকতার সাহায্যে তিনি যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-দর্শন তাহাতেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যে-সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি তাঁহার আদর্শকে নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান-(New Learning)-এর দ্বারা রীতিমত শোধন করিয়া লইয়াছিলেন; তাই সে আদর্শ যতই স্থিতিশীল হউক, তাহাতে গতির মাত্রাও অল্প নহে, ভারতের প্রাচীন ধ্রুব-তত্ত্বকে তিনি জীবনের গতিতত্ত্বে রূপান্তরিত করিয়া স্থিতি ও গতির বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; সত্য যত বড় হউক তাহা জীবনের সত্য হওয়া চাই—নহিলে তাহার কোন মূল্য নাই, ইহাই ছিল তাঁহার মূল ধর্ম্মমত। ইহারও একটি চমৎকার উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। সেই কালে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি গৌরববোধ জাগিয়াছিল, মহামতি সার্ হেনরি কটন তাঁহার

'New India' নামক গ্রন্থে তাহার সমর্থনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এবং মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি প্রবন্ধে তাহার অনুকূল যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

দ্বিজেন্দ্রবাবু বুঝাইয়াছেন যে, সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ভিন্ন মঙ্গল নাই।...গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়, বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতিভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে,...কোন নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সহিত নূতনের কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে;..প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব খিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সঙ্গে তাহা কতকটা মিশ খায়,...নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া যায়। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে...তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।... ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতুপরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।" [দ্বিজেন্দ্রনাথে চিন্তাশীলতার একটি উৎকৃষ্ট পরিচয়; এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা এক্ষণে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি।]

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন, "Better is Order without Progress, than Progress with Disorder"।

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি?..দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর।...কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। এই মতভেদটা তত গুরুতর নহে; কেন না, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মমূলক। তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না, অন্ততঃ "Historical Continuity" রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। -

Hinduism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life......The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilization to shatter. The stability of the Hindu character could have shown itself in on way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis.

...They (the vast majority of Hindu thinkers, who have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism) adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient Scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these rites are embedded in the traditions and customs of

the people; that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is therefore animated by a large-hearted tolarance.

[আশ্চর্য্য এই যে, বিদেশী দর্শক যখন এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তখনও রামকৃষ্ণের বাণী ও বিবেকানন্দ কর্তৃক তাহার নির্ঘোষ বাংলার দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে নাই; তাই, 'polytheism' নামটিতে বিদেশীর সেই অলঙ্ঘ্য সংস্কার যেমনই টিকিয়া থাকুক, এই ইংরেজ মনীষীর অন্তদৃষ্টি সত্যই অসাধারণ। কথাগুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

"হিন্দুধর্ম্ম এখনও বলীয়ান; তাহার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি যেমন দৃঢ় তেমনই তাহাদের প্রভাব ব্যাপক ও প্রাণবন্ত। রক্ষণশীলতা হিন্দুজাতির এমনই মজ্জাগত যে, কোন বিজাতীয় সভ্যতা কখনও তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারিবে না। হিন্দু যেভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দুর্দ্দম গতিবেগের সম্মুখে নত হইয়াই তাহার অন্তরের অন্তঃশীলা সেই ধর্ম্মভাবের ধারাটিকে এতবড় সর্ব্বনাশের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছে, এবং কিছুতেই এ বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই যে, ধর্ম্মই সমাজ ও লোকস্থিতির একমাত্র আশ্রয়— তাহাতে সে যেমন তাহার চারিত্রিক ধৃতি, তেমনই জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়াছে।

...[চিন্তাশীল হিন্দুসমাজের প্রায় সর্ব্বত্র একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে,— এই অতি স্থূল বাহ্যজ্ঞানবিজৃম্ভিত (পাশ্চাত্য) যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে সকলেই কোমর বাঁধিয়াছে। ইহারা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্ব-ধর্ম্মের যে ধারণা করিয়াছে তাহাকেই স্থায়ী ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরোপাসনার একটা না একটা আদর্শ ধরিয়াছে; অথচ তাহারই সঙ্গে খাঁটি পৌরাণিক দেবদেবী-পূজার নানা অনুষ্ঠান বজায় রাখিবার উপায় করিয়াছে। এ পক্ষে তাহাদের যুক্তি এই যে, এই সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এ জাতির একটা অভ্যস্ত সংস্কার এবং তাহা বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত; ইহাতে কোন দোষ নাই— বরং এইগুলির দ্বারাই, নব্যশিক্ষিত সমাজ ও দেশের জনসাধারণ এই উভয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে তাহা দূরীভূত হইবে। অতএব এইরূপ উদ্যমের মূলে আছে অতি উদার হৃদয়ের ধৈর্য্যশীলতা।]

উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায়।...এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।...এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে—ব্রহ্মবাদী ও পজিটিভিষ্টে একমত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দুধর্ম্মে।

বলা বাহুল্য, 'প্রচার'-লেখকেরা [নব্য হিন্দুগণ] এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি মনে করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমরা যাহাকে ইংরেজী শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি। ইংরেজী শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি ও গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতি ও গতিতে বিরোধ থাকিবে না। Order ও Progress এক হইয়া দাঁড়াইবে।

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ আলোচনার শেষ এবং বোধ হয় চূড়ান্ত কথা। বাংলার নবযুগের যে সমস্যা, সে বিষয়ে তিনজন মনীষীর চিন্তা, এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ইহাতে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতেই আমার কথাও শেষ হইয়াছে। নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তি ইংরেজী শিক্ষার ফলেই প্রবলতর হইয়া

উঠিয়াছিল ইহাই স্থিতির বিরোধী একটা নূতনতর গতি। এই গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, অপর দুইজন তাহাকে স্থিতিধ্বংসকারী বলিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণশক্তির উপরেই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে গোঁড়া হিন্দুর মত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। তাঁহার মতে, ধর্ম্ম সত্য হইলে তাহা dynamic হইবে, স্থিতি গতিরই আশ্রয়; ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? ইংরেজী শিক্ষা সেই গতির দিকটা মুক্ত করিয়া ধর্ম্মকেই ক্রিয়াশীল করিয়াছে—এই হিসাবেই তাহার যাহা-কিছু মূল্য অতএব সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন করে নাই, বরং তিনি তাহাতেই একটা বড় আশায় আশান্বিত হইয়াছিলেন—সমাজের অচলায়তন আবার সচল হইবে, এবং প্রাচীনের সেই স্থিতিই বহুকাল পরে গতিলাভ করিয়া ভারতের সেই সনাতনকেই মহিমান্বিত করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি নবযুগের জীবন-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলা সঙ্গত হয়, তবে তাহা এইজন্যই। স্থিতি নামক যে সনাতন—যুগ তাহারই গতি-মূর্ত্তি; এবং জীবনের দিক দিয়া সাক্ষাৎভাবে এই গতির মূল্যই অধিক। সৃষ্টির অন্তঃপুরে যাহাই থাকুক, বাহিরে এই গতিই সর্ব্বস্ব। Static ও Dynamic দুইয়ের তত্ত্ব একই; আজ বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই সেই সত্য ধরি-ধরি করিতেছে। বঙ্কিম বিজ্ঞান বা দর্শন কোনটারই তেমন সাধনা করেন নাই—তিনি কেবল জীবনের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দৃষ্টিতে শক্তির দিকটাই বেশি করিয়া পড়িয়াছিল, তিনি শাক্ত না হইয়া পারেন নাই; তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক সাধনারও মূল মন্ত্র ছিল—Creative Dynamism। তথাপি স্থিতিই যে গতির আশ্রয়, তাঁহার ভারতীয় মনীষা সেই পরম তত্ত্বটিকে কখনও বিস্মৃত হইতে দেয় নাই।

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া কতকটা বিশ্রামলাভ করিলেও, তাহার পথ তখনও শেষ হয় নাই। ভাব ও চিন্তার প্রধান ধারাগুলিকে একমুখী করিয়া একটা প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশ করিলেও, বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে নিজেই সেই যুগ-প্রবৃত্তির বেগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহারে যে আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার এক স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহারই সূত্র ধরিয়া আমাকে আরও কিছুদূর যাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কটন সাহেব উভয়ের যে উক্তি দুইটি পর পর উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমিও এখানে তাহা করিব; যথা—

"নব্যবঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধ্যপথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতির মধ্যে লইয়া যাইবে।" (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

"Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder." (Sir H. Cotton).

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন—"এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি ?" তিনি নিজে একটা উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু নব্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম কেহই তাহাতে নিরস্ত হন নাই ;—একজন অধিকতর সাহস সহকারে, সেই প্রাচীন হিন্দুত্বকেই সর্ব্ব বাধা ও বন্ধন-মুক্তির উপায় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই Dynamism-কে, সেই গতির শক্তিবাদকে, চরমে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ; অপর পক্ষের প্রতিনিধি-স্থানীয় যিনি, তিনি স্থিতি-তত্ত্বকেই কাব্যসৃষ্টির creative ভাব-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া, গতিকে মুক্ত-পুরুষের একটা লীলারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, একজন বিবেকানন্দ, অপর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দেই সে যুগের ভাবধারার শেষ ও স্বাভাবিক পরিণতি ; রবীন্দ্রনাথের ধারা স্বতন্ত্র—একরূপ বিপরীতমুখীও বলা যাইতে পারে। তিনি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, এক যুগকে গ্রাস করিয়া যুগান্তর কামনা করিয়াছিলেন ; সেই যুগান্তর এখনও চলিতেছে, তাহার গতি-পরিণতি নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তাঁহার কবিপ্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ আরম্ভ হয়, এবং তাহাতেই যুগ ও জাতির প্রবৃত্তি হইতে তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পৃথক ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে,—সে আলোচনা পরে করিব ; তৎপূর্ব্বে সেই নবযুগের যুগ-প্রবৃত্তির অনুসরণে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ ; যুগবন্যার শেষে বাঙালী-জীবন ও বাঙালী সমাজ—প্রতিক্রিয়া ; বিবেকানন্দ-চরিত্রে যুগধর্ম্মের অভিনব প্রকাশ।

"Each nation like each individual, has one theme in this life, which is its centre, the principal note round which every other note comes to form the harmony ....If any one nation attempts to throw off national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies......Every man has to make his own choice ; so has every nation. We made our choice ages ago......and it is the faith in an Immortal Soul......I challenge anyone to give it up......How can you change your nature ?

"Never forget the glory of human nature ! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which "*I am.*"—*Vivekananda.*

উপরে যে কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—বাংলার নবযুগের, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অবসানকালে, একজন বাঙালীর মুখেই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বাণীর পশ্চাতে যে জ্ঞান-শক্তি ও পৌরুষের ঐকান্তিক প্রেরণা ছিল—যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অনুশীলন'-ধর্ম্মে মানবত্বের এই উপাদানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিলেও, তাহার এমন একাধিপত্য মনুষ্য সাধারণের জীবনে সম্ভব বা সুফলপ্রসূ বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু রহস্য এমনই যে, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আকাশ হইতে দৃপ্ত দৈববাণীর মতই ওই বজ্ররব ধ্বনিত হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনই ভাগীরথীর তীর হইতে বহুদূরে, সাগরপারে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র সেই প্রাচীন ভঙ্গী ও ভাষায়, এক বাঙালীর কণ্ঠে যে বাণী প্রথম পুনরুদ্‌গীত হইল, সে বাণী—আত্মার সর্ব্ববন্ধন মুক্তির স্বাধিকার-ঘোষণার বাণী, তাহাতে প্রকৃতির সহিত বোঝাপড়া করার কোন চিন্তাই নাই। এ যেন সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া সহসা এক পর্ব্বতচূড়ার অভ্যুদয় হইল ; যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল তাহারই এক শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল। বাংলার নবযুগের এই শেষ ও অভিনব বাণীর পরিচয় দিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা তো শুধুই বাণী নয়,—প্রতিভার দিব্যশক্তিও নয় ; একদা এক দিব্য আবেশে কবি যাহা কামনা করিয়াছিলেন—

শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি'
দাও হৃদয়ের মুখে।

—ইহাও মহাপ্রাণ-নিঃশ্বসিত হৃদয়-শঙ্খের সেই ফুৎকার। সে প্রাণ, সে পৌরুষ একটা

আবির্ভাবের মত; সেই মহাজীবন হইতে পৃথক করিয়া বাণীর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। ঐ মূর্ত্তির দিকে চাহিলে যুগের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, সনাতনের সংজ্ঞাও লোপ পায়। আজ যে প্রয়োজনে আমি এই-পুরুষের প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছি তাহার পক্ষে অতি ধীরভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু ভয় হয়, এবার হয়তো আমাকে হার মানিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত সাধনায় যাঁহাদের প্রভাব সব চেয়ে বেশী তাঁহাদের কথা বলিতে আমার কণ্ঠ কাঁপে নাই—আমার সাহিত্যগুরু সেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি সর্ব্বদাই অতি সচেতন। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই এই পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি তখনই সকল অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল একটি বিরাট পুরুষ-সত্তার মহিমা আমাকে আবৃত করিয়াছে—সাগর-সঙ্গমে নদীস্রোতের মত আমার প্রাণস্রোত ক্ষণেকের জন্য তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। পরক্ষণে ইহাও মনে হইয়াছে, এবং সে বিশ্বাস আজিও তেমনই আছে, যে—পুরাকালের কথা বলিতে পারি না—ইদানীন্তন কালে বাঙালী জাতির মধ্যে এত বড় পুরুষ আর জন্মে নাই। তাই যখনই দেশী ও বিদেশী সকল সাক্ষীর মুখে এই একই কথা শুনি—

It was impossible to imagine him in the second place, Where ever he went he was the first.

কিংবা—

His pre-eminent characteristic was kingliness, and nobody ever came near him either in India or in America, without paying homage to his majesty.

—তখন আর এক অভিমানে আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাই, সে অভিমান বাঙালীত্বের অভিমান। যে বেদান্তকে ভারতীয় সাধনা আত্মার উত্তুঙ্গ শিখরে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বেদান্তের বাণীকে শুধু জ্ঞানে নয়—প্রেম ও কর্ম্মে মানুষের গভীরতম হৃদয়-সংবেদনায় এমন করিয়া প্রাণের ছন্দে স্পন্দিত করিতে একমাত্র বাঙালীই পারিয়াছে, আর কেহ পারে নাই—পারিত না। বৈষ্ণবের ভাব-কল্লোলিনী-বিধৌত পলিমাটি এবং শাক্তের হৃদয়াবেগ-বর্জ্জিত কঠিন সাধনার এই সুদৃঢ় তটভূমিতে—এই শ্যামলিমাবেষ্টিত শ্মশান-মৃত্তিকায় হিমালয়ের দেওদার কে রোপণ করিয়াছিল? জলমাটির গুণেই সেই দেওদার-শাখায় এমন সুস্বাদু পিপ্পল ফলিয়াছে! বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বাঙালী-প্রতিভার সেই দিকটির পরিচয় লওয়াও যেমন আবশ্যক, তেমনই, সেই প্রতিভা যে শুধুই বাণী-প্রতিভা নয়, তাহাও বুঝি—তাই বাণীকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমি সেই ব্যক্তিচরিত্রের বৃন্তটি ধরিয়া—বাণীর রূপ সাজাইবার চেষ্টা করিব।

*　　　　*　　　　*

উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগ-বন্যার প্রধান ধারায়, বৃহত্তর তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে, বহু জ্ঞানী ও সাধকের বিচিত্র প্রয়াস নানা রূপে প্রবাহিত হইয়াছে ; সাহিত্যে, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, এবং সর্ব্বশেষে রাষ্ট্রনীতি—এই সকল ক্ষেত্রেই অল্পাধিক উদ্যম—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত একরূপ অব্যাহতই ছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবেও এ সকলের পরিচয় ঐতিহাসিকের পক্ষে কর্ত্তব্য বটে, আমি কেবল তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রবৃত্তি এবং তৎসম্পর্কিত কার্য্যকারণ-তত্ত্বের একটা স্থূল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি এ পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত সাহিত্যিক ভাবচিন্তার ভিতর দিয়া এই যুগের প্রধান প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছি ; এবং তাহারই প্রসঙ্গে, এ জাতির জাতীয় সংস্কারে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে—যাহা তাহার প্রতিভার মূলে স্বপ্ন-চেতনার মত অস্ফুট রহিয়াও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহার কথাও বলিয়াছি। যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা দৃষ্টিতে নবযুগ-প্রবৃত্তির সহিত জাতির এই প্রাক্তন সংস্কারের দ্বন্দ্ব কি আকারে দেখা দিয়াছিল, এবং কোন্ মন্ত্রে তিনি তাহার নিরসন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে বলিয়াছি। কিন্তু এ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কার সেই সমস্যাকে যে এত সহজে বিদায় করিবে না—সমস্যার মূল যে আরও গভীর, তাহার প্রমাণ ইতি-পূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎ-কালেই আর এক ক্ষেত্রে এক আর আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। নবজাগরণের অনতিকাল মধ্যেই, প্রথমে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে, এবং শেষে আধ্যাত্মিক কল্যাণ-পিপাসার বশে, এক গুরুতর ধর্ম্মান্দোলন শুরু হইয়াছিল—সে আন্দোলন শুধুই চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, শুধুই সমাজ-চৈতন্যে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় চৈতন্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাই স্বাভাবিক। অতি দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে এ জাতি এক নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল—সে জগৎ তাহার সেই প্রাক্তন পল্লীসমাজের জগৎ নয় ; আকাশ যেন অনেক দূরে উঠিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই দিক্‌দিগন্ত হইতে মানবেতিহাসেব বিপুল ও বহুবিচিত্র ধারার কলরোল তাহার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে—শুধুই কর্ণে কলগর্জ্জন নয়, সেই স্রোত তাহার বক্ষতটে প্রহত হইতেছে। সেই আঘাত সর্ব্বশেষে তাহাব প্রাণ-ধাতুকে স্পর্শ করিল, এবং প্রতিঘাতে তাহার স্বকীয় সংস্কার যেন ভিতরে ভিতরে প্রবল-ভাবে নাড়া পাইল। নবযুগের সংক্রমণ ও তাহার প্রভাব রামমোহনের চিন্তায় সর্ব্বপ্রথম ধরা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী হইলেও উপরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল ; নূতন আবহাওয়ার উপযোগী একটা স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে ভিত্তি যতটুকু দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তাহার অতিরিক্ত ভাবনা করে নাই—ভূমিকম্প প্রভৃতির চিন্তাকে তিনি কখনও আমল দেন নাই। ধর্ম্মের ব্যাপারেও, কেবল সর্ব্বপ্রকার

কুসংস্কারের গ্রন্থি একটিমাত্র আঘাতে ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি খ্রীষ্টান বা সেমিটিক ঈশবাদকেই বেদান্তসূত্র দ্বারা শোধন করিয়া একটি অতি সহজ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্ম যতই যুক্তিসিদ্ধ ও সুকল্পিত হউক, তাহা মূলে অ-ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত—তাহাতে এমন সঞ্জীবনী অধ্যাত্ম-প্রেরণা ছিল না, যাহার বলে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত নিজের আত্মার উপরে আস্থা না হারাইয়া একটা মহাসঙ্কটে উদ্ধার পাইতে পারে। যে য়ুরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ও যে ধর্ম্মনীতি একদা রামমোহনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, তাঁহার যুক্তিবাদের সহায় হইয়াছিল, সে আদর্শ ও সে নীতির পরিণাম শতাব্দী-শেষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বরং রামমোহনের প্রতিভার অসাধারণত্ব ইহাই যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় সাধনার গঙ্গোত্তরী-ধারাকে ভিন্ন-পথগা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সাময়িক পঙ্কোদ্ধারের কাজ হইয়াছিল। সেই বুদ্ধির জাগরণই সে যুগের প্রথম লক্ষণ,—চৈতন্যস্ফুরণের আদি অবস্থা যে তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থায় হৃদয় বা প্রাণের জাগরণ—বিদ্যাসাগরে ও মধুসূদনে, দুই দিক দিয়া তাহাই ঘটিয়াছিল। তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি ও হৃদয় দুয়েরই সমান জাগরণ—সুস্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাহার বিগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র। ইহারও পরে, শতাব্দীর শেষভাগে, জাতীয় জাগরণের প্রায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থায়, সেই সকলের সহিত আর এক যে-বস্তুর উন্মেষ হইল, অন্য নামের অভাবে তাহার নাম দিব 'আত্মা'। মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও প্রাণ—সকলই ইহার সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত; এই আত্মার দৃষ্টিতে যুগসমস্যা এমন একটি আকার ধারণ করিল যে, তাহা যুগ-জাতি-দেশ অবলম্বনে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা—ইহাতেই যুগপ্রবৃত্তির আরম্ভ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও হইতে থাকে। প্রতিক্রিয়ার কারণ—বহুকাল-অর্জ্জিত সংস্কার; এই সংস্কারই অন্ধসংস্কাররূপে জীবনকে গতিহীন করিয়াছিল। নবযুগ ও তাহার অনুষঙ্গী সেই পাশ্চাত্য প্রভাব, এই সুপ্ত সংস্কারের এতই বিরোধী যে, দেশের রক্ষণশীল সমাজ একটা অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয়ের বশীভূত হইয়া সেই প্রভাবের গতিরোধ করিতে চাহিল; কোথায় যে বিরোধ—ভিতরের কোন্ মূল গ্রন্থিতে টান পড়িতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বিচার-বুদ্ধিকে দমন, এবং অবোধ চিত্তবৃত্তিকে প্রাণপণে আশ্রয় করিয়া, নির্জ্জীব শাস্ত্র-বচনের মহিমা-ঘোষণায় অধীর হইয়া উঠিল। অপর দিকেও উৎকণ্ঠা কম ছিল না; প্রাণের প্রবল মুক্তি-কামনা—জীবনকে বিধিমতে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন জাগিয়াছে, তেমনই ব্যক্তির আত্ম-চেতনা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে আধ্যাত্মিক সত্য-মীমাংসাও নবযুগের আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল; শেষের দিকে ইহাও একটা পৃথক খাতে বহিতে সুরু করিয়াছিল। রামমোহন-পন্থীরা এই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বুদ্ধির শাসনে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে

সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পুরুষেরও অবশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণ। আবার নিছক যুক্তি-বিচার যে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নয়, সেই গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির উপরে এক প্রকার রস-চেতনাকে প্রাধান্য দিতেই হয়, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ও শক্তিমান নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা যুগ-সমস্যার কোনরূপ সমাধান হয় নাই; কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে এ জাতির চেতনার উপরি-স্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হউক, তলদেশে একটা গভীরতর আকূতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; যুগ ও সনাতন, সর্ব্বমানবীয় চেতনা ও জাতীয় সংস্কার, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধি পাইতেছিল; ফলে, একটা ঘোরতর আধ্যাত্মিক সংশয়-সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অতিশয় মেধাবী অথচ তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল—তাই জীবনের আদি-অন্ত সম্বন্ধে যাহারা কোন কাটা-ছাঁটা ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—তাহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবন সম্বন্ধে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগের আদি-প্রবৃত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইয়া বাঙালীর জীবনযাত্রায় তথা চরিত্রে যে পরিণতির আভাস দেখা দিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই লক্ষ্য করিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহারই নিবারণকল্পে তিনি তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া জাতির জীবন-রক্ষার একটা পন্থা নির্ণয় করিয়াছিলেন। নব্যশিক্ষিত সমাজের দাসত্ব-প্রীতিও তিনি যেমন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার চরিত্রে দারুণ স্বার্থসুখলোলুপতা ও তাহার কারণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহার এই মনুষ্যত্ব-লোপ এবং অচিরকালের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অধঃ-পতনের সম্ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। তথাপি তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর উপরেই; তাই উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তারাজি অকাতরে ছড়াইয়া তিনি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই চিন্তারাজির মধ্যে দুইটি ছিল প্রধান—সার্ব্বজনীন মনুষ্যপ্রীতি ও বিশেষভাবে দেশপ্রীতি, এবং সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য আত্মানুশীলন,—দেহ, মন ও প্রাণের উৎকর্ষসাধন। ইহা যে আপামর সাধারণের জন্য নয়, তাহা তিনি জানিতেন, সে আদর্শ ও তাহার সাধনা কেবল শিক্ষিত-সমাজেরই আয়ত্ত। বৃহত্তর সমাজের দারুণ দুর্গতি ও অবনতির অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সে সমস্যাও তাঁহার চিন্তায় অল্প স্থান অধিকার করে নাই; কিন্তু সে সকলের দায়িত্ব তিনি আধুনিক কালের 'ব্রাহ্মণের' উপরেই দিয়াছিলেন; এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আদর্শবাদী তেমনই aristocrat। তথাপি নবমানবধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্কিম, দেশপ্রেম-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম, এই aristocrat বঙ্কিম একদা যেমন 'সাম্য' নামক প্রবন্ধমালা রচনা করিয়া—

ছিলেন, তেমনই তাঁহার সেই আদর্শবাদী ভাব-চিন্তার মধ্যেই এমন বীজ নিহিত ছিল, যাহা অতঃপর সেই আদর্শের উচ্চভূমি বিদীর্ণ করিয়া বাস্তবকেই আরও বিরাট আকারে সঙ্কট-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ; একের সহিত অপরের যুগগত পরম্পরতার যোগই শুধু নয়, ভাবগত যোগও নিশ্চয় ছিল—সে যোগ সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ যোগ না হইতে পারে, কিন্তু এতবড় বাণীবরপুত্রের সেই বহুপ্রচারিত বাণী বিবেকানন্দের মত পিপাসু যুবকের পানীয় হয় নাই, ইহা সম্ভব নয়; রামমোহন, কেশব-চন্দ্রকে যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তেমনই তিনি তাঁহার দিক দিয়া হজম করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমের চিন্তাধারার প্রায় বিপরীত মুখে হইলেও, বঙ্কিম যেখানে শেষ করিয়াছিলেন ঠিক সেইখান হইতেই তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও মনে হয়, বিবেকানন্দের গন্তব্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, বরং অতিশয় হৃষ্টচিত্তেই তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন; কিন্তু পঙ্গুর পক্ষে সেরূপ গিরিলঙ্ঘন তিনি আদৌ সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন না, এমন অসীম সাহসের যোদ্ধ-মনোভাব তাঁহার ছিল না। বঙ্কিম ছিলেন ভাবুক ও চিন্তাশীল, প্রাকৃতিক নিয়তি-নিয়মের অনুবর্ত্তী, ক্রমবিকাশবাদী। বিবেকানন্দ আত্মার-স্ব-শক্তিতে আস্থাবান, তিনি প্রকৃতির ধমক মানিতেন না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যতই বিপরীত হউক, মূল সমস্যা উভয়ের নিকটেই এক; আবার তত্ত্বের দিক দিয়া যেমনই হউক, ভাব-প্রেরণায় উভয়ের সগোত্রতা এত অধিক যে, এককালে বাঙালী যে উভয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মনুষ্যত্বের উদ্ধার-সাধন যেমন উভয়েরই ছিল একমাত্র ব্রত, তেমনই প্রেম ও পৌরুষ, এই দুই ছিল উভয়ের সাধন-মন্ত্র; এবং উভয়েরই মতে, সেই প্রেম ও পৌরুষের মুখ্য সাধন-ক্ষেত্র ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি-সমাজ। কিন্তু বিবেকানন্দেই সে যুগের জাগরণ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাগরণের এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করা যায়:—প্রথম, মনুষ্য-জীবনের গৌরব-বোধ; দ্বিতীয়, জীবন-জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান, ও জীবনের মাহাত্ম্য-ঘোষণা; তৃতীয়, জীবনের মহিমাই মানুষের মহিমা নয়; জীবন-সাধনার কোন স্বতন্ত্র আদর্শ নাই; মানুষই মানুষের আদর্শ, মানবাত্মার মহিমাই সকল মহিমার মূল; জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে বন্ধনমুক্ত আত্মার সেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স। এবার এই বাণীর কিছু পরিচয় দিব, কিন্তু বাণী ও ব্যক্তির পরিচয় একই—বরং ব্যক্তি আগে, বাণী পরে।

তখন উনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ পাদে আসিয়া পৌছিয়াছে; ইংরেজশাসন ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী তখন বড় মোহকর স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন সফল হইতেও যেন আর বিলম্ব নাই; বাঙালী তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেও আরম্ভ করিয়াছে!

এদিকে সরকারী চাকুরীর মাহাত্ম্য সমাজে এক নূতনতর কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। কলিকাতা শহর এক নূতন নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙালী যেখানে যেটুকু সংস্কৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল এই নগরী তাহারও সবটুকু আকর্ষণ করিতেছে; বাঙালীর চিত্তভূমির—তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের—সবটুকু শক্তি তাহার একাধিকারে বর্ত্তিয়াছে। শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্মসম্পর্কিত, এমন কি, নূতন সাহিত্যের জন্মঘটিত যত কিছু আন্দোলন, এই শহরেই সব হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনের হিসাবনিকাশ প্রায় শেষ করিয়া বাঙালী তখন নূতনের সঙ্গেও একটা আপোষ করিয়া লইয়াছে, সম্মুখে যেন বাঁধা পথ; সে পথ যেমন উন্মুক্ত, তেমনই নিঃসঙ্কট। দাসত্বের অন্ন সুলভও বটে, রুচিকরও বটে; নিজের উপরে অথবা ভগবানের উপরে যে বিশ্বাস তাহা ইংরেজের উপরে স্থাপন করিয়া বাঙালী একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু আসলে এই স্বপ্ন-বিলাস ও সুখের আশ্বাস—নিরুপায়ের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র; তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখা দিয়াছে—পশ্চিম এ জাতির মস্তিষ্কে হানা দিয়াছে—তাহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে। একদিন যাহার নূতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল—সেই নূতনকে লইয়া লোফালুফি করিয়া, তাহাকে বাজাইয়া এবং চতুর্দ্দিকে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নূতনের উন্মাদনা-শেষে তাহার দেহে-মনে একটা বেদনা জাগিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বেদনা সজ্ঞানে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই যুগের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভরসাকে তিনিই একটি প্রকৃষ্ট বাণীরূপ দিয়াছিলেন বটে—যুগনায়করূপে জাতীয়-জাগরণের প্রধান পুরোহিতরূপে তিনিই দাঁড়াইযাছিলেন—তথাপি, এই বেদনা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়াছিল, জাতির সেই হীন আত্ম-সন্তোষ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দর্শনে তাঁহার লজ্জা ও ক্ষোভের অবধি ছিল না। ইংরেজীশিক্ষার পদ্ধতি-দোষে তাহার সুফল অপেক্ষা কুফল বৃদ্ধি পাইল, সে শিক্ষার একমাত্র তপঃফল হইল চাকুরি-লাভ—সরস্বতীর কমলবনে কমলবিলাসী বাঙালী চাকুরি-মধু-পানে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙালীর নিজস্ব সমাজ-জীবনও নষ্ট হইতে চলিল; পল্লীর প্রতিবেশে, মাঠে, বাটে, প্রান্তরে সেই সরল উন্মুক্ত জীবন যাপন করিয়া সে যেটুকু প্রাণশক্তি বজায় রাখিয়াছিল তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল; কলিকাতা শহরের বদ্ধ বায়ুতে নূতন নাগরিক সুখোপকরণ তাহার সেই স্বাস্থ্য নাশ করিয়া অহিফেনসুলভ জড়তা বৃদ্ধি করিল—প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু নেশার ঘোরে, নূতনত্বের মোহে, সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া আসিল; পল্লীসমাজের বন্ধন যেমন দুঃসহ, পল্লীবাসও তেমনই অসুখকর হইয়া উঠিল। বাস্তব জীবনে দাসত্বপ্রীতি যতই বাড়িতে লাগিল—মনে ততই স্বাতন্ত্র্য-অভিমান

জাগিয়া উঠিল; ইংরেজের চাকুরি ও ইংরেজের আইন সেই স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিল; ইংরেজী বিদ্যার অভিমানও মনের সঙ্কোচ ঘুচাইল। এক দিকে চাকুরি-গৌরব, আর এক দিকে Mill, Bentham, Spencer; এক দিকে দাশুরায়ের পাঁচালী, আর এক দিকে Shakespeare, Milton, Byron; এক দিকে মাহেশের রথ, বাগান-বাড়ির আমোদ, অপর দিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনা;—সে যেন এক অপূর্ব্ব প্রহসন! এই দুইয়েরই রস যে সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, সে 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' লিখিয়া প্রবল হাস্যবেগ প্রশমিত করে। এই জীবনই সেকালের চতুর্ব্বর্গকামী বাঙালী-সন্তানের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও একেবারে মরে নাই—এই সমাজই ক্ষতবিক্ষত হইয়াও জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এ পর্য্যন্ত সমাজের স্থিতি রক্ষা করিয়াছে; আবার এই সমাজই সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহের বীজ ধারণ ও পালন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, ইংরেজীশিক্ষার সুফলস্বরূপ, যতকিছু আন্দোলন ঘটিযাছে তাহার প্রায় সকলগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে—এই শ্রেণীর মানুষ; শুধুই বিদ্রোহের মন্ত্র-রচনা নয়, তাহার আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে ইহারাই। উৎকৃষ্ট প্রতিভারও জন্ম হইয়াছে ইহাদের মধ্যে, কেবল দুইজন এই শ্রেণীভুক্ত নহেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। ইহাব কারণ আছে; বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যে একটি মহৎ গুণ—তাহা এই শ্রেণীর জীবনেই সম্ভব। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে জীবিকা-অর্জ্জনের ভার প্রায় একজনের উপবেই থাকিত, অথবা পৈতৃক জমিজমার দ্বারাই তাহা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে এক দিকে যেমন আলস্য প্রশ্রয় পাইত, তেমনই স্বল্পসুখসন্তুষ্ট, দায়িত্ববন্ধনমুক্ত, ভাবুক ও চিন্তাপ্রবণ বাঙালীর ভাবচর্চ্চার বড় অবকাশ হইত। যে বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত নয়, অথচ জাতি-স্বভাবসুলভ চিন্তা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী—কোন একটি ভাব-সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পক্ষে সর্ব্বস্বত্যাগ আদৌ দুষ্কর নয়, ইহার প্রমাণ বাংলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও শেষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যাইবে। সেকালের কলিকাতার সেই সমাজে, সেই নব্য জীবনযাত্রার অবসাদকর আবহাওয়ায়, রুদ্ধ আলোক ও বদ্ধ বায়ুর সেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার মধ্যে, স্বধর্ম্ম ও পরমধর্ম্মের সংঘর্ষে জাতির সেই মানস-বৈকল্যের অবস্থায়, আত্মক্ষয়কারী দারুণ দাসত্ব-ব্যাধি যখন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তখন কলিকাতারই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সেই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নাচিকেত-অগ্নির একটি শিখা সকলের অগোচরে জ্বলিতে আরম্ভ করিল; এবারে শুধু জীবনের আরাধনাই নয়, মৃত্যুর বজ্রমুষ্টি হইতে অমৃত-ভাণ্ড উদ্ধার করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিল।

অতি অল্প বয়সেই এই তেজ—সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা—বিবেকানন্দের জীবনে দেখা দিয়াছিল, ইহাকেই আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় 'শৈব তেজ'

বলে। অপরের উপদেশ নয়, পরের সাক্ষ্য নয়, কোন তর্ক-যুক্তির পুঁথিগত সিদ্ধান্ত নয়—পরোক্ষ আপ্তবাক্যে আশ্বাস নয়, নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি ও অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে, জীবনের তথা মানবীয় সত্তার অর্থ সন্ধান করিতে হইবে, যদি কোন সত্য থাকে তাহা সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ইহাই ছিল সেই বালকের প্রাক্তন সংস্কার, সে সংস্কার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেকালের স্কুলে ও কলেজে অধ্যেতব্য যাহা কিছু ছিল তাহা যেন গণ্ডুষে পান করিয়া, জ্ঞানপন্থী অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গ করিয়া, তাহাদের তত্ত্ববিচার শুনিয়া কিছুতেই পিপাসা মেটে না ; বরং সংশয় বাড়িয়া যায়, আত্মা আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থাতেই যুক্তিপন্থী নব্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন—সেও যেন অন্ধভক্তি ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। দেশে তখন পাশ্চাত্য বিদ্যার মোহ কিছু কমিয়াছে, বন্যার সেই জলরাশির নিম্নে পঙ্ক দেখা দিয়াছে ; মানবত্বের মহিমা-বোধ যতই টিকিয়া থাকুক, সেই ভাবের আবেগ বাধা পাইতে আরম্ভ করিযাছে ; কারণ ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য জাতির সেই মানবতন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন পীঠে আর এক মন্ত্র মানবতাকে পরিহাস করিযা জয়ী হইতে চলিয়াছে। মানবধর্ম্মকে প্রকৃতিধর্ম্মের সহিত বাঁধিয়া লওয়ার ফলে, যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিধর্ম্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছিল তাহাতে মানুষের আত্মা ক্রমেই জড়শক্তির বশীভূত হইতেছিল—প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের আত্মিক সম্পদ মানুষ তখন হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তখনও সে ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই—আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমা নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুকূল যে যুক্তিবাদ তাহাই পরম উপাদেয় হইয়াছে ; তাহার কারণ, জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই নূতন নাগরিক জীবনে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির যে আত্ম-প্রসাদ—পুঁথিগত যুক্তিব বলে কুসংস্কার-মুক্তির যে দুঃসাহস—তাহাই পরম জ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে শাস্ত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, এবং অপর দিকে মানস-মুক্তির এই যুদ্ধঘোষণা—এই দুইয়ের মধ্যে যুবক বিবেকানন্দ যে শেষেরটির দিকেই আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্যের উচ্ছেদ—মনের মুক্তিই তো আত্মার উদ্ধারসাধনের প্রাথমিক উপায়, মনুষ্যত্বের যাহা সার সেই পৌরুষের ("পৌরুষং নৃষু") ইহাই তো প্রথম পরীক্ষাস্থল। কোন জ্ঞান, কোন তত্ত্ব কোন গুরুবাক্যে প্রয়োজন নাই—আগে চাই নিজ আত্মার স্বাধীনতাবোধ, তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ।

বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ তখন হইতেই, অথবা আরও পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ✓সে চরিত্র যেন একটি শাণিত ইস্পাতফলক, তাহার ধার—ওই প্রখর মুক্তি-পিপাসা, সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই দুর্দ্ধর্ষ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং আজন্ম-শাণিত সেই জ্ঞান-পিপাসার তীক্ষ্ণ তরবারিও শেষে বড় কাজে

লাগিয়াছিল, তাহার অন্তরস্থ সেই অতি-কঠিন ইস্পাতের দ্বারাই যে নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল তাহাতে মাটির উপরকার বনগুল্মলতাই নয়, তলদেশের শিকড়গুলা পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিবার উপায় হইল; বঙ্কিমচন্দ্র মাটির উপরকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা তখনই আবশ্যক বোধ করেন নাই; তিনি ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, সমন্বয়পন্থী শক্তি সাধক, এমন উগ্র অদ্বৈতবাদকে তিনি ভয় করিতেন।

বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন-কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার প্রথম যৌবনের সেই অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার কথা বলিয়াছি; এ চরিত্রের মূলগ্রন্থি তাহাই বটে, কিন্তু তাহাই সব নয়। সে চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ, যাহা মহামনীষিগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে, সেই দিকটির কথা এইবার বলিব। ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার নিজের সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ হয়, এবং তাহাতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দ কি কারণে আজীবন বুদ্ধকে এত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেও যেমন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়াছিলেন, তেমনই জীবনের সর্ব্বশেষ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন সারনাথে। তিনি এমন কথাও বলিতেন যে, অতি অল্প বয়সে ভাবাবেশে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নয়, বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক। যে-পুরুষ কোন বন্ধন মানিবে না, দেহের বন্ধনও যাহার কাছে দুর্ব্বিষহ, কৈবল্য-মুক্তির পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার রুচি ছিল না সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশকে ও দেশের মানুষকে যেরূপ ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন ভালবাসা বোধ হয় আর কেহই বাসে নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, সেই প্রেমের অপূর্ব্ব আবেগ তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তিপিপাসাকেও দমন করিয়া, দেশের মুক্তি-কামনা হইতেই, জগতের হিতার্থে তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। এই প্রেম একটা আধ্যাত্মিক রসাবেশ নয়, ইহাতে এক বিশাল হৃদয়ের অসীম দুঃখবোধ ছিল; এ প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। বিবেকানন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্য এতই বিশুদ্ধ ও এমনই মজ্জাগত যে তাহার সহিত এই ধরণের প্রবল হৃদয়-সংবেদনা স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। যে একদিন এক মুহূর্ত্তও আত্মার স্বরূপ-মহিমার কথা ভুলে নাই—সেই আত্মার লেশমাত্র অজ্ঞান-মোহ, বন্ধন বা দুর্ব্বলতা, যে সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়াবেগকে যে মাত্রাস্পর্শ-জনিত ভাবালুতা ("over-flow of the senses") বলিয়া ধিক্কৃত করে, তাহার সেই জ্ঞানাগ্নি-শুষ্ক আঁখিপল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত হয় কেমন করিয়া?

এ রহস্য দুরবগাহ; হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এ যুগের শেষ ও

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,—Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণই নির্দ্দেশ করি না কেন, ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিষ্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, দেহ ও আত্মা, জীবন ও মহাজীবন, দ্বৈত ও অদ্বৈত এখানে এমন একটা নির্দ্বন্দ্বতার ইঙ্গিত করিতেছে,—"বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এখানে জ্ঞান যেন প্রেমের দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া আরও স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—নিদাঘ-দিনের দাহশেষে তারকাখচিত আকাশ যেমন আর উজ্জ্বল, আরও সৌম্য-গম্ভীর হইয়া উঠে। মহাযোগী মহাদেবের কণ্ঠে সেই যে গরল-নীলিমা, তাহার জ্বালা-বোধ কি কম? সেই গভীর জ্বালাকে নিঃশেষে পান করিয়াই তিনি ব্যোমকেশ হইয়াছেন; তাই তাঁহার ললাটনেত্রের সেই জ্ঞান-বহ্নিও শশিকলার স্নিগ্ধকিরণে করুণ হইয়া উঠে। তথাপি বিবেকানন্দ মহাদেব নন—মানুষ।

উপমা-রূপকের ভাষা ছাড়িয়া—মনুষ্যচরিত্র হিসাবেই ইহার কারণ-সন্ধান ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। বালক বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞানাভিমানের উর্দ্ধফণা কোন্ মন্ত্রৌষধির বলে রুদ্ধবীর্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই প্রেমের অঙ্কুর তাঁহার নিজের চরিত্রেই আজন্ম নিহিত ছিল—কেবল বিকাশের অপেক্ষা মাত্র। আমি বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার কথা বলিয়াছি, তাহা ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বাভিমান নয়—তাহা পরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান নয়, সেই মর্য্যাদা-বোধ ব্যক্তির নয়—আত্মার। আত্মারই সেই মর্য্যাদা-বোধ তাঁহাকে এত বড় প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল কেমন করিয়া, তাহাই বলিব।

অষ্টম অধ্যায়

বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের ইতিহাস ; সেই জীবনের গূঢ় তত্ত্ব ; ভারতীয় সাধনায় কালের প্রভাব—সামঞ্জস্যের অভাব ; যুগোচিত সত্য-সন্ধানের ব্যাকুলতা।

ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান এক বস্তু নয় ; ঠিক সেই কারণে স্বাধীনতার অভিমানও দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ। একটিতে যেমন সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং তাহা নিজের ও পরের নিকটে প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া থাকে—এবং সেইজন্য একটা প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান থাকিবেই, অপরটিতে তেমনই ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতার সংস্কারমাত্র না থাকায়, এবং তাহার স্থলে আত্মার মহত্ত্ববোধ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, অধিকার অপেক্ষা একরূপ দায়িত্ব-চেতনাই আত্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে ; সেই দায়িত্বও বন্ধন নয়—কারণ, তাহাতে আত্মাতিরিক্ত আর কিছুর বশ্যতা নাই। ব্যক্তিত্বের যে অভিমান, তাহার মূলে আছে একরূপ মমতা বা আত্ম-প্রীতি ; সেই আত্ম-প্রীতি অনেক স্থলে প্রেমের ছদ্মরূপ ধারণ করে, আমরা সাধারণতঃ সেই প্রেমেরই জয়গান কবি। সেই প্রেম যে নিতান্তই মমতা-মূলক তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি বটে, তথাপি যে-প্রেম ব্যক্তিসম্পর্কবর্জ্জিত, যাহাতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতি নাই—সেই সুখের তীব্রতা ও দুঃখের হাহাকার নাই—তেমন প্রেম আমাদিগকে তৃপ্ত করে না ; মানুষ যখন এই 'আমি'র অভিমানকে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে আমরা বিরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া থাকি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মীয়-সম্পর্ক আর থাকে না। এইজন্য ব্যক্তি-'আমি'র প্রেম আমরা যেমন বুঝি, আত্মা-'আমি'র প্রেম তেমন বুঝি না ; কোনরূপ স্বার্থ যাহার নাই সে যেন মানুষই নয়। এই প্রেম যেমন ব্যক্তি-চেতনাযুক্ত, তেমনই ইহা ব্যক্তির বা বিশেষের প্রতিই জন্মিয়া থাকে, তাই নির্ব্বিশেষের প্রেম যেন সোনার পাথরবাটি। ইহা খুবই সত্য ; তাই আমি আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলিতেছিলাম, তাহা এইরূপ প্রেমের অন্তরায় বটে। কারণ, আত্মার সেই বিশালতায় আত্মপরভেদ আর থাকে না—সকলেই তাহাতে একাত্মীয়তা লাভ করে ; তখন পরের তুলনায় বা পরের সম্পর্কে যত কিছু পীড়া তাহা নিজের বলিয়াই মনে হয়। তথাপি 'দুই'-এর চেতনা তাহাতেও থাকে, না থাকিলে—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প অবস্থায়—নিজের সেই আত্মার সম্বন্ধেও কোন বোধ থাকে না ; সেই বোধ থাকে বলিয়াই আর এক প্রকার প্রেমের অনুভূতি সম্ভব হয়। আত্মার যে আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাও বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞানে অসম্ভব, কারণ, সে

অবস্থায় আত্মার আবার ভাব-অভাব কি? অস্তি ভাতি ছাড়া আর কিছুই তখন থাকে না।

অতএব বিবেকানন্দের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত যে প্রেম, তাহাই তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের একমাত্র দ্বৈত-সংস্কার, সে সংস্কারের একমাত্র কারণ তাঁহার স্বভাবের সেই অনমনীয় পৌরুষ। তথাপি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত এইরূপ প্রেমের যোগ যে অসম্ভব নয়, তাহাব প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের এক অতি অভিনব সমন্বয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া সকল তর্কবিচারকে পরাস্ত কবিয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর, তাই আমাকে অন্যরূপ ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। বিবেকানন্দের সেই প্রেম আত্মার আত্মমর্য্যাদাবোধ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে। ওই প্রেমে মমতার বন্ধন নাই, বাহিরের প্রতি কোন আসক্তি নাই; উহার মূলে আছে আত্মাবমাননার গ্লানি হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার আকাঙ্ক্ষা। নিজে মুক্ত বলিয়া পরের বন্ধনদশায় উদাসীন থাকা, নিজে দুঃখকে অবস্তু জানিয়া পরের দুঃখকে অস্বীকার করা—ইহা পরের প্রতি নির্ম্মমতা নয়, নিজেরই আত্মার অবমাননা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; অতএব জগতের চিন্তা জ্ঞানীর পক্ষে অনুচিত, যাহারা মায়ামুগ্ধ তাহারাই সেই চিন্তা করিযা থাকে—আমাদের দেশের বড় বড় ধার্ম্মিক সাধু ও সাধকগণের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এই উক্তির যুক্তি বড়ই অদ্ভুত; জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই জগতেরই একাংশে অবস্থিত এই ব্যক্তির অস্তিত্বও কি মিথ্যা নয; তাহার মুক্তিচিন্তাও কি একটা মোহ নয়? বিবেকানন্দের যে অভিমান ছিল তাহা মুক্ত আত্মার অভিমান; যে অন্তরে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আর সে-বস্তুর প্রতি লোভ থাকিবে কেন? তাই তাঁহার সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য মুক্তিসাধনার বৈরাগ্য নয়—সে বৈরাগ্য অভয় হইবার জন্য নয়; এজন্য বিবেকানন্দকে সাধারণ অর্থে সন্ন্যাসী বলাও যায় না। এ হেন পুরুষের পক্ষে, এক দিকে যেমন নিজের জন্য কোন ভয়, কোন চিন্তা নাই, তেমনই পরের দুঃখ পরের ভয় দেখিয়া অবিচলিত থাকাও সম্ভব নয়। 'আমি'র মুক্তিতেই জগতের মুক্তি—এমন কথা দেহধারী আত্মার পক্ষে মিথ্যা। দেহের সংস্কার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দ্বৈত-সংস্কার থাকিবেই; ওই দ্বৈত সংস্কারের মধ্যেই আত্মার যে অদ্বৈত-চেতনা তাহাই সর্ব্বভূতে-প্রীতির রূপ ধারণ করে। ইহাই সেই প্রেম, যাহাতে ব্যক্তির মমত্ববোধ নাই—আত্মার সর্ব্বাত্মীয়তাবোধ আছে। বিবেকানন্দ-চরিত্রের মূলতত্ত্ব—বীর্য্য বা পৌরুষ; সে পৌরুষ জ্ঞান ও প্রেমের পৌরুষ, দুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর অপূর্ব্ব সমন্বয়! আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে এ চরিত্র তাহাই। ভিতরে একেবারে মুক্ত বলিয়াই কোন বন্ধনকে ভয় পায় না; জন্ম ও মৃত্যুর পাত্রে যত

বিষ-রস আছে এক চুমুকে পান করিয়া বলে, "এই দেখ, আমার কি করিতে পারিল!" মহামায়া-রূপিণী প্রকৃতি দাসী হইয়া তাহার পদসেবা করে,—সে পুরুষ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করে! খাঁটি জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী,—বৈরাগ্যই তাহার জন্মগত সংস্কার; অথচ কি প্রাণ, কি প্রেম!)

তথাপি একটা কথা বাকি থাকিয়া যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিবেকানন্দের এই প্রেমে মানব-হৃদয়ের আবেগ ছিল, সে প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। মমত্বের বন্ধন না থাকুক, তাহাতে মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধের মনুষ্যত্ব ছিল, কেবল আত্মার পৌরুষই নয়। তাহার কারণ, মানুষের দুঃখই ছিল এই প্রেমের সাক্ষাৎ জন্মহেতু; ওই দুঃখই দেহের ভূমিতে সেই আত্মাকে টানিয়া আনিযা মানুষের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা ঘটাইয়াছিল। সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব এই দুঃখ, প্রেমের তত্ত্বও তাহাই। বিবেকানন্দের সেই আত্মিক পৌরুষ এই দুঃখবোধের সহিত যুক্ত হইয়াছিল: সেই দুঃখের—সেই দেহচেতনার সমল সলিলে, পূর্ণবিকশিত হৃদপদ্মে, তাঁহাব আত্মা যে আসন রচনা করিয়াছিল সে আসনের তলদেশে পঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহা পদ্মের বৃন্তমূলকেই দৃঢ় কবিয়াছিল, পদ্মকে স্পর্শ করে নাই। মাটির সহিত আত্মার সংস্পর্শে ইহার অধিক আবশ্যক হয় না; দেহ-আত্মার ওইটুকু মিলন হইতেই মনুষ্যত্বের মৃণালে সেই প্রাণ-পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যাহাকে আমি বিবেকানন্দের মত পুরুষের প্রেম বলিয়াছি। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতম বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে ধরা দিয়াছিল ইহাও সেই প্রেম; বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই একটা সাধন-পদ্ধতি প্রণযন করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের সন্ধান দেন নাই; তিনি যজ্ঞের সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্ন্যাধান করেন নাই। বিবেকানন্দ এই আগুনের সন্ধান পাইযাছিলেন—অল্প বয়সেই সংসারের প্রবেশ-দ্বারে জীবনের সেই হুতবহকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়াছিলেন। সকল মানুষই দুঃখ পায; কেহ নিরুপাযভাবে সহ্য করে, কেহ ভুলিয়া থাকে বা দমন করে; অনেকে সুখসাধনায় জয়ী হইয়া তাহাকে ঠেকাইযা রাখে; কিন্তু দুঃখের স্বরূপ কয়জনের চক্ষে ধরা পড়ে? স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে কে? যাহারা 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' মনে করিযা সংসার ত্যাগ করে তাহারা দুঃখের সে-রূপ দেখিযা ভয় পাইয়াছে, তাহাদের আত্মা সংকুচিত হইয়াছে—তাহাদের মনুষ্যত্বের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখই তাহাদের চক্ষে মৃত্যুর রূপ ধারণ করে—যজ্ঞের হুতবহ হইতে পারে না। দুঃখের সহিত প্রথম পরিচয়ে বিবেকানন্দও তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ের হবি হোমযোগ্য হইয়া উঠে নাই, তখনও তাহা ঢালিয়া দিবার মত তরলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, তখনও জগতের বিশাল যজ্ঞভূমিতে, তাহার হোমানলশিখার প্রচণ্ড উত্তাপ সে হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তথাপি

নিজেরই গৃহদ্বারে তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়া তিনি বিমূঢ় হন নাই ; তাহার সেই মূর্ত্তি তাঁহার পৌরুষকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল—সেই ব্যঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন ; এবং শেষে মৃত্যুরূপী দুঃখের মুখ হইতেই, বালক নচিকেতার মত, তিনি জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পূর্ণাহুতির মন্ত্র—সেই প্রশ্নের উত্তর—কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য এই দুঃখ ! কারণ ইহাই যেমন চরম তথ্য, তেমন ইহাই আবার পরম সত্যেরও প্রবেশ-দ্বার। এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়—ইহারই অগ্নিতাপের পুটপাকে, ভাগ্যবান ও শক্তিমান মানুষের বজ্র-হৃদয় বিগলিত হয়, সেই বিগলিত হৃদয়ের নামই প্রেম ; তাহাই আত্মার ধর্ম্ম—দেহযুক্ত আত্মার। বড় বড় তত্ত্ব বা অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম ভাবরাজি যোগীর যোগসাধনার সহায় হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে জগতের সহিত, বাস্তব মানস-জীবনের সহিত, কোন সম্পর্ক নাই। সে সাধনাও 'ব্যক্তি'র সাধনা, 'আত্মা'র সাধনা নয় ; কারণ, আত্মা প্রসারধর্ম্মী—সংকোচধর্ম্মী নয়। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার হয় ওই দুঃখের ভিতর দিয়া ; যে যত শক্তিমান, অর্থাৎ যাহার হৃদয় যত বলিষ্ঠ, তাহার দুঃখবোধের শক্তিও তত অপরিমেয়—অভিভূত না হইয়া সে আগুনের মধ্যেই তাহার চক্ষু স্থিরবিস্ফারিত থাকে, তাই চরম মুহূর্ত্তে দিব্য-দর্শন ঘটে। এই দুঃখ সাক্ষাৎ দেহচেতনাঘটিত—মস্তিষ্কজাত ভাবকল্পনার দুঃখ নয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সাক্ষাৎ-অনুভূতি না হইলে আত্মায় তাহা পৌঁছে না। এ বিষয়ে একটি পুরাতন কবি-বাক্য মনে পড়িতেছে, যথা—

> Who ne'er in weeping ate his bread,
> Who ne'er throughout the night's and hours
> Hath sat in tears upon his bed,
> He knows you not, Ye Heavenly Powers !

বিবেকানন্দের জীবনে অতিশয় সুলগ্নে এই দুঃখের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। পিতৃ-বিয়োগের ফলে, সেই অল্প বয়সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছিল ; অতিশয় সচ্ছল অবস্থার পর হঠাৎ তাঁহারই মুখাপেক্ষী সেই অনাথ পরিবারে অনশন-সঙ্কট বিবেকানন্দের মত যুবকের পক্ষে কি তীব্র বেদনাময় হইয়াছিল, সেকালে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনেরাও তাহা জানিতে পারেন নাই ; অনেক পরে প্রসঙ্গবিশেষে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহার একটু ধারণা করা যায়। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কট বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—

> One evening when he had eaten nothing, he sank down exhausted and wet through, by the side of the road in front of a house. The delirium of fever raged in his prostrate body. Suddenly it seemed as if the folds enveloping his soul were rent asunder, and there was light. All his past

doubts were automatically solved. He could say truly: "I see, I know, I believe, I am undeceived......" In the morning his mind was made up. He had decided to renounce the world,

[একদিন সন্ধ্যাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও সারাদিন অনাহারের পর, তিনি পথিপার্শ্বে, একটি বাড়ীর সম্মুখে, নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ যেন একরূপ জ্বরের প্রদাহে সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ চেতনা হইল—মনে হইল, যেন তাঁহার আত্মার শতপাক-বেষ্টনী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে আলোক প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এতদিনের দ্বিধা-সংশয় আপনাআপনি মিটিয়া গেল, তখন তাঁহার আর বলিতে বাধিল না—"আমি দেখিয়াছি, আমি জানিয়াছি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমার নেত্র হইতে মোহজাল অপসারিত হইয়াছে!" পরদিন প্রভাতে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন।...স্থির করিলেন যে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।]

উপরের ঐ আলোক-দর্শন সম্বন্ধে মঃ রোঁলা একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই—

Revelation came always by the same mechanical process at the exact moment when the limit of vitality had been reached, and the last reserves of the will to struggle exhausted.

ওই 'mechanical process' কথাটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ওই নিয়ম কি সাধারণ মানুষের দেহতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য? ওই 'vitality' এবং ওই 'will to struggle' যদি দেহ ও মনের ধর্ম্ম হয়, তথাপি সে শক্তি চরম না হইলে তেমন চরম অবসন্নতাও ঘটে না—যাহার ফলে মানুষমাত্রের অন্তশ্চক্ষুতে ঐরূপ আলোক-দর্শন হয়। ঐ অবস্থায় ঐরূপ আলোক-দর্শন বুদ্ধের হইয়াছিল,—কতখানি 'vitality' এবং কত বড় 'will to struggle' থাকিলে তবে দেহের অন্তিম অবস্থায় দেহাতীত প্রজ্ঞার এমন অপূর্ব্ব উন্মেষ হয়! ঠিক বুদ্ধের মত, বিবেকানন্দের সত্যদর্শন বা আত্মদর্শন এত শীঘ্র না ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃখের সহিত সংগ্রামে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ শক্তিমান মানুষের পক্ষেও সুলভ নয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

উপরের ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও দুঃখের সহিত যুদ্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারেন নাই—কারণ কেবল অন্তরের বৈরাগ্য বা ত্যাগ নয়, তিনি সংসারও ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনও আত্মার আত্মাভিমানই বড়—প্রেম জাগে নাই। তথাপি সে সময়ের সেই সংকল্পের মধ্যে হৃদয়াবেগের লক্ষণই প্রবল; সেই বৈরাগ্যও অভিমানপ্রসূত, তাহাতে স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে। এই সময়ে ও তাহার পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার সেই বিদ্রোহী-ভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা, তাঁহার জীবনের এই ঘটনায় জ্ঞান ও প্রেমের একটা অতি কঠিন দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের অপর দিকটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্যক্তি-আত্মার উচ্ছেদ একমাত্র উপায় হইলেও, তাহাতে প্রয়োজন কি? বরং ইহারই সংঘাতে আত্মা আত্মস্থ

হয়, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি হয়—যদি আত্মার সেই শক্তি থাকে। তখন দুঃখের সেই অতল অকূল অশ্রুহ্রদে, ব্যক্তিত্বের বৃন্তটি মাত্র ধরিয়া আত্মার সহস্রদল সেই বারিরাশির উপরে খুলিয়া ঢলিয়া পড়ে, এবং প্রেমামৃতের মধু-সৌরভে মনুষ্য-জীবনের দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠে। বিবেকানন্দের জীবনের সেই মহালগ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-শীতল করস্পর্শ তাঁহার মস্তিষ্কের বহ্নিতাপ প্রশমিত করিল, অপার করুণার গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-নদী কূল হারাইল—সংসার ত্যাগ করিয়াই তিনি সংসারকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তখন বেদান্তের সেই নির্গুণ আত্মা-ব্রহ্মকেই তিনি 'কালী'রূপে জগৎময় উদ্ভাসিত হইতে দেখিলেন; ঘোর বৈদান্তিক, নির্ব্বিকল্প-সমাধির পিপাসা যাহার কখনো ঘুচে নাই, কোন-ঈশ্বরে যে কখনও বিশ্বাস করিবে না—সেও বলিয়া উঠিল;—

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races...

—কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে।

আমি সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের সহিত প্রেমের সম্পর্কের কথা বলিতেছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেকানন্দের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী এক—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব সেই চরিত-প্রসঙ্গে তত্ত্বের কথা আপনি আসিয়া পড়ে;—পরে দেখা যাইবে, আমি গোড়া হইতে মূল তত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়াছি। এই দুঃখ যে এক অর্থে অবস্তু নয়, এই দুঃখের যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানই প্রেমের জনয়িতা—তাহা বলিয়াছি আরও বলিবার আছে, এখানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। এই দুঃখ যাহাদিগকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী করে তাহারা বিবেকানন্দের মত পুরুষের সগোত্র নয়; আবার যাহারা ভাবযোগে সংসারকে, অর্থাৎ দুঃখকে, একটি পরম রসবস্তুর মত আস্বাদন করিয়া থাকে—সেই স্থূলভোগ-বিমুখ, সূক্ষ্মভোগবিলাসী Epicure এর artistic monasticismও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম নয়; ইহারাও আত্মপ্রেমিক Egoist—আত্মত্যাগী প্রেমিক নয়। ইহার পূর্ব্বেও পৃথিবীতে দুই মহাপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; একজন জ্ঞানী-প্রেমিক, আর একজন ভক্ত-প্রেমিক। অতিরিক্ত ভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে; খ্রীষ্ট ও চৈতন্য উভয়েই ভক্তির অবতার—চৈতন্য কিছু বেশি। ইহারা কেহই দুঃখকে বা জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করেন নাই; বুদ্ধ করিয়াছিলেন,—এই দুঃখের জ্ঞানই তাঁহার বুদ্ধত্ব-লাভের কারণ; সেই জ্ঞানে তিনি ব্রহ্ম বা ভগবান কিছুই স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ সর্ব্বভূতের দুঃখ-নিবারণকল্পে যে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাতে ব্যক্তি-আত্মাকে লোপ করিয়া আত্মামাত্রকেই অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা ছিল। বুদ্ধের সেই বাণীই, পূর্ণতালাভ করিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ব্রহ্মবাদে—

আত্মাকে অস্বীকার করিয়া নয়, আরও পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া। সেইজন্যই জগৎ একেবারে মিথ্যা বা মায়া নয়, দুঃখও 'অসৎ' নয়। শঙ্করের যে মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রায় নামান্তর, সেই মায়াই এবার—অবিদ্যা নয়, পরাবিদ্যার জননীরূপে দেখা দিল; কেবল জ্ঞান নয়, কেবল সন্ন্যাস নয়, কেবল প্রেমও নয়—সকলই এক নির্ব্বিরোধ উপলব্ধিতে অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দের অত্যুগ্র জ্ঞানপিপাসা যে-প্রেমের নিকটে আত্মসমর্পণ করিল—সেও জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। কিন্তু, পূর্ব্বে বলিয়াছি, ওই প্রেমের বীজ তাঁহার স্বভাবে নিহিত ছিল—নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষের প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ থাকিলেও, তাঁহার রক্তের বাঙালীত্ব তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি নরেন্দ্রের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জন্য সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই, বরং আশান্বিত হইয়া তাহার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং শেষে নিজেই সেই স্বভাবের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং তাহার প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের মীমাংসা এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রশ্নই "বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ" বিষয়ক আলোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; এই প্রশ্নের অন্তরালে ভারতীয় সাধনা ও মানবধর্ম্মের মধ্যে একটা নূতন বোঝাপড়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে, এবং ইহাই মীমাংসায় সেই সাধনার ইতিহাসকে নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ যেন প্রাচীনের প্রতি নূতনেরই একটা বড় challenge। যুগে যুগে সেই একই তত্ত্বকে নব নব প্রশ্নের আঘাতে ভাঙিয়া পুনঃস্থাপিত করা হইয়াছে—এমন ভাঙা-গড়ার যুগসন্ধি ভারতের ইতিহাসে আরও কয়েকবার আসিয়াছে ও গিয়াছে। এবারে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভাবি মন্বন্তরের প্রতীক্ষায় একটা যুগ-বিপ্লব চলিয়াছিল, সেই যুগ-বিপ্লবের প্রায় শেষ তরঙ্গের উপরে এই যে আর এক আবির্ভাব, ইহা যে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গুরুতর মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাস—সে কথা আজিকার দিনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই যেটুকু অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতির বলে, ও এক প্রকার দৈবী দৃষ্টির সাহায্যে, যুগ ও সনাতনের—মনুষ্যধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের—তিনি যে সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহা যেমন বুদ্ধি-সঙ্গত, তেমনই তত্ত্ববিরোধীও নয়; যুগধর্ম্মকে বুঝিবার ও সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন দর্শন এ জাতির উপযোগী করিয়া সে যুগে আর কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যে গভীরতর সমস্যা, ও তাহার যে সমাধানচিন্তা দেখা দিল তাহাতে, শুধু বর্ত্তমানের নয়—একটা দূরতর ও

বিরাটতর ভবিষ্যতের ভাবনা যেন প্রবিষ্ট রহিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যসমাজের আসন্ন মহা-সঙ্কট যেন সে দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাই মনে রাখিয়া সেই পূর্ব্ব প্রশ্নের আর একটু অনুসরণ করিব।

আত্মার পৌরুষই, একাধারে বৈরাগ্য ও প্রেম—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ধর্ম্ম-সাধনার সহায়, হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ বহু পূর্ব্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল। ইহার একটা স্পষ্টতর অভিব্যক্তি, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধ তাহার পূর্ব্বে কি পরে—সে বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব; কোন-কিছুর পূর্ণাঙ্গতা যদি কালসাপেক্ষ হয়, তবে গীতাকার বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। বুদ্ধের জ্ঞানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মনীতির উপরে পরবর্ত্তী কালে গীতার জ্ঞানমিশ্র ভক্তির প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও অভ্যুদয় হইয়াছিল, এরূপ মত প্রমাণসহকারে কেহ কেহ স্থাপন করিয়াছেন—যদিও বুদ্ধের পূর্ব্বগামিত্ব স্বীকার করেন নাই। সে যাহাই হউক, তত্ত্বের দিক দিয়া এই জগৎব্যাপারকে ও মনুষ্যজীবনকে গীতা যতটুকু মূল্য দিয়াছিল তাহার অধিক মূল্য পূর্ব্বে আর কোন শাস্ত্র দেয় নাই। তন্ত্রেও সেই এক তত্ত্বের সাধনায় যে নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে জগৎরূপিণী মহামায়ার উপাসনায় সৃষ্টিকে স্বীকার করিলেও—ত্যাগ ও ভোগ দুইয়েরই সমন্বয় থাকিলেও, সে সাধনা মুখ্যত ব্যক্তির সাধনা, তাহা সমষ্টিমুখী নয়। যে প্রেমের তত্ত্ব আধুনিক মানবধর্ম্মে একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঠিক সেই তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কোন সাধনপন্থায় প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আত্মা একাই সর্ব্ববিধ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়—এই শ্রুতিবাক্য ভারতীয় সাধনাকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়াছিল, উহার অর্থ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তত্ত্ব সহজেই বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, আত্মার দুর্ব্বলতাই জয়যুক্ত হয়, স্বার্থই আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে পরমার্থ হইয়া উঠে; শেষে সমাজ ও লোকস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোন সঙ্কটকালে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল; সেই আত্মার গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়াই—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূলক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; ইহাদ্বারাই ব্যক্তির আত্মহিত ও সর্ব্বভূতের হিত, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফল সে যুগে হয়তো ভালই হইয়াছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মিলিতে পারে। কিন্তু পরে সেই ধর্ম্ম যে ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই—তাহার প্রভাব যে নানা লোকধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। একদিকে বেদান্তের সেই 'ব্রহ্মপদ' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যেমন তাহা দ্বারা নিরস্ত হয় নাই, তেমনই মানুষের স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল সেই শূন্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পীড়নে তাহার 'মহাপ্রাণী' অসুস্থ হইয়া পড়িল, এবং আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়কেই বিকৃত করিয়া, নানা অনাচার ও

কদাচারের পর যখন আত্মার পৌরুষ প্রায় লোপ পাইয়াছে তখন দিকে দিকে ভক্তিরসের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল, ও তাহারই নেশায় কর্ম্মবিমুখতার ছদ্মবৈরাগ্য বড় প্রশ্রয় পাইল; জীবনের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়া তাহাকে জয় করিবার প্রয়োজন আর রহিল না। সেই উপনিষৎ ও সেই গীতা তখনও টিকিয়া আছে, কিন্তু টীকাভাষ্যের ভস্মলেপন অথবা পুরাণ উপপুরাণের রসসিঞ্চন তাহাকে আর এক বস্তুতে পরিণত করিল; তাই আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাসে জাতিহিসাবে পৌরুষের সাধনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

উপনিষৎ, বেদান্ত ও গীতার প্রভাব প্রাচীন ভারতের সমাজে ও ধর্ম্মে কোন না কোনরূপে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে সেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তিরস যুক্ত হইয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হইয়াছিল—ইহা স্মরণে রাখিয়াও, আজিকার এই যুগের হিন্দুসমাজে একমাত্র গীতারই প্রসার ও প্রতিপত্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, ওই একখানি গ্রন্থেই সর্ব্বযুগের উপযোগী এমন কোন সত্য আছে, যাহার জন্য আজিকার এই ভাববিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের দিনে, উহারই মধ্যে একটা আশ্রয়ের ভরসা, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে প্রায় সকলেই পাইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, এমন কোন তত্ত্ব-বিচার নাই যাহার প্রসঙ্গে গীতার কোন না কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরকে চমৎকৃত ও নিজকে আশ্বস্ত করা যায়। অতএব গীতার সেই বাণীগুলির মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে—সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ মানবচিত্তের সুপথ্যস্বরূপ বহু মহাকাব্য তাহাতে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন ধর্ম্মগ্রন্থও ভারতীয় সমাজের জীবন-বেদ হইয়া উঠিতে পারে নাই; ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনাই হইয়াছে, এখনও হইতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা এ দেশের এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম্মের তথা কর্ম্মের ঐক্য স্থাপন হয় নাই, হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ইহার কারণ, গীতায় আত্মতত্ত্বই প্রধান হইয়া আছে—মানুষের জীবন বা খাঁটি মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আত্মার সম্পর্কে তাহার যে মূল্যই তাহাতে স্বীকৃত হউক না কেন—তাহাতে মানুষের প্রাণ সাড়া দেয় নাই। গীতার যে কর্ম্মসংন্যাস তাহাতে সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা সন্ন্যাসই বটে; মায়াবাদ সেখানেও প্রবল। গীতায় পরহিতব্রত বা সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবোধের যে প্রেম, সে প্রেমও একমুখী, বহুমুখী নয়; তাহাতেও চিত্তকে সেই একের উপরে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে; অতএব গীতায় সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের সমন্বয় হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সেখানে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা সেই এক 'আত্মা'র প্রতি শ্রদ্ধাই বটে; কিন্তু সেইজন্যই দুঃখও মিথ্যা, তাহা আত্মার দেহাভিমানপ্রসূত—প্রথম হইতেই ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। আমি ও পর যখন একাত্মা, তখন পরের দুঃখ বলিয়া যেন কোন পৃথক দুঃখ নাই—আমার জ্ঞানে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, বাহিরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে

না। ইহা পরম তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহা জগতের বাস্তব তথ্য নহে; সেই বাস্তবকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে থাকে কেবল 'আমার'ই ব্যক্তি-সত্তা। সমস্ত বহির্জগৎ, সংসার, সমাজ আছে এবং নাইও; যেটুকু আছে সে যেন আমারই মোক্ষসাধনার যন্ত্ররূপে। নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধনা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহার দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান আরও দৃঢ় হইবে, নিস্পৃহভাবে মায়ার সেবা করিতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। পুরুষ এখানে আসলে একা, রঙ্গমঞ্চে সেই পুরুষ ছাড়া আর কেহই নাই, আর সকলই ছায়ামূর্ত্তি; তাহাদের সহিত অভিনয় করিয়া, অর্থাৎ অকর্ম্ম জ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিয়া, পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেইপুরুষের মুক্তিলাভ হইবে। আমি গীতা-তত্ত্বের এই যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই যে গীতার সমগ্র তত্ত্ব নয়, ইহা বলিবার জন্য গীতাপন্থী মহাজনগণ সকলেই উন্মুখ হইবেন তাহা জানি; তাঁহাদের এক উত্তর এই যে, গীতায় সকল তত্ত্বই আছে, এবং একটি মূল তত্ত্বে সেগুলি সমন্বিত হইয়াছে। এ কথা হয়তো সত্য যে, সকলের সকল রকমের পিপাসাই গীতায় মিটিতে পারে, কিন্তু ওই সমন্বয় যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আজও এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না। গীতা এই সৃষ্টিকে—এই প্রকৃতি বা মায়াকে—স্বীকারও করে, অস্বীকারও করে; সে যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'; আসলে তাহার মূলে আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদ, বহু শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণাও আছে; বরং তাহার সেই সমন্বয়চেষ্টাই অতিশয় সংশয়পূর্ণ।

উপরের কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি গীতার নিন্দা করিতেছি; গীতার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মদর্শনের সমালোচনা করিব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই; বরং ধর্ম্মগ্রন্থহিসাবে তাহাকেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমি তাহার নিত্য পূজা করি। কিন্তু মানুষ আমি, মনুষ্যসাধারণের সহিত একযোগে আমি যে সংস্কারের অধীন তাহার শেষ কণাটুকু ত্যাগ করিবার মত আত্মজ্ঞান এখনও লাভ করি নাই, যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ—বিশেষত এই ভারতবর্ষের ভাবুক মনীষিগণ দুঃখকে একটা বড় তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আরও প্রাচীন কালে ব্রহ্মজ্ঞানের যে আনন্দবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অভাবে, সেই ব্রহ্ম ও তাহার তত্ত্ব মন্ত্ররূপে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমেই জীবনের বাস্তব-অনুভূতি অন্তরের সেই সহজ আনন্দবোধকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সকল তত্ত্বই আত্মানুভূতিমূলক ছিল, আত্মোপলব্ধিই ছিল পরম পুরুষার্থ—জ্ঞানই ছিল একমাত্র প্রস্থান। প্রেমের পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এদিকে জীবনের সহিত পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দুঃখ যত বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহাকে উড়াইয়া

দিবার মত সেই আদিম প্রাণশক্তি যত কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি-কামনায় নানা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে লাগিল। শেষে এই দুঃখদর্শনে পুরুষের প্রাণের যে গভীর অনুকম্পা, তাহার অবতারস্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব হইল, সেই অনুকম্পার বশে তিনি দুঃখকে নস্যাৎ করিবার জন্য 'আত্মা'কেই বিনাশ করিতে চাহিলেন। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানই ছিল একমাত্র পন্থা; এই পন্থার মধ্যস্থলে মহর্ষি কপিল এমন একটি প্রস্তরখণ্ড দৃঢ়প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য কাহারও হয় নাই; উপনিষদের সেই ব্রহ্মবাদকেও তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল, গীতাই তাহার দৃষ্টান্ত—"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এ কথা তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। ✓ কিন্তু গীতাই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছিল—জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভক্তিকে এমন আসন তৎপূর্ব্বে আর কেহ দিতে পারে নাই। কপিলের নিকট হইতে ভূত-বিজ্ঞান এবং উপনিষদের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান আহরণ করিয়া, এমন একটি তত্ত্বের দ্বারা সে উভয়ের যোগসাধন করিয়াছে যে, জ্ঞানই তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে; সাংখ্যের সেই দ্বৈতবাদ—সেই পুরুষ-প্রকৃতি—এক অদ্বৈতরূপী পুরুষোত্তমের আলিঙ্গন-পাশে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে; সেই এক আত্মাই দুই হইয়া এক অপরকে বলিতেছে—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"! কপিলের সেই দুঃখ-ভয় আর ইহাতে নাই, কারণ সেই 'আমি'ই 'আমাকে' বলিতেছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। গীতায় জ্ঞানের যথাযোগ্য স্থান আছে, কিন্তু তাহা ভক্তি-শাসিত; Mind-ও আছে, Heart-ও আছে, কিন্তু সেখানে—"Heart is the Mind's Bible"। এই ভক্তিবাদই ভারতীয় সাধনায় গীতার শ্রেষ্ঠ দান—যদি প্রকৃত সমন্বয় কোথাও কিছু হইয়া থাকে, তবে সে এইখানে; এরূপ সমন্বয়, মানুষের জীবন-সাধনায় নয়—অধ্যাত্মসাধনাতেই সম্ভব ও সত্য।

কিন্তু গীতার যাহা অপর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, যাহার জন্য আমরা গীতাকে একটি খুব practical ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া থাকি—তাহার যে 'কর্ম্মযোগ'-শিক্ষায় জীবনের একটা বড় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই তত্ত্ব মানুষের প্রাকৃত জীবনে সত্য হইতে পারে নাই—জীবন-ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা তত্ত্বগত হইয়া আছে, তথ্যগত হয় নাই। গীতার প্রধান ভাষ্যগুলির দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে; ✓ জ্ঞানপন্থী বা ভক্তিপন্থী কোন আচার্য্যই গীতার ওই কর্ম্মযোগকে স্বীকার করেন নাই—শুধুই কর্ম্মফলত্যাগ নয়—কর্ম্মত্যাগেরই ওকালতি করিয়াছেন। ইহার কারণ, জ্ঞান-ভক্তির পথ ও এইরূপ কর্ম্মের পথ যেন কিছুতেই মিলিতে চায় না—একটি যেন অপরের বিপরীত; তাহারও কারণ—দুইয়ের জগৎই স্বতন্ত্র, একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির। গীতায় একটা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছে; গীতাকার যতই তাহা

সম্ভব বলিয়া উপদেশ করুন না কেন, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই যেন আপন আপন পথে ওই কর্ম্মকে একটা বাধা বলিয়াই মনে করে, সাধনার গতিবেগে তাহারা উহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়। সত্য বটে, সেইজন্যই গীতায় বার বার জ্ঞানের উপরে ভক্তিকেই বড় করা হইয়াছে; কারণ, ভগবানে সর্ব্ব-সমর্পণ ব্যতিরেকে এমন 'মৎকর্ম্মপরম' হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া, কোন কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ 'যোগযুক্ত' হইয়া কর্ম্ম করা কি মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে সম্ভব? কয়জন মানুষ এমন অতি-মানুষ হইতে পারে? যাহারা হয় তাহাদিগকে বুঝিতে পারে কয়জন? অতএব তাহাদের সেই জীবনকে আদর্শরূপে বরণ করিতেও সাধারণ লোকে পারে না,—মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিযাই পারে না। কর্ম্ম কেবল ভাব বা জ্ঞানমূলকই নয়, তাহা প্রবৃত্তিমূলক; সেখানে কেবল knowing ও feeling লইয়াই কারবার নয়—willingও চাই। এই will-এর অপর নাম—কাম। কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ কামকে উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইহা মনস্তত্ত্বের তথা জীবন-সত্যের বিরোধী—অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত আত্মার পক্ষে, মনুষ্য-নামধারী পুরুষের পক্ষে, ইহা অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় যে ক্ষেত্রে সম্ভব, কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে জ্ঞান ও ভক্তির প্রেরণাসত্ত্বেও, 'প্রবৃত্তিহীন' হইয়া কর্ম্মে 'প্রবৃত্ত' হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ভক্ত বলিবেন, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া থাকে, এবং তাহার সহিত যদি জ্ঞান যুক্ত হয় তবে আসক্তিও থাকিবে না। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, ওই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কোনটাই জগৎ-মুখী নয়, সকলই ভগবৎ-মুখী; ওই ভক্তিও যেমন সংসার-বৈরাগ্যের ভক্তি, ওই জ্ঞানও তেমনই বৈরাগ্যযুক্ত—ইহার কোনটার দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম—প্রকৃত জগৎসেবা—হয় না। কর্ম্মের যে 'কর্ত্তা' সে 'আমি'ই; ভগবানের নামে হইলেও কর্ম্ম 'আমার'ই; মানুষ যখন ভগবানের নামে কোন কর্ম্ম করে, তখনও তাহাতে একটা স্বকীয় প্রবৃত্তি থাকিবেই। এই প্রবৃত্তি হনন না করিয়া শোধন করিয়া লইতে হইবে; সেই পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির নাম—প্রেম। শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিষ্কাম হইবার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রবৃত্তির মূলে প্রেম থাকিলেই হইল—জ্ঞান ও ভক্তি তাহার সাহচর্য্য করিবে মাত্র। কিন্তু দুঃখকে—জগৎ ও জীবনকে—স্বীকার না করিলে ওই প্রেমের জন্ম হয় না, তাই এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে মানব-প্রেমের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ ছিল—আত্মার সত্যকে আমরা জীবনের সত্যের সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া লইতে পারি নাই। অথচ, সেই অতিপুরাতন তত্ত্বের মধ্যেই যে ইহার বীজ নিহিত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-মন্ত্রে ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা তাহারই প্রমাণ পাইয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। সেই বাণীতেই মানুষের ও আত্মার, জগৎ ও ব্রহ্মের, এক অপূর্ব্ব সমন্বয় মানুষেরই বুদ্ধিগোচর হইয়াছে; তাহা যে এতকাল পরে, ঠিক এই যুগেই ঘটিয়াছে, ইহাও পরমাশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী' এই সমন্বয়ের প্রতীক,—নরেন্দ্রের সেই জ্ঞানকেই অতিশয় সুলক্ষণ-যুক্ত দেখিয়া তিনি এই 'কালী'র মন্দিরে তাহাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবার শুধুই জ্ঞান ও ভক্তি নয়—জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়; তাই কর্ম্মও তাহার এমন অনুকূল হইয়াছে।

বিবেকানন্দের জীবনে যে-প্রেম জ্ঞানের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, সম্ভবত একেবারে শেষ হইবে না; কারণ ইহারই তত্ত্ব বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের যে সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ এত বড় প্রেম সত্ত্বেও সে জীবনে জ্ঞানের সহিত তাহার একটা বিরোধ কখনও ঘোচে নাই; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অশান্তির অস্থিরতা ছিল, তাঁহার আত্মার সেই অমিত বীর্য্য আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে নাই,—তিনি সারাজীবন একটা প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই দাহে তাঁহার দেহ অকালে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মঃ রোলা বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—

His super-powerful body and too vast brain were the predestined battlefield for all the shocks of his storm-tossed soul...and his days were numbered. Sixteen years passed between Ramakrishna's death and that of his great disciple—years of conflagration. He was less than forty years of age when the athlete lay stretched upon the pyre.

ইহার কারণ, প্রেম তাঁহার সেই অপর প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই, অতিশয় দৃঢ়বলে শাসনে রাখিয়াছিল; তাহার জন্য নিরন্তর যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল—নিজের সহিত নিজেই যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ডতাই সে জীবনকে এমন দীপ্যমান করিয়াছে। তথাপি জ্ঞান ও প্রেম দুই-ই তাঁহার উপরে সমান আধিপত্য করিয়াছিল—একটা ভিতরে, অপরটা বাহিরে; তাই সে দ্বন্দ্ব এমন অন্তর্গূঢ় হইয়াছিল। এই প্রেমও যে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে শাস্তির মত বোধ হইত, এবং ভিতরের কি একটা শক্তির বশে সে শাস্তি তিনি যেন বহন করিতে বাধ্য,—এমন ভাবও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

It seemed almost as it were by some antagonistic power that he was "bowled along from place to place being broken the while," to use his own graphic phrase. "Oh, I know I have wandered over the whole earth," he cried once, "but in India, I have looked for nothing save the cave in which to meditate!"

কিন্তু সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের এই দীর্ঘশ্বাসে প্রেমিক-বিবেকানন্দের পরিচয় কি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে না? যে শান্তি তাঁহার এত কাম্য, যে জীবন তাঁহার এত প্রিয়, তাহাই তো তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। এই ত্যাগের শক্তি আসে কোথা হইতে? প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবন জীর্ণ হইলেও, তিনি ওই প্রেমেরই যজ্ঞানলে সেই জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ; শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বা সাধন-তত্ত্বের মৌলিকতা; গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে দীক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বে বিবেকানন্দ তাঁহার স্বভাবের ভিতরকার এই বিরোধকে স্বীকার করিতে না চাহিলেও অস্বীকার করিতেও পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সে অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সেই পৌরুষ বীর্য্যে; তাঁহার অন্তরের সিংহমূর্ত্তির সেই স্ফুরিত কেশরদাম গুরুকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। যে আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", ইহা সেই আত্মার সেই পৌরুষ, তাই ইহা মৃত্যুঞ্জয়, মায়াজয়ীও বটে। কিন্তু মায়াকে জয় করিতে হইলে তাহাকে হনন করিতে হয় না—সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া আত্মার ইষ্টসাধন করা যায়। যে-প্রেম সেই মায়ার—সেই ছলনাময়ী প্রকৃতির—বন্ধনপাশ, তাহাই দুর্ব্বলতা, তাহাই মোহ; সে-প্রেম দুঃখকে জয় না করিয়া তাহার অধীন হয় বলিয়াই দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পলায়ন অথবা আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই দুঃখকে—কপিল-বুদ্ধের মত—কোন অর্থেই 'অসৎ' বলা যাইবে না; এই দুঃখচেতনা হইতেই অস্তিত্বের চেতনা—জীবন-চেতনা; এই দুঃখ হইতেই নর-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই প্রেমের জন্ম হয়। জীবন ও জগৎ যদি দুঃখহেতু বলিয়া 'অসৎ' হয়—সেও দুর্ব্বল আত্মার মোহ, একরূপ অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি; সেরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানের অভিমান আত্মার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বরং ওই জগৎকে—ওই দুঃখকে সেই এক 'সৎ'-বস্তুর অনুগত করিয়া দেখিতে পারিলেই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি সম্ভব। বিষ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার সঙ্গে বিষঘ্ন ঔষধও রহিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, যে প্রেমের শক্তি দুঃখকে নির্ব্বিষ করিয়া তোলে তাহারও জন্ম হয় ওই দুঃখ হইতে; ওই প্রেম পূর্ণজ্ঞানেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অতএব উহাও 'সৎ'—অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না। দুঃখকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি—সে সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার—আমাদের অজ্ঞান ও অশক্তিই তাহার কারণ।

গীতা বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ", আত্মার দ্বারাই আত্মাকে তুলিয়া ধরিবে, আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না; "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। ইহার অর্থ আত্মার

মোহই সকল ভয় ও সকল অশক্তির মূল—মোহমুক্ত আত্মার ভয় কি? তাহার মত শক্তিমান কে? সে অবস্থায়, পারমার্থিক হিসাবে জগৎ যাহাই হউক—ব্যবহারিক হিসাবে তাহা সত্য হইলেও ক্ষতি কি? তখন 'আমি'ই একমাত্র সত্য বলিয়া আর সকলেই মিথ্যা নয়; বরং সেই 'আমাতে'ই সকলে অবস্থান করিতেছে—ওই 'বহু'ও আমারই 'আমি' এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্ঞানে যখন বুঝি, আমি কে—আমিই বিরাট ও বিশ্বম্ভর, তখন আমার যে আত্মস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা ক্ষুদ্র-আমির আত্মম্ভরিতা নয়—আত্ম-বিস্ফারের আনন্দ; এই আনন্দময় আত্মবিস্ফারের অনুভূতিই জগৎ-অনুভূতি। আমি 'এক'ও বটে আমি 'অনেক'ও বটে—আমার বিভূতির কি সীমা আছে? দ্বৈত ও অদ্বৈত—দুই তত্ত্বই এক; যেখানে বিরোধবোধ আছে সেখানে আত্মারই আত্মজ্ঞানের অভাব—তাহাই মোহ, তাহাই অবিদ্যা। অতএব জগৎকে অস্বীকার করিবার যে জ্ঞান-বিজৃম্ভিত মনোভাব তাহাও অজ্ঞান আত্মার আত্ম-সঙ্কোচ। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতে, আত্মার এই গতায়াত আত্মারই "যোগমৈশ্বরম্"। ইহা যদি দুঃখপ্রসূ হয়, তবে দুঃখও এই হিসাবে সত্য যে, তাহা আত্মার সেই অনন্ত শক্তিকে প্রেমরূপে আস্বাদন করিবার একটি সহায়। আমারই এতগুলি 'আমি' দুঃখ পাইতেছে—নিজের প্রতি নিজেরই এই অনুকম্পা, ইহাই সেই 'রস'—যাহা অভিনয়ের দ্বারা আস্বাদন করিবার জন্য আত্মা এই জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এ অভিনয় অনন্তকাল চলিয়াছে ও চলিবে। এ দুঃখ আমারই দুঃখ—সর্ব্বশক্তিমান, নিত্যমুক্ত স্বাধীন যে-'আমি' সেই 'আমি'র দুঃখ, তাই সে দুঃখ, পাপীর দুঃখ নয়—সেই দুঃখীও দয়ার পাত্র নয়। এই দুঃখকে অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিতে হয়—নতুবা, যে নিত্যমুক্ত তাহার আবার দুঃখ কি? ওই প্রেমের কারণেই 'আমি'গুলির দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে; সেই দুঃখশৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য যে অধীর আবেগ, তাহার মূলে আছে যেমন আত্মপ্রেম, তেমনই তাহা মানব-প্রেমও বটে। আত্মার এই শক্তি, তথা আনন্দ ও প্রেমের তত্ত্ব, অতি প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বই বটে—গীতার তত্ত্বও মূলত ইহাই; কেবল এই ভাষ্য নূতন,—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে, সেই ব্রহ্মসূত্রের—সেই আত্মোপনিষদের—এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে; নবযুগের নবধর্ম্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য Humanism-কে একটি অতিগভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

ত্যাগী সন্ন্যাসীও যে কি কারণে কিরূপ প্রেমিক হইতে পারে আমার সাধ্যমত তাহার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবেই করিলাম। এই প্রেম যে জ্ঞানের অন্তরায় নয়; আত্মার আত্মজ্ঞানের পৌরুষ ও এই প্রেম যে এক বস্তু; এই সন্ন্যাসও যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের সেই সন্ন্যাস নয়—ইহাতে জগৎ-সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজনও যেমন নাই, তেমনই আত্মার বন্ধন-ভয়ও নাই;—বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন

তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই অদ্বৈতজ্ঞানী, আত্মৈকবিশ্বাসী, কর্ম্মবীর্য্যাবতার সন্ন্যাসী আপন মনুষ্যহৃদয়যোগে যে বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ছিল, মনের মোহ ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের সহিত প্রেমের এই যোগ সাধন, অথবা জ্ঞানের অন্তস্তলে এই প্রেম-বীজের আবিষ্কার যে দৃষ্টির দ্বারা হইয়াছিল, তাহাকে সেই দৃষ্টির সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে না—কখনও করিত কিনা সন্দেহ, সে সহসা এমন এক প্রেমকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিল—যাহা জ্ঞানেরই যেন বিগলিত রূপ! সে-রূপ দেখিয়া তাহার চিত্তে ব্রহ্ম ও মানবের ভেদজ্ঞান আর রহিল না, জ্ঞান ও প্রেমের এই অদ্বৈত-সিদ্ধি তাহাকে চিরজীবনের মত জয় করিয়া লইল। এমনই করিয়া বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিভৃত মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভারতবর্ষের সেই চিরাগত সাধনাই—এখনও যাহা অনাগত, তাহাকে বরণ করিয়া লইল; সেই এক গঙ্গোত্তরীধারার জাহ্নবী-তীরে সমগ্র মানব-জগতের জন্য এক নূতন বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হইল।

বিবেকানন্দের সেই দীক্ষালাভ ঠিক কোন্ ক্ষণে কি উপায়ে হইয়াছিল সে রহস্য চিরদিন আমাদের অজ্ঞাত হইয়াই থাকিবে। তিনি গুরুর অপর কোন্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার সারাজীবন শান্তিময় ধ্যানের পরিবর্ত্তে একটা অশান্ত কর্ম্ম-ব্যাকুলতায় নিঃশেষ হইয়াছিল,—সে কথা তিনি নিজেও প্রকাশ করেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "It is a secret, that will die with me" অর্থাৎ, "সে কথা আমি ভিন্ন আর কেহ জানিবে না।" সেই ধীর, শান্ত, সহাস্য, ক্ষণে-ক্ষণে সমাবিষ্ট, ভাববিহ্বল, আত্মানন্দী পুরুষের সেই যে পরমহংস-রূপ আর সকলে প্রত্যক্ষ করিত, তাহার অন্তরালে কোন্ অপর মূর্ত্তি কূটস্থভাবে বিদ্যমান ছিল? সেই বাহ্যিক প্রশান্তি ও পূর্ণ স্থিরতার মধ্যেই কি প্রচণ্ড গতিবেগ লুক্কায়িত ছিল, যাহার একটুকু স্পর্শে বিবেকানন্দের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরাস্ত হইয়াছিল—অন্তরের শান্তিপিপাসার উপরে বাহিরের সংগ্রামবাসনা জয়ী হইয়াছিল? তাঁহার জীবনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা যে সেই গুরুদীক্ষার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; গুরুর যে দিকটি লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, সেই দিকটি তাঁহার মধ্য দিয়াই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই দিক যে কিরূপ, তাহা বিবেকানন্দ হইতেই আমরা জানি; কেবল এই সংশয় কিছুতেই ঘোচে না যে—সেই দিক কি সত্যই দক্ষিণেশ্বরের সেই কোমলদেহ ও কোমলপ্রাণ, সংসারভীরু, বিবিক্তসেবী, জগৎব্যাপারে অনভিজ্ঞ, উদাসীন, নির্লিপ্ত, ভাবনিমগ্ন পুরুষেরই অপর দিক? তাঁহার যে মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সেই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'; আর এ মূর্ত্তি শক্তির প্রকট মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি আর কেহ দেখে নাই, বিবেকানন্দই দেখিয়াছিলেন। তিনি যে-শিবের আদর্শকে

বিশুদ্ধ অদ্বৈত-তত্ত্বরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পরমহংসদেবের মধ্যে তিনি সেই শিবেরই অপর রূপ দেখিয়া—দ্বৈতাদ্বৈতের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া—সর্ব্ব-সংশয়মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তত্ত্বের মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই তত্ত্বই জগৎকে—সৃষ্টিকে—একটি নূতন অর্থে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, মানবজীবনকে একটা নূতন মহিমা দান করিয়াছে। সেই তত্ত্বের দার্শনিক সমস্যা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। তথাপি আমার নিজের মত করিয়া ওই তত্ত্বের একটু ব্যাখ্যা করিব।

জীবনকে তথা সৃষ্টিকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, সৎ-অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, এক ও অনেক, স্থিতি ও গতি, ধ্রুব ও অধ্রুব প্রভৃতি 'দ্বন্দ্ব' বা 'বিপরীত'-তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হয়; এই দ্বৈতজ্ঞান যেমন অনিবার্য্য—দুইয়ের কোনটাকেই বর্জ্জন করা যায় না, তেমনই অবিকারী, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্পূর্ণ একটা কিছুর জন্য মানবাত্মার গভীরতর আকুতি নিবারণ করাও অসম্ভব। এক দিকে এই আত্যন্তিক প্রয়োজন, অপর দিকে সৃষ্টি ও সেই পরম তত্ত্ব এতই বিপরীত যে, ওই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বেদান্ত এই দুইয়ের নানা সম্বন্ধ নানা দিক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের ঘোষণা আছে—তেমনই, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা তত্ত্ববাদের দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই অপর-তত্ত্বকে কোনরূপে কিঞ্চিৎ স্বীকার করার বা অস্বীকার-না-করার উপায়ও আছে—সে যেন স্বীকার অস্বীকারের একরূপ লুকোচুরি। আমি এই সব সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদের মধ্যে প্রবেশ করিব না, কেবল এই সকলের মধ্যগত একটা প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া আমার এই ব্যাখ্যার সৌকর্য্যবিধান করিব—তাহাতে পাঠকগণের ত্রস্ত হইবার কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত ও চরিতার্থ হইবে, এমন আশা করি। ধরা যাক —এই 'সৃষ্টি'র ঠিক বিপরীত যাহা তাহার নাম 'লয়'; এটুকু আমরা ধারণা করিতে পারি, যদি সৃষ্টিকে মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে হয়, তাহা হইলে সহজ বুদ্ধির সহজ বিচারে লয়কেই সত্য বলিতে হয়—এই লয়ই তাহা হইলে সৎ-বস্তু? আবার, সৃষ্টি যদি হয় একটা কিছুর নিরন্তর গতিক্রিয়া, তবে ওই লয়কে একটা চিরন্তন স্থিতির অবস্থা বলিতে হইবে; ওই গতিক্রিয়াকেই যদি শক্তিরূপা বলিয়া ধারণা হয় এবং 'শক্তি' অর্থে ওই 'গতি'—ওই নিরন্তরপ্রবাহী ক্ষণবুদ্বুদময়ী সৃষ্টিধারা বুঝায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় গতিহীন, অর্থাৎ শক্তিবিক্ষোভহীন, ধ্রুব-শাশ্বত একটা কিছুকে 'লয়ে'র অবস্থা বলিতে হইবে। এই দুই তত্ত্ব এমনই পরস্পরবিরোধী যে এই দুইয়ের একটাকেই মানিতে হয়, দুইয়ের সমন্বয় করা বড়ই দুরূহ। বেদান্ত এমন একটা তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে, যাহা মূলে দ্বৈতাদ্বৈত, সদসৎ প্রভৃতি সর্ব্ববিশেষণবর্জ্জিত। এই বস্তু ধ্যানগম্য—অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়; ইহা বুদ্ধি বা বাক্যের গোচর নয়। বুদ্ধ ইহাকে গণ্ডিকা বলিয়া

উড়াইয়া দিলেন, তিনি মানবীয় সহজ বুদ্ধির বীর্য্যবলে কার্য্যকারণের শেষতম গ্রন্থি মোচন করিয়া সৃষ্টির অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, এবং তাহার বিপরীত তত্ত্ব সেই লয়-তত্ত্বকে সহজ অর্থেই গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ সৎ বা কোনরূপ অস্তিত্বকেই স্বীকার করিলেন না।—সৃষ্টি যেমন মিথ্যা, তেমনই সেই মিথ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন সত্তা নাই—যাহা আছে তাহা শূন্য। তাঁহার মতে লয় অর্থে শূন্যই বটে। তন্ত্র বেদান্তকেই অনুসরণ করিয়া ওই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে একটা রফা করিল। বেদান্তমতে সকল দ্বৈতই মিথ্যা—সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই ; অতএব লয়তত্ত্বও অ-তত্ত্ব ; তথাপি সৃষ্টিকে 'মায়া' বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে—তন্ত্রের পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। ইহার পর, যদি স্থিতিতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বকে—লয় ও সৃষ্টিকে—একই শক্তির অবস্থাভেদ, অর্থাৎ 'স্বগতভেদ' (অতএব, সেই অদ্বৈতের অবিরোধী) বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি আর মিথ্যা হয় না—তাহার মূল ধাতুটা যে 'সৎ' তাহা স্বীকার করিতে হয়। তথাপি তন্ত্রমতে, বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের মত, একটা নিষ্কল শিবের তত্ত্বও আছে, সকল গতি সেই পরম স্থিতিতে অবসানপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি হইতেই গতির উৎপত্তি—এই শিবই শক্তিরূপে সৃষ্টিতে গতিমান বা অনন্ত রূপস্রোতে প্রবহমান। তন্ত্রমতে এই দুই অবস্থার দুই সত্তা একই, এক হইতে অপরে এই যে উদ্ভবন—ইহা সেই পরম তত্ত্বের বিকৃতি নয় ; ইহাই তাহার স্বভাব।

তন্ত্রের এই তত্ত্ব সৃষ্টিকে, যে অর্থেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছে ; কিন্তু তাহাতেও স্থিতি ও গতি—শিব ও শক্তি—ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুইয়ের একটা পারমার্থিক ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তথাপি তন্ত্র একটা খুব বড় সমস্যার কতকটা মীমাংসা করিয়াছে। কারণ এই সৃষ্টিকে উড়াইয়া দেওয়া—একেবারে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহার সকল বাহ্য আবরণ নিঃশেষে মোচন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত একটা এমন-কিছু থাকিয়া যায়, যাহাকে তত্ত্বরূপে স্বীকার না করিলেও একটা অনির্দ্দেশ্য, দুর্ব্বোধ্য কিছুরূপে স্বীকার করিতেই হয়, এবং সেই কিছুকে 'মায়া' নাম দিলেও সে নস্যাৎ হইয়া যায় না। তন্ত্র ইহাকে স্বীকার করিয়া—সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছে বটে, শক্তিকে শিব-শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিকে—আমাদের 'জগৎ ও জীবন'কে—একটা আপেক্ষিক সত্তা মাত্র দান করিয়াছে ; কারণ, এই সৃষ্টিরও একটা লয়ক্রম আছে—শিব-শক্তিও নিষ্কল শিবে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমে যাহা জগৎ, লয়ক্রমে তাহা আর থাকে না, থাকিলেও বিকৃত-নামরূপের পরিবর্ত্তে স্বরূপ-নামরূপের অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করে। অতএব সৃষ্টি হয় কালে—এবং কালেই 'লয়'-প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রমতে এই লয়যোগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপা এই শক্তিকে—এই সৃষ্টি-

বাসনাকে—ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া পরমশিবে লয় করিতে হয়। তাহা হইলে ইহাতে একটা ঊর্দ্ধ ও নিম্ন আছে—একটা হইতে আর একটাতে আরোহণ, একটার পরিণামে আর একটায় পৌছানো আছে—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে মূল্য তাহাও আপেক্ষিক ; জীবন ও জগৎ এই অর্থে সত্য যে, তাহার সেই গতি-ক্রিয়া শিব-শক্তিরই ক্রিয়া। শিব ও শক্তির যে ঐক্য-তত্ত্ব তাহাতেও একটা প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তনের—উদয়-বিলয়ের ক্রমাবস্থা রহিয়াছে। অতএব, এই শিব-শক্তিবাদের দ্বারাও সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ 'সৎ' বলিয়া মানিয়া লওয়া গেল না।

একটা উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা আরও একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। 'সৎ' বা সেই পরম তত্ত্ব, সেই শিব—যেন একটি অক্ষয় অব্যয় অশ্বত্থবীজ ; এই বীজের মধ্যে তাহার উদ্ভেদ-শক্তি সংহত বা সমাহিত হইয়া আছে—তখন সেই বীজ ও তাহার শক্তিতে কোন ভেদ নাই। বরং সেই শক্তিরই যেন সমাহিত অবস্থার রূপ ওই বীজ ; অতএব শক্তি অর্থে স্থিতি ও গতি দুই-ই। তথাপি ওই বীজের অবস্থা বা স্থিতির অবস্থাই মূল অবস্থা। ইহাই সেই নিষ্কল শিবের অবস্থা। শক্তি যখন হইতে গতির উন্মুখী হয়, তখনই সেই শিব একটু বিশেষিত হইয়া শিব-শক্তি অবস্থা পাইয়া থাকেন। সেই বীজই যেন অঙ্কুরিত বিকশিত হইয়া বিশাল শাখাপল্লবময় সৃষ্টিরূপ ধারণ করে ; কিন্তু তখনও বীজ তেমনই থাকে, অর্থাৎ বীজ ও বৃক্ষ আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে—স্থিতি স্থিরই থাকে, তাহা হইতেই শক্তির উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার হয়। এই গাছটাই সেই গতির রূপ —সেই রূপ পূর্ণ পরিণতির পরে আবার ওই বীজে ফিরিয়া যায—শক্তি শিবে লীন হয়। উপমাটিতে হয়তো তত্ত্বের সূক্ষ্মতা ধরা পড়িল না ; ততখানি সূক্ষ্মতাব প্রয়োজনও এখানে নাই ; কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শক্তির এই বিকাশের মুখে স্থিতি ও গতি পৃথক হইয়া রহিল—বীজ বৃক্ষে লয় পাইল না। বরং যেন ওই বীজের উপরেই ভর করিয়া বৃক্ষ তাহার শাখাপ্রশাখা-বিকাশের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছে। আবার ওই গতি-শক্তি আপনাকে সংহরণ করিয়া—সৃষ্টিকে সংহার করিয়া—ওই স্থিতি বীজে লয় পাইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-ক্রম ও লয়-ক্রম দুইই একই শক্তির দ্বিবিধ গতি লীলা। তথাপি, একটি অপরের সমধর্ম্মীও নয়, সমকালিকও নয় ; তাই এই গতির বিকাশরূপ যে সৃষ্টি তাহার মধ্যে যেমন স্থিতি নাই, তেমনই তাহা স্বপ্রতিষ্ঠও নয়। অতএব শিব-শক্তিবাদের দ্বারা সৃষ্টিকে যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যাক না কেন—উহার সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ নয় ; স্থিতির তুলনায় গতি কালাতীত নয়, বরং কালসাপেক্ষ ; ওই গতির মূলে যে স্থিতি—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে পৌছিতে না পারিলে মহাকালের শাসন-মুক্ত হওয়া যায় না। এই-জন্যই সেই দুইয়ের, সেই নিত্য ও অনিত্যের, স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্ব ইহাতেও নিরস্ত হইল না ; সৃষ্টিকে—জগৎ ও জীবনকে—একটা নিরপেক্ষ সত্যের সামিল করা গেল না।

ভারতীয় দর্শন ও সাধন-তত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তন্ত্রেব পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্য্যাদা দেওয়া ইতিপূর্ব্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম একটা অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনি গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে একই দেশে ও কালে অভেদ-রূপে বিদ্যমান দেখিলেন; শিব ও শিবশক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও সৃষ্টি একই তত্ত্বের এ পিঠ ও-পিঠ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে; একদিক হইতে দেখিলে যাহা ব্রহ্ম, অপব দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌছিতে হয় না; কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপব উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁডি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অন্তবগোচর হইবে। জডবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে static ও dynamic—দুই-ই এক শক্তির এককালীন স্ফূর্ত্তি; যে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হইতেছে, লয়ও সেই মুহূর্ত্তে হইতেছে; স্থিতির উপবেই ভর করিয়া গতির ক্রিয়া চলিতেছে; নিশ্চল শিবেব বুকের উপরে আমরা যে নৃত্যোন্মত্তা শক্তিমূর্ত্তি দেখিয়া থাকি তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ কিছু একটা হইবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানেব ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ—এই জগৎ-ব্রহ্ম অভেদ তত্ত্বের প্রতীক--শ্রীরামকৃষ্ণেব সাধনবিগ্রহ, তাঁহাব সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।

এই তত্ত্বই শ্রীবামকৃষ্ণের জীবনে সাক্ষাৎ বাণীরূপ ধারণ করিযাছিল—শ্রীবামকৃষ্ণ এই বাণীবই অবতাব। তত্ত্বটা নূতন নয; কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাহাব এমন অর্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই; নূতন যে নয, তাহাব প্রমাণ, একজন তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তন্ত্রেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Its purpose is to give liberation to the Jiva (জীব) by a method according to which monistic truth is reached through the dualistic world, immersing its Sadhakas (সাধক) in the current of Divine Bliss by changing duality into unity, and then evolving from the latter a dualistic play, thus proclaiming the wonderful glory of the spouse of Paramashiva (পরমশিব) in the love embrace of matter and spirit (জড় ও চৈতন্য).

এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িল—যতই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য হউক, তাহাতে এমন কযেকটি লক্ষণ আছে, যাহার জন্য সেই ঘটনাটিকে বড়ই অর্থপূর্ণ বলিযা মনে হয়। কথিত আছে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও প্রতিপালক মথুরবাবু আপনার কক্ষ হইতে বাহিরের অদূরস্থ ঠাকুরবাড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঘরের বারান্দায় পায়চারিরত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর, এবং

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। পরমহংসদেব সেই বারান্দাটিতে পায়চারি করিবার সময় যখন এদিকে ফিরিতেছেন তখন তাঁহার মুখ কালীর মুখ, যখন আবার অপর দিকে ফিরিতেছেন তখন সেই মুখই মহাদেবের মুখ! এই যে দর্শন, ইহাকে 'psychic' একটা কিছু বলা যাইতে পারে; কিন্তু সে যাহাই হউক, যদি ইহা স্বপ্নও হয়, তাহা হইলেও যে তত্ত্বটি উহাতে প্রতীকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সে তত্ত্ব মথুরবাবুর মত একজন অজ্ঞানী ভক্ত স্বপ্নেও কল্পনা করিল কেমন করিয়া? কিন্তু সে প্রশ্ন আমার নয়, আমি এই স্বপ্নের ঘটনাকেও বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা সত্য মনে করি, এবং এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, এক মথুরবাবু ছাড়া আর কোন শিষ্য বা ভক্ত ওই শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বকে এমন চাক্ষুষ করে নাই! মথুরবাবু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই; মর্ম্ম কি আর কেহ বুঝিয়াছে? আমার মনে হয়, এই তত্ত্বকেই বিবেকানন্দও, পৌরাণিক প্রতীকের ভাষায় নয়—তাঁহার গুরুর মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রকাশ্য কথায় ও বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশ ও আদেশের মধ্যে ইহার কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণও আছে। একবার অর্দ্ধ-আবিষ্ট অবস্থায় তিনি জীবকে 'দয়া' নয়—'শিব'জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে—এই কথা একটি সত্য মন্ত্রের মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া যে সত্যদর্শন হয়—রূপকের ছলে সেই তত্ত্বকথা তিনি প্রায়ই বলিতেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আবার, বিবেকানন্দকে তাঁহার সেই ভর্ৎসনা—"তোর মন এত ছোট যে, তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!"—তাহাও স্মরণীয়। এই সকল হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পরমহংসদেবের বাণী সেই পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়—এ বাণী একেবারে নূতন না হইলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে উঁকি দিতেছে। সে তত্ত্ব কি তাহা পূর্ব্বে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই যে একই মুখ শিব ও শক্তির মুখ, কেবল দিকপরিবর্ত্তন মাত্র; ওই যে জীব—কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াই শিব নয়, তথ্যের দিক দিয়াও শিব; এ সকলের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—যে সত্য ব্রহ্মের সত্য, জগতের সত্যও তাহাই; সিঁড়ি ও ছাদ ভিন্ন বটে—সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠিলে ছাদ ও সিঁড়ি, উপরিতল ও নিম্নতল, ভিত্তি ও শিখর, সবই সমান ও সর্ব্বাঙ্গীণ একরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি উপরে এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি কেহ যেন তাহার দার্শনিক মূল্য যাচাই না করেন—দার্শনিক পরিভাষা বা দার্শনিক যুক্তিপ্রণালী—কোনটাই আমার অভ্যস্ত বা আয়ত্ত নহে; আমি নানা উপায়ে পরিচিত শব্দ ও উপমার সাহায্যে প্রাণপণে একটা তত্ত্বের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র—আমি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছি সেই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; পাঠকগণকে কেবল সেই ইঙ্গিত-

মাত্র সহায় করিয়া নিজ নিজ বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈত-তত্ত্ব। ওই স্থিতি ও গতিকেই লয় ও সৃষ্টি বলা যাইতে পারে; এবং লয় যদি নিরপেক্ষ এবং সৃষ্টি আপেক্ষিক হয়, তবে একটির গৌরব অপরের তুলনায় অধিক হয়, এবং দুইয়ের মধ্যে একটা অবস্থাগত প্রভেদ ও কালগত ব্যবধানও থাকে; লয়ের অবস্থা সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, এজন্য সৃষ্টিকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এই দুই সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সৃষ্টি-স্রোতের প্রতি তরঙ্গে, প্রতি মুহূর্ত্তে, ওই স্থিতি ও গতি সমভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে, তবে সৃষ্টিকে ব্রহ্ম হইতে একটা পৃথক কিছু মনে করিবার কারণ থাকে না। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কালের এক চিন্তাশীল বাঙালী পণ্ডিতের এই মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি, তিনি লিখিয়াছেন—

Sakti beeing either static or dynamic, every dynamic form must have a static background. A purely dynamic activity (which is motion in its physical aspect) is impossible without a static support or ground (আধার). Hence the philosophical doctrine of absolute motion or change, at taught by old Heraclitus and the Buddhists and by modern Bergson, in wrong. It is based neither upon correct logic, nor upon cliar intustion. The conttituion of an atom reveals the static-dynamic polarisation of Shakti; other and more complex forms of existence also do the same.

এক্ষণে আবার বিবেকানন্দেব কথাই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার এই 'জগৎ-সত্য' মন্ত্রে দীক্ষালাভ হইয়াছিল যে, জীবই শিব;—উপনিষদের সেই 'আত্মা'ই মানুষরূপে এই জগতের সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া—শুধু সাক্ষী হইয়া নয়—তাহাকে তীর্থ গৌরব দান করিয়াছে। মন্ত্র সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই মন্ত্রস্বরূপ হইয়া যেন একটি উপযুক্ত আধার খুঁজিতেছিলেন—নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বালক যেমন তাহার ঈপ্সিত খেলনা দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তিনিও তেমনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের মধ্যে তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক দিকে মুক্ত শুদ্ধ আত্মার অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান-ধাতু, অপর দিকে ব্যক্তি-আত্মার বা মানুষ-সত্তার যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই পৌরুষ; উভয়ের এমন মিলন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। নরেন্দ্রের এই পৌরুষই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল—তাহার সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমান, উদ্ধত আত্মপ্রত্যয়, এবং ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের প্রতি যেন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাঁহাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, কোন্ শক্তি কোন্ তেজ তাহাকে এমন

অশান্ত করিয়াছে ; আত্মার সকল রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি এই পৌরুষের মধ্যেই প্রেমের সুপ্ত বীর্য্য দর্শন করিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেন। নরেন্দ্রের দেহাবয়বেও তিনি তাহার অন্তর-পুরুষের পরিচয় পাইয়াছিলেন ; মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধে সেই প্রশস্ত গণ্ড, সুগঠিত চিবুক ও সুমিলিত ওষ্ঠাধর যেমন ইস্পাতস্বরূপ দৃঢ়তার—অতি কঠিন সঙ্কল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, তেমনই, তাহার সেই পল্লবভারাকুল দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু! সেই চক্ষুদুইটির গবাক্ষপথে তিনি নরেন্দ্রের আত্মার যে রশ্মিচ্ছটা দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সংশয় থাকিত না ; তাই বড় স্নেহে তিনি তাহাকে 'কমলাক্ষ' বলিয়া ডাকিতেন। এই দুষ্ট বালকের দুষ্টামি তিনি যেমন পরম স্নেহে উপভোগ করিতেন, তেমনই কেমন করিয়া তাহাকে অতি সহজে বশ করিবেন তাহাও জানিতেন বলিয়া, তিনি সে বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যস্ততা বোধ করেন নাই। আরও কিছুদিন যাক, আরও কিছুদিন দুরন্তপনা করুক ; কল ঘুরাইবার চাবিটি যে তাঁহার হাতেই আছে। এমন জ্ঞানের সহিত যখন এমন পৌরুষ রহিয়াছে, তখন ভাবনা কি ? ওই অভিমান যে আত্মারই অভিমান, উহাতে যে এতটুকু ব্যক্তি-স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার কলঙ্কচিহ্ন নাই ! অবোধ বালক, তোমার ওই অভিমান দিয়াই তোমাকে জব্দ করিতেছি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নীতি'-জ্ঞান কম ছিল না—পরম জ্ঞানীর অবস্থা বালকের মত অবস্থাই বটে, কিন্তু সে বালকোচিত অজ্ঞতার অবস্থা নয় ; তাই শেষে একটিমাত্র কৌশলে তিনি নরেন্দ্রকে জয় করিয়া লইলেন ; নরেন্দ্র কেবলই নির্ব্বিকল্প সমাধির—'সুখং আত্যন্তিকং' আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিত—স্পষ্টই বলিত যে, তাহাই পরম পুরুষার্থ। নরেন্দ্রের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের মত ব্রহ্মপরায়ণ মহাপুরুষ তাহার এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দিবেন —ইহাতে তিনি তাহার প্রতি আরও খুশি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু একদিন সহসা সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তাহার ওই কথা শুনিয়া কঠিন ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি বীরত্ব ! তুমি জগতের আর সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ !" এই গ্লানিবোধ নরেন্দ্রের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে যে ছিল, সাংসারিক সংকটে তাহার সেই দারুণ অন্তরসংগ্রামেই সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি ; কিন্তু সংগ্রামশেষে নরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিতেই চাহিয়াছিল, তখনও তাহার জীবনে ওই স্পর্শমণির স্পর্শলাভ ঘটে নাই, তখনও সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে সে 'দর্শন' করে নাই। আজ তাহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল—যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মুখে এ কি কথা ! মানুষের সেবাকে সেও মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করে ! অথবা তাহার মতে, সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না ; এ বড় অপূর্ব্ব কথা ! কিন্তু নরেন্দ্র সেই কথা, এবং কথার তত্ত্বকেও

দূরে ঠেলিয়া, তাহার মস্তিষ্কে নয়—প্রাণের মধ্যে এক প্রবল প্লাবন অনুভব করিল, এবং এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাকে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া দিল। ইহার পর, সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই তাঁহার মুখে বার বার শোনা যাইত—'I felt his wonderful love'। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আর কি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আর কি দিয়াছিলেন—সে সকল কথা তিনি জগৎকে জানানো আবশ্যক মনে করেন নাই।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেম যে কত বড়—বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে কোন্ প্রেমের রূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেকানন্দকে পাইয়া তাঁহার এত আনন্দ কেন, তাহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। মঃ রোলাঁ তাঁহার 'বিবেকানন্দ-চরিত' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন; উক্তিটি এই—

The day when Naren comes in contact with suffering and misery the pride of his character will melt into a mood of infinite compassion. His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost. And the freedom of his conduct, based on mighty selfmastery, will shine brightly in the eyes of others, as a manifestation of the true liberty of the Ego.

শিষ্যের সম্বন্ধে গুরুর এই ভবিষ্যৎ বাণী যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, এবং ইহাতে, বিবেকানন্দের অন্তরতম অন্তরের পরিচয় যে তিনি কিরূপ নিঃসংশয়রূপে অবগত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটিতে কেবল তাহাই নয়, কেবল শিষ্যের নয়—গুরুরও যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সে দিকটি কেহ অনুধাবন করেন নাই। পরমহংসদেবের ওই বাণীর মধ্যে তাঁহার নিজেরই প্রাণের আকূতি ধরা পড়িয়াছে—এমন আর কোথায়ও পড়ে নাই; ইহা সেই আকূতি যাহার বশে এক মহাপ্রেম যুগে যুগে অতি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে যে দুঃখের উল্লেখ করিতেছেন তাহার ব্যাপ্তি ও পরিমাণ তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? বিবেকানন্দের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে যাহা সত্যই ঘটিয়াছিল, মঃ রোলাঁ তাহারও এইরূপ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়াছেন—

This meeting with suffering and human misery—not only vague and general—but definite misery, close at hard, the misery of his people, the misery of India—was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation, stone, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into mission of human service and unitied into one single flame.

—ইহাই যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং শিষ্যের সম্বন্ধে সেই আশাই করিতেন, তবে তাহারই বা অর্থ কি? তিনি তাঁহার সেই পল্লী প্রান্তের ঘরখানিতে বসিয়া—গান, কীর্ত্তন, পুরাণ-প্রসঙ্গ, ভক্তিবিহ্বলতা ও ঘন ঘন সমাধি-অবস্থায় মগ্ন থাকিয়া—দুঃখের সে মূর্ত্তিকে দেখিলেন কি উপায়ে? তাঁহার প্রাণাধিক শিষ্যকে দুঃখের সে রূপ দেখাইবার জন্য তিনি এত অধীর কেন? আর সকলকে তিনি ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিতেন, তাঁহার অন্তরের এই মানবপ্রেম ও জগৎ-হিত-চিন্তার সম্যক পরিচয় তো আর কেহ পায় নাই! তাই, পারমার্থিক কল্যাণ বা ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম মনোভাব লইয়াই আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। কিন্তু নরেন্দ্রের উপরেই তাঁহার এই যে ভরসা, এবং তাহার বিবেকানন্দ-জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন্ প্রয়োজনে এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জগতে যে মহামন্বন্তর আজ আরম্ভ হইযাছে সেই মন্বন্তরের মুখেই তাঁহার সেই আবির্ভাব যে কত সময়োচিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। তথাপি জগতের এই আসন্ন মহাদুঃখ-দিনের সংবাদ তাঁহাকে কে দিয়াছিল? সেই কালেই জগৎময় অধর্ম্ম ও অন্যায়ের যে বিষবাষ্প মানুষের সংসারে ছড়াইযা পড়িতেছিল সে সংবাদই বা ওই বিদ্যাহীন সংসারজ্ঞানহীন গ্রামবাসী সরল ব্রাহ্মণ জানিলেন কোথা হইতে? কবির ভাষায় আমাদেরও কি বলিতে ইচ্ছা হয না—

> **Oh closed about by narrowing nunnery walls**
> **What knowest thou of the world, and all its lights**
> **And shadows, all the wealth and all the woe?**

কিন্তু ইহাই তো পরমাশ্চর্য্য! এইজন্যই, বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমবা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি'রূপের মধ্যেই যে কি প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাঁহাতে ওই দুইয়ের যে কি সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। ভগিনী নিবেদিতাও যে তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহাগুরুকে সর্ব্বদা দেখিতে পান নাই তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার দুইটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

Sri Ramkrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, halfnaked, orthodox, the ideal of the old time in India, suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in all its completeness. In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world.

—এ কথা অস্বীকার করিবে কে? সহজ দৃষ্টিতে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহাই তো সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তির বহির্ম্মুখ ওইরূপই বটে, কিন্তু বিবেকানন্দের অন্তর্ম্মুখ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন, "—the ancient light...might shine but it shone···", এই 'might shine'-টাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং ওই "but it shone" —উহার জন্যই সেই মহাপুরুষ এই বালককে দেখিবামাত্র—শুধু বুকে নয়, মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার দ্বারাই তাঁহার প্রাণগত কামনা সিদ্ধ হইবে, সে যেন সকল সিদ্ধিলাভের অধিক; পূর্ব্বোদ্ধৃত ওই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে তাঁহার প্রাণের সেই আশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। তাই যখন ভগিনী নিবেদিতার মুখেই আবার শুনি—

The sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole which has been the first result of the limelight irradiation of facts by the organisation of knowledge, had been made to him also as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry, for the past sixty years or more, are filled with the voices of our despair. A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it; this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath, shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Vae Victis! Woe to the vanquished!" Is this also the verdict of the Eastern wisdom? If so, what hope is there for humanity? I find in my master's life an answer to this question.

—যখন বর্ত্তমান মানব-সংসারের দুঃখ-দুর্গতির চিত্র ওই অতি-গভীর কথাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে; এবং যে পুরুষ-বীরের ললাটে তিনি স্বহস্তে গৌরবের মুকুটচূড়া ও শুভাশিসের মাল্যচন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেও যেমন মাথা আপনি নত হইয়া পড়ে, তেমনই ইহাও ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, বিবেকানন্দ যাহা সমক্ষে দেখিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বহু পূর্ব্বেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একজন চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়তো তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞান-চক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই, জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্রবিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিষ্যকে এমন একটি শ্যামল সজল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে;

এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্য্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্ত ধরণী শীতল হইবে। ওই 'Eastern wisdom'-এর পূর্ণ ঘনীভূত বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাহার সেই স্থিরতাকে, গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের অন্তরতর যোগের কথা এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আমি, বিবেকানন্দের চরিত-কথায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই আমরা জানিয়াছি, নরেন্দ্র কবে কেমন করিযা বিবেকানন্দরূপে দ্বিজত্ব লাভ কবিবেন—তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইযা যাইবে। এই প্রসঙ্গে মঃ রোলাঁর একটি উক্তি যেমন যথার্থ, তেমনই সংক্ষিপ্ত-সুন্দর; আমি তাহারই সূত্র ধরিয়া কাহিনীর এই অংশ সমাপ্ত করিব। তাঁহার সেই উক্তিটি এই—

But this consciousness of his mission only came and took possession of him after years of direct experience, wherein he saw with his own eyes and touched with his own hands the miserable and glorious body of humanity —his mother India in all her tragic nakedness.

আমি এইবার ওই "miserable and glorious body of humanity" এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথের সেই নবজন্মের কথা বলিব।

দশম অধ্যায়

নবযুগের মানব-ধর্ম্ম ও বিবেকানন্দ ; বিবেকানন্দের জগৎ-প্রীতি ও ভারত-প্রীতি

একটা কথা পুনরায় বলা আবশ্যক—আমি বিবেকানন্দের যে চরিতকথা বিবৃত করিতেছি তাহা বাংলার নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তির সম্পর্কে ; সে প্রবৃত্তি যে কি তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, কেবল এই প্রসঙ্গে, আমি যুগের অতীত যাহা তাহারও আলোচনা না করিয়া পারি নাই ; এমন আলোচনা পূর্ব্বেও করিয়াছি। এবার এই লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে একটু বেশি করিয়া সেই ধরণের আলোচনা করিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। নবযুগের মানবধর্ম্ম—মানবপূজা, মানবত্বের মহিমাবোধ প্রভৃতি নূতন ভাবস্রোতের উৎপত্তি ও বিকাশ, এবং সেই স্রোতো-ধারার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ—সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে তাহার নব নব অভিব্যক্তির ধারা ও ধরণ—আমার বর্ত্তমান নিবন্ধের মুখ্য বিষয়। মানুষের মহিমার সেই রহস্য-সন্ধান একবার আরম্ভ করিলে তাহার কি শেষ আছে ? যুগ, জাতি, দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াও, দেশে ও কালে তাহার প্রকাশ সীমাহীন ও বিচিত্র ; আবার যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহা ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিত্বই নৈর্ব্যক্তিককে যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই রহস্য-গভীর করিয়া তোলে। মানবতা বলিতে কোন তত্ত্ব বা ভাববস্তু নয়, কারণ, তত্ত্ব-মাত্রেই নিরাকার—জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাহার কোন মূল্যই নাই। ব্যক্তি বা বিশেষকে বাদ দিয়া একটা নির্ব্বিশেষে কিছুর ধ্যান যখন আমরা করি, তখনই বস্তুকে হারাই ; আমরা যাহাকে সার্ব্বজনীন বলি তাহা সৃষ্টির বহির্ভূত—আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা ধারণা মাত্র। আমি এই আলোচনায় তেমন কোন তত্ত্বকে বস্তুস্পর্শশূন্য করিয়া, ভাবকে রূপবিবর্জ্জিত করিয়া—তাহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছি না ; একটা জাতি ও একটা যুগের প্রতিনিধিরূপে এক এক ব্যক্তির সাধনায় সেই তত্ত্বের প্রকাশ যতটুকু প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, আমি তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি। এজন্য বিবেকা-নন্দের মধ্যেও—কেবল একটা তত্ত্ব নয়, তাঁহার যে ব্যক্তি-স্বরূপ—সেই সুগভীর মানব-তারই একটি বিশেষ রূপে, সকল তত্ত্বকেও যেন গৌণ করিয়া—এমন প্রবলতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাকেই প্রাধান্য দিতে চাই। বিবেকানন্দ নিজেও, তাঁহার সেই অতি উদ্ধত ও অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শকে নিজ আত্মার নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে নিজের জন্যই গোপন রাখিয়া, তাঁহার মানবীয় প্রেমকেই মর-জীবনে পূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন ; সেই প্রেমই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র প্রেরণা হইয়াছিল, এবং সেই প্রেম যে অর্থেই

আধ্যাত্মিক হউক (সে আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি), তাহা যে নির্ব্বিশেষ নয়—বিশেষ, নিরাকার-ধর্ম্মী নয়—সাকার-ধর্ম্মী, এবং সেইজন্যই তাহা জগৎ-সত্য ও জীবন-সত্যের সম্পূর্ণ অনুগত —ইহা লক্ষ্য করিলে, নবযুগের Humanism এই পুরুষ-অবতার মহা-প্রেমিকের জীবন-বাণীতে যে Gospel of Humanity-র রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুর দেহত্যাগের পর বরানগরের ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে যে একটি তরুণ ব্রহ্মচারীদল ধ্যান, তপস্যা ও কঠোর সন্ন্যাসের সাধন-চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহারই অভিভাবক হইয়া কিছুদিন স্থিরভাবে কাটাইয়াছিলেন ; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই উপরে এই ভাইগুলির ভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নরেন্দ্র এইরূপ শান্ত আশ্রম-জীবন সহ্য করিতে পারিতে-ছিলেন না, শীঘ্রই সর্ব্ব বন্ধন ত্যাগ করিবার—নামহারা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে, গন্তব্যহীন পথে ভ্রমণ করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল ; মাঝে মাঝে তিনি অল্পাধিক কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল, লোকালয় হইতে দূরে, একান্ত নির্জ্জনে, আত্মার নিঃসঙ্গতা—খাঁটি সন্ন্যাস-জীবনের পরম-সুখ উপভোগ করা। তবু কে যেন ধরিয়া আনে—প্রাণ বেশিক্ষণ সেই নিষ্প্রাণতার সাধনা সহ্য করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতাকে যেন জয় করিবার জন্যই একদা, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই, শেষ মমতাবন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া তিনি একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে আর এক কারণে ; তখন হিমালয়ের আলমোড়া প্রদেশে অবস্থানকালে এক দারুণ দুঃসংবাদ এতদূরেও পৌছিয়াছিল—তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ, এই ভগিনীকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন, বিবাহের পর শ্বশ্রূগৃহে অতিশয় দুরবস্থায় তাহার জীবনান্ত হয়। এ সংবাদে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি নিবিড়তর পর্ব্বত-গহনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিছুদিন কোন সংবাদই ছিল না। এই একটিমাত্র ঘটনাতেই বিবেকানন্দের মনুষ্য-হৃদয়ের যে পরিচয় আছে—সন্ন্যাসীর পরিচয়ও তাহাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। প্রেম যত বড়, যত উদার ও ব্যাপক হউক, তাহার মূলে দেহের আত্মীয়তা যেমন, তেমনই একটা সাকার বিগ্রহ থাকিবেই ; বিবেকানন্দের মানব-প্রেমও দেশ ও জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মহামানবের ধ্যানে চরিতার্থ হইতে পারে নাই ; স্পর্শ করিবার, স্পন্দন অনুভব করিবার মত একটা দেহ তাহার চাই ; যে-প্রেম সমগ্র মানব-জগৎকে বুকে করিবার জন্য বাহুবিস্তার করিতে পারে, সে প্রেম, অতি নিকট যাহা—তাহারই অধর, উরস বা চরণ-সরোজের পূজায় দুই চক্ষে আরতি-দীপ জ্বালাইবেই। যে মানুষকে ভালবাসে, সে স্বজনকে ভালবাসে নাই—যে বিশ্বকে সত্যই আত্মীয় জ্ঞান করে, সে আপন সমাজকে, আপন দেশকে মায়ের মত, প্রণয়ীর মত ভালবাসে নাই,

ইহা কখনওহই তে পারে না। বিবেকানন্দ দেশ-জাতি-নিরপেক্ষভাবে মানুষকে যে-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু সেই দৃষ্টির মূলে ছিল স্বজাতি-প্রেম; দেশকে এমন ভালবাসা বোধ হয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কেহ বাসে নাই। এইবার সেই কথাই আসিতেছে।

উপরে বিবেকানন্দ-জীবনের যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অল্পকালের মধ্যেই —১৮৯০-৯১ সালে, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর—হঠাৎ তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত প্রেরণা জাগিল। তখন তিনি হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিভূমির এক নির্জ্জন স্থানে সর্ব্ব-বিস্মৃতির ধ্যান-সুখ ভোগ করিতেছিলেন; যেন তাহারই প্রতিক্রিয়া-বশে সহসা সেই বিজনতার পরিবর্ত্তে এমনই সজনতার পিপাসা জাগিল যে, তিনি সেই হিমালয় হইতে পদব্রজে কন্যাকুমারী তীর্থে পৌঁছিয়া তথাকার মন্দিরে পূজা নিবেদন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত এই মহাদেশের ধূলি তিনি স্পর্শ করিবেন; যত মানুষের যত সমাজ যত গৃহ আছে সর্ব্বত্র অতিথি হইবেন—সেই বিপুল জনসাগরের কোন স্রোত কোন তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের অপরিচিত থাকিবে না! তাহাই হইল; পূরা দুই বৎসর পরিব্রাজকরূপে তিনি সেই মহামাতৃভূমির শীর্ষ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত তাহার বিরাট দেহের সকল দৈন্য ও সকল ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষ করিয়া, বেদনা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও করুণায়, এমন এক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা আর কোন সন্তান এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের চরম দীক্ষা; এতদিনে তিনি দ্বিজত্ব লাভ করিলেন—ইহার পরেই তাঁহার বিবেকানন্দ-জীবনের আরম্ভ, তাঁহার চরিত-বিকাশের তথা চরিত-কথার শেষ এইখানে।

বিবেকানন্দের জ্ঞান-চক্ষু পূর্ব্বেই উন্মীলিত হইয়াছিল, এইবার প্রাণ-চক্ষু উন্মীলিত হইল—সন্ন্যাসীকেও প্রেমে পড়িতে হইল। বিরাট ভারতবর্ষের খণ্ড-বিখণ্ড দেহে, নিজেরই প্রাণের সাহায্যে, তিনি এক অখণ্ড প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন। সেই মলিনবসনা, নিরাভরণার সর্ব্বদেহে তিনি "সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী"র রূপ অসংশয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই যে প্রত্যক্ষ করা ইহাই বিবেকানন্দের তপস্যার শেষ ফল। তিনি যে দৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই তপস্যালব্ধ শক্তিকে পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; সেই দৃষ্টিকে, ত্রিকালদর্শীর মত, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত তিন-কালের সাক্ষী করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের যতকিছু দুর্দ্দশা তিনি স্থির দৃষ্টিতে ও দৃঢ়চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কিছুমাত্র নিরাশ হন নাই। তিনি সেই যুগসঞ্চিত ভস্মস্তূপের তলদেশে ভারতের চিরঅনির্ব্বাণ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাবে নয়, স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—একেবারে বাস্তবের রূঢ়তম পরিচয়ের মধ্যে তিনি তাহার সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই

বাস্তব পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ না দিলে বিবেকানন্দের সেই দিব্যদৃষ্টিলাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না, তাই আমি সেই বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বিবৃতি ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। মঃ রোলাঁ এই ঘটনার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The great Book of life revealed to him what all the books in the libraries could not have done, which even Ramakrishna's ardent love had only been able to see dimly as in a dream......He was not only the humble little brother who slept in stables or on the pallets of beggars, but he was on a footing of equailty with every man, today a despised beggar sheltered by pariahs, tomorrow the guest of princes. Conversing on equal terms with Prime Ministers and Maharajas......ever teaching ever learning—gradually making himself the Conscience of India, its Unity and its Destiny."

"Everywhere he shared the privations and the insults of the oppressed classes. In Central India he lived with a family of outcast sweepers. Amid such lowly people who cower at the feet of society, he found spiritual treasures, while their misery choked him."

"He had traversed the vast land of India upon the soles of his feet...... When he arrived at Cape Comorin, he was exhausted, but having no money to pay for a boat to take him to the end of his pilgrimage, he flung himself into the sea and swam across the shark-infested strait ;......and when he had stepped on to the terrace of the tower he had just climbed at the very edge of the earth with the panorama of the world spread before his eyes, the blood pounded in his ears like the sea at his feet ; he almost fell......He had seen the path he had to follow. His mission was chosen."

ইহার পর ভগিনী নিবেদিতার উক্তি—

"When we read his speech before the Chicago Conference......we find ourselves in presence of something gathered by his own labours, out of his own experience. The power behind all these utterances lay in those Indian wanderings of which the tale can probably never be complete. It was of the first-hand knowledge, then, and not of vague sentiment or wilful blindness, that his reverence for his own people and their land was born. It was a robust and cumulative induction, moreover, be it said, ever hungry for new facts and dauntless in the face of hostile criticism......And more than this, it was the same thorough and first-hand knowledge that made the older and simpler elements in Hindu civilization loom so large in all his conceptions of his race and country."*

* এই দীর্ঘ ইংরেজী বচনগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া খুবই উচিত ছিল, কিন্তু পৃষ্ঠা সংক্ষেপের প্রয়োজনে উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিল না, সে জন্য ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের নিকটে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।—লেখক

দেশকে এমন করিয়া দেখা বোধ হয় আর কেহ দেখে নাই ; শুধু সেই দেহ হাত দিয়া স্পর্শ করাই নয়, ওই জ্ঞান ও ওই প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা একেবারে একাত্ম হইয়া এ যেন তাহার অন্তরের অন্তরকে দেখিতে পাওয়া ! এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিবেকানন্দ নামক যে পুরুষ এবং তাঁহার যে বাণীতে আমি একটা বৃহত্তর কালধর্ম্মের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মহাজীবনের এই মহালগ্নে ; সেই পুরুষের যে জ্ঞানী-আত্মা এতদিন বিদেহী ছিল, এইবার তাহা যেন মানবদেহ ধারণ করিল, সেই মানবই একাধারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানব ও ব্যূহ-মানব—Man ও Humanity। যাহা পরম সত্য বা Absolute—তাহা বর্ণহীন শূন্য—একটা নিরাকার ভাবময় সত্তা মাত্র ; সে সত্য সৃষ্টির বহির্ভূত, তাহা জগতের বা মানুষের ইতিহাসগত নয় ; সেই সত্যই যখন প্রেমের 'খাদ'-যুক্ত হয়, তখনই তাহাতে সৃষ্টির গঠন-কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে, নিরাকার ভগবান সাকার হইয়া উঠে। কিন্তু তখন ওই 'খাদ'কে অস্বীকার করিয়া, তাহার মলিনতার ত্রুটি নির্দ্দেশ যে করে, সে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করে। সেই Universal, সেই নির্ব্বিশেষ যখন বিশেষের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয় তখনই প্রেমের জন্ম হয়, এই নিয়ম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রেমের পক্ষেই সমান। বিবেকানন্দ মানুষের আত্মাকেই সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই আত্মার কোন দেশ বা জাতিভেদ নাই ; তাহাই পরম সত্য ; কিন্তু সেই সত্যের তত্ত্বমাত্রকে যে উচ্চ চিন্তা বা উৎকৃষ্ট রস-রূপে উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে মানুষের জীবনের মধ্যস্থলে কখনও আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—ভগ্নজানু দুর্গত মানুষকে আপন স্কন্ধে তুলিয়া উদ্ধার করিবার বাস্তব সমস্যা-সঙ্কটে সে কখনও পড়ে নাই। বিবেকানন্দ মানব-প্রেমের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, নিজের বুকে সেই প্রেম অনুভব করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইয়াছিল এবং নিজের জাতি ও দেশের দুরবস্থাই তাঁহাকে প্রেমের এমন অনুভূতি-ধনে ধনী করিয়াছিল। তিনি আগে, ভারতবর্ষ নামক যে মানবগোষ্ঠী তাহাকে আপন হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, এবং পরে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই ভরতবর্ষকেই পূজা করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের জন্য তাহার একটি অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে নিরাধার করিতে পারে ; প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে বদ্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীমা লঙ্ঘন করে। প্রেমের এই পরম রহস্য বিবেকানন্দের জীবনে যে-আকারে ও যে-মাত্রায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও জগৎ-প্রেমের সেই অপরূপ সমন্বয়ের কথা—তাহার অন্তর্গত সেই গভীরতর সত্যের কথা, অতঃপর আমি পূর্ব্বোক্ত

মনীষিদ্বয়ের উক্তির সাহায্যেই সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিব, কারণ, তেমন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বিবেকানন্দের সর্ব্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য এই দুই বিপরীত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে, নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম ; তাঁহার সেই কর্ম্মের অন্তরালে ভারত-বর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি ; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দ্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভোগ।" ভগিনীর নিজের ভাষায়—

"It was the personality of my Master himself, in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net. For, from the day that he met me at the ship's side till that last serene moment, when, at the hour of cow-dust, he passed out of the village of this world, leaving the body behind him, like a folded garment, I was always conscious of this element inwoven with the other, in his life."

"It was the personality of my Master."—বাক্যটি সত্যই অতি গভীর। অন্যত্র—

"He neither used the word 'nationality,' nor proclaimed an era of 'nation-making.' 'Man-making,' he said, was his own task. But he was born a lover, and the queen of his adoration was his Motherland...He was hard on her sins, unsparing of her want of worldly wisdom, but only because he felt these faults to be his own."

তিনি নিজে স্বামিজীর এই স্বজাতি-বাৎসল্যের সহিত তাঁহার মানবপ্রেমের সম্বন্ধ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"Like some great spiral of emotion, its lowest circles held fast in love of soil and love of nature ; its next embracing every possible association of race, experience, history, and thought ; and the whole converging and centring upon a single definite point, was thus the Swami's worship of his own land."

ভারতবর্ষকে ভালবাসার আরও কারণ ছিল—সে কারণ আরও স্পষ্ট। ভারতবর্ষই যে তাঁহার নিজের সেই জ্ঞান-চৈতন্যের জননী—তিনি যে তাহারই অমৃত-স্তন্যপানে আত্মার অনন্ত শক্তি ও অসীম আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন ; তিনি যে একান্তই সেই ভারতের

সন্তান, এ চেতনা তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। নিবেদিতাও তাহা বলিয়াছেন, যথা—

"Student and citizen of the world as others were proud to claim him, it was yet always on the glory of his Indian birth that he took his stand. And in the midst of the surroundings and opportunities of princes, it was more and more the monk who stood revealed."

সর্ব্বশেষে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সহিত বুদ্ধের তুলনা করিয়া বলিতেছেন—"খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকালে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র দুই বিভিন্ন মুখে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এক দিকে তাঁহার সেই ধর্ম্মের উৎস-মূল হইতে একটি প্রবল স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করিয়াছিল; সেই বাণী-প্রচারের ফলে প্রাচ্যমহাদেশে কত জাতির নবজন্ম হইয়াছিল—কত নব নব সমাজ, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল; কিন্তু আর এক দিকে, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে তাহার কাজ হইয়াছিল অন্যরূপ—

"The life of the Great Teacher was the first nationaliser. By democratising the Aryan culture of the Upanishads, Buddha determined the common Indian civilization, and gave birth to the Indian nation of future ages."

সেইরূপ বিবেকানন্দের মহাজীবনেও একই কালে দুইটি পৃথক অভিপ্রায়সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—"One of world-moving, and another, of nation making"। আমার মনে হয়, এই ঐতিহাসিক তুলনাটি বড় যথার্থ হইয়াছে, একটা অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বর্ত্তমানের ঘটনাটিকে সহজবোধ্য করিয়াছে। মঃ রোলাঁ একটি মাত্র কথায় বিবেকানন্দের এই স্বদেশপ্রেমের একটি বড় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"His universal soul was rooted in its human soil"। আমি নিজে এ সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি, এ যেন তাহারই ঘনীভূত নির্য্যাস। ওই "human soil" কথাটিই এ সম্বন্ধে আমারও আদি ও শেষ কথা। বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত-কথা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

একাদশ অধ্যায়

বিবেকানন্দের বাণী ; তাঁহার মানব-প্রীতির বিশেষত্ব ; কয়েকটি উক্তি।

"All great doctrine, as it recurs periodically in the course of the centuries, is coloured by reflections of the age wherein it appears ; and it further receives the imprint of the individual soul through which it runs. Thus it emerges anew to work upon men of the age. Every idea as a pure idea remains in an elementary stage, like electricity dispersed in the atmosphere, unless it find the mighty condenser of personality."

The Life of Vivekananda.—M. Romain Rolland :

বিবেকানন্দের চরিত-কথা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার বাণীর কিছু পরিচয় দিলেই আমার প্রয়োজন সমাধা হইবে। সে বাণীর বিশেষত্ব এই যে, তাহা কেবল ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি, অথবা, যাহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিভা বা মনীষা বলে—তাহারই জীবন-বিচ্ছিন্ন, বস্তুসম্পর্কহীন তত্ত্ব বা সত্য-প্রতিষ্ঠার বাণী নয় ; তাহাতে বাস্তব জীবনের গূঢ়তম ও বৃহত্তম সমস্যার সম্মুখীন সত্ত্বপরিত্রাণপ্রয়াসী এক অতিশয় শক্তিমান পুরুষের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম স্ফুরিত হইয়াছে ; বিবেকানন্দের জীবনও সেই বাণীকে সপ্রমাণ করিয়াছে। সেই সমস্যা মূলে এক হইলেও তাহার শাখা-প্রশাখা আছে, এই বাণীতেও তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। আমি বিশেষ করিয়া তাহার একটা দিকই লইব—যে দিকটির সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সাক্ষাৎ যোগ আছে, যে দিকটি তাঁহার বাণীর খুব প্রয়োজনীয় ও সার্থক দিক বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও দর্শনঘটিত নানা তত্ত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—সে সকলও তাঁহার বাণীর অন্তর্গত, চিন্তার দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কম নয়। কিন্তু মানব-ইতিহাসের এই মহাযুগান্তরকালে, তিনি নব জীবন-যজ্ঞের উদ্গাতারূপে যে প্রাণদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত 'বাণী' ; আমি সেই বাণীরই যথাসাধ্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষেই—এই অতি-দুর্গত, মোহগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত ও বহু-শৃঙ্খলিত মানবাত্মার দেশেই—সর্ব্বমানবের মুক্তিসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে ; এই দেশেই তাহার ক্রুশবিদ্ধ দেহের অবতারণ ও পুনরুত্থানের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে ; এই মহাশ্মশানই যে মানুষের সেই নবজন্মের সূতিকাগাররূপে ক্রন্দনশেষে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের দর্শন এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল—তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের চকিত দর্শন লাভ করিয়া, "যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—তাহারই

লোভে আর সকল লাভকে তুচ্ছ করিয়াছিল ; এবং অন্তরের অন্তরে সেই এক ভিন্ন আর কিছুকেই মূল্য দেয় নাই বলিয়া, পরমার্থ হইতে অর্থকে নিরতিশয় তিরস্কৃত করিয়া, অবশেষে এমন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে যে, তেমন অবস্থা আর কোন দেশে—তাহার সমতুল্য কোন মানবসমাজে—হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই, সেই উর্দ্ধতম সোপান হইতে নিম্নতম সোপান পর্য্যন্ত মানুষের উত্থান-পতনের চক্ররেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ গতি-চক্রের আবর্ত্তন অন্য জাতির জীবনে এখনও পূর্ণ হয় নাই ; এখানে তাহা হইয়াছে বলিয়া, মানুষের উচ্চতম অধিকার এবং চরমতম অধোগতির উপলব্ধি এই জাতির জীবনেই ঘটিয়াছে। এ জাতির জীবনের সেই দুই প্রান্তকে—বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ, এবং অতীতকে জাতিস্মরের মত অপরোক্ষ করিয়া, বিবেকানন্দ মানুষের অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। ঐ পশুবৎ-নিগৃহীত ধূল্যবলুণ্ঠিত, আত্মচৈতন্যহীন মনুষ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ—উহারা কি মানুষ? উহার কি সেই দেশ ও সেই জাতির বংশধর যাহারা অমৃতের জন্য পাগল হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর সর্ব্বমানবকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল? ইহারাই কি সেই মহাতীর্থের অধিবাসী—ইহাদেরই আদিকালাগত বংশধারা কি সেই গঙ্গোত্তরী ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে?—যাহার উদ্দেশে আধুনিক কালের এক অমৃতপিপাসু য়ুরোপীয় মনীষী আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—

Man must rest, get his breath, refresh himself at the great living well which keep the freshness of the eternal. Where are they to be found, if not in the cradle of our race on the sacred height, whence flow on the one side the Indus and the Ganges, on the other, the torrents of Persia, the rivers of Paradise?—(Michelet: *The Bible of Humanity*. রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের মুখ-পত্রে উদ্ধৃত।)

সেই জাতির সেই দেহের দিকে বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—কোন্ দৃষ্টিতে, তাহা বলিয়াছি। এক দিকে যেমন গভীর মমতায়, অপরিসীম অনুকম্পায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই, যেন তাঁহার ললাটের তৃতীয় নয়নে, এই দুর্গতির নিম্নাভিমুখী ধারার যুগ-যুগান্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সেই স্থির অপলক দৃষ্টি যতই গভীর হইয়া উঠিল, ততই যেন সেই দুই প্রান্তের ব্যবধান—সেই দেবত্ব ও পশুত্বের বৈসাদৃশ্য—লোপ পাইতে লাগিল। সোনায় কখন কলঙ্ক ধরে না, আত্মার কখন অধোগতি হয় না ; কালের ধারায় কেবল রূপবিবর্ত্তন হয়, তাহা বিবর্ত্তন মাত্র—পরিণাম নয়। এই বিবর্ত্তনকেই স্বীকার করিতে হইবে—পরিণামকে নয়। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, ঐ দেহ মৃত বা পতিত নয়—ঐ মোহ সাময়িক মূর্চ্ছা মাত্র ; বরং ঐ দেহেই আত্মার পুনর্জ্জাগরণ সুসাধ্য। ইতিহাসও মিথ্যা নয়—এক অর্থে তাহা সত্য ; তাহা সেই এক অবতারী আত্মার জাতি-যুগ-দেশ-ব্যাপী লীলাভিনয়

কাহিনী; তাহাতে, আত্মার বন্ধন নয়—তাহার স্বেচ্ছা বিহারের অসীম সামর্থ্যই সূচিত হয়। এই দৃষ্টির মূলে ছিল সেই ভারতীয় আত্মদর্শন; তাই আত্মার এই ঘোরতর লাঞ্ছনাও আত্মার সেই মহিমা'কেই এক উর্জ্জ্বল দীপ্তিতে অধিকতর দীপ্যমান করিয়া তুলিল। মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধ হইতে অধস্তল এমন এক পলকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার—সেই দুই সীমাকে এমন যুক্ত করিয়া লইবার অবকাশ ভারতবর্ষের মনুষ্য সমাজেই সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু বিবেকানন্দের এই যে 'মনুষ্য' বা 'মানবাত্মা'—ইহার স্বরূপ একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে, তাঁহার বাণীর মর্ম্ম, তথা মহামানব-বাদ, পরবর্ত্তী কালের নানা ভাব-চিন্তা ও মতবাদের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এক দিকে তিনি যেমন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক—'আত্মা' বলিতে এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বিশ্বাত্মায় বিশ্বাসী, তেমনই, 'মানুষ' বলিতে সেই 'আত্মার' বহু-বিচিত্র বিশেষ রূপকেও তিনি মানিয়া লইয়াছেন। মানবজাতি সেই এক 'পুরুষে'র সৃষ্টিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত অবয়বী রূপ; এই বিরাট অবয়ব যেমন একই আত্মার নিশ্বাস-বায়ুতে পূর্ণ, তেমনই ঐ সৃষ্টিও বৈচিত্র্যের রসরূপে সীমাহীন। এই বহুত্ব এই Particularity—না মানিলে সৃষ্টিও অবাস্তব হইয়া যায়। বিবেকানন্দ এই 'এক' ও 'বহু'কে সমদৃষ্টিতে দেখিবার মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুরুর নিকটে শ্রীরাম-কৃষ্ণের 'কালী'কে তিনি যে শেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ঐ 'একে'র দৃষ্টি যেমন জ্ঞানের দৃষ্টি, তেমনই ঐ 'বহু'র দৃষ্টিই প্রেমের দৃষ্টি; প্রেম যখন ঐ জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, তখনই এক-'মানুষ' ও সর্ব্বমানব,—এক জাতি ও সর্ব্বজাতি, সেই প্রেমে অভিন্ন হইয়া উঠে। এই Universal বা নির্ব্বিশেষ 'একে'র তত্ত্বে উঠিবার একমাত্র সোপান কিন্তু ঐ Particular; যে-দৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকে না—সেই দৃষ্টি বুদ্ধিজীবী তার্কিকের নাই; সেই অপরোক্ষ-জ্ঞান একরূপ অধ্যাত্মশক্তি-সাপেক্ষ। সাধক, কবি ও প্রেমিকের মধ্যেই ন্যূনাধিক মাত্রায় সেই 'বোধি'র পরিচয় পাওয়া যায়; এজন্য আধুনিক কালের কাব্য জিজ্ঞাসাতেও এই তত্ত্ব ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "Whoever grasps this particular grasps the universal also with it"—মহাকবি ও মহামনীষী গ্যেটের (Goethe) এই উক্তির ভাষ্যকার একজন আধুনিক কাব্য সমালোচক বলিতেছেন, "He is not speaking of the same universals and particulars as the logician." কারণ, সেরূপ কবি-দৃষ্টিতে, "another faculty than conceptual thinking is at work, Goethe was perfectly clear about that. What he was really saying is that in the true poetic activity of the mind the logical distinction between particulars and universals is ignored,

because it is invalid for that activity of mind"। ইহার পর এই সমালোচক যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার মত গভীর ও মূল্যবান কথা আর নাই—"In poetry, *qua* poetry, there are neither particulars nor universals, abstracts or concretes." ইহা শুধু কাব্যের তত্ত্ব নয়—জগৎ-ব্রহ্মের এই অভেদ-তত্ত্বই পরমতত্ত্ব বলিয়া, এতকাল পরে ভারতবর্ষে সেই পুরাতন বাণীই এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জ্ঞান ও প্রেম, কাব্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অস্তি-ভাতি ও নাম-রূপ—এক অখণ্ড সত্যের অধীন হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল থাকিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'বিশ্বমানব'-বাদ নামে এক অভিনব তত্ত্ব সুলভ কুলচুর-বিলাস ও অজ্ঞতামূলক প্রাজ্ঞতার পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বমানব' নামটার কোন দোষ নাই—বরং আমরা যে 'মানব'-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, ঐ নাম তাহার খুবই উপযোগী ; কিন্তু যে-অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে 'ভাবের ঘরে চুরি' আছে। একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক পণ্ডিত বোধ হয় উহারই অনুবাদ করিয়াছেন—'Cosmic Man', যদিও তাহার অর্থ ঠিক রাখিয়াছেন। বিবেকানন্দের Humanity যে অর্থে Universal, সে অর্থে Particular-ই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় ; তাহাতে বৈচিত্র্যও যত বেশি, সেই একের মহিমাও তত প্রকট ; 'অনেকে'র মধ্যেই সেই 'একে'র গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব—বিশেষই নির্ব্বিশেষের নামাঙ্কিত পাদপীঠ। কিন্তু ঐ 'বিশ্বমানব'—সর্ব্বমানবের একটা পিণ্ডীভূত সত্তা, একটা বর্ণহীন রূপহীন ভাবনির্য্যাস মাত্র। বিবেকানন্দের ধ্যান-ধৃত যে বিশ্বমানব—তাহা ইতিহাসের ধারায়, দেশ-কাল-পাত্রের নানা রূপে ও নানা অবস্থায় নিত্য নব-প্রকাশশীল ; তাই অতি প্রাচীন হইতে অতি-আধুনিক পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই বিচিত্র ও বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি Universal-এর চক্ষে Particular-কে দেখিতেন না, Particular-এর মধ্যেই Universal-কে দেখিতেন। এই দেখার দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিব। ইটালি-ভ্রমণকালে রোমের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসকল তাঁহাকে যেমন অভিভূত করিয়াছিল, তেমনই, খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের অভ্যন্তর-দৃশ্য ও উপাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় নাই—"He was profoundly touched by the memories of the first Christians and martyrs in the Catacombs, and shared the tender veneration of the Italian people for the figures of the infant Christ and the Virgin Mother" ; তেমনই, একবার ইংলণ্ড-যাত্রাকালে তাঁহার জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল, তখন, ঐখানে আফ্রিকা হইতে আরব-মূরগণের স্পেন-আক্রমণের সেই ঐতিহাসিক

দৃশ্য মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেই মুরগণের সহিত 'দীন্ দীন্-শব্দে' মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বড়ই যথার্থ, তিনি লিখিয়াছেন—

"That which emerges most clearly is his 'universal sense'—he had hopes of democratic America, he was enthusiastic over the Italy of art, culture, and liberty. He spoke of China as the treasury of the world. He 'fraternised' with the martyred Babists of Persia. He embraced in equal love the India of the Hindus, the Mahomedans and Buddhists. He was fired by the Moghul Empire."

তাঁহার জীবনচরিতকার *Life of the swami Vivekananda*, by His Disciples) লিখিয়াছেন—

"In Egypt he was specially interested in the Cairo Museum, and his mind often reverted, in all the vividness of his historic imagination, to the reigns of those Pharaohs who made Egypt mighty and a world-power in the days of old......And here in Egpt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience."

এই সকল হইতে বিবেকানন্দের "Universal Sense" যে কি অর্থে Universal তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই যে 'Book of Experience,' ইহা কিসের 'experience'?—কোন্ মানুষের পরিচয়-কাহিনী? 'বিশ্বমানব' যদি একটা ভাবগত বস্তু হয়—বাস্তব মানব-সত্তা হইতে কতকগুলি সাধারণ মানবীয় গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেইগুলির সমবায়ে গঠিত একটা নির্ব্বিশেষ আইডিয়াল বা মানস বিগ্রহকে 'বিশ্বমানব' নাম দিয়া, যদি তাহারই পূজা করা হয়, তবে তাহা এই Universal মানুষ নয়,—যে মানুষ এক হইয়াও বহু, যে মানুষ সর্ব্বত্র Concrete বা রূপময়। এজন্য ঐ 'বিশ্বমানব' নামটির অর্থ-বিভ্রাট নিবারণের জন্য আমি উহার নাম দিব 'মহামানব,' এবং ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিবার জন্য, ইহার একটা সাহিত্যিক ব্যাখ্যাও দিব।

মহাকবি শেক্সপীয়রের কবি-দৃষ্টিতে (কবিরও এই দৃষ্টির কথা আগে বলিয়াছি) এই Humanity বা মহামানবই কত অপরূপ রূপে ধরা দিয়াছিল! তাঁহার সৃষ্টি সেই ব্যষ্টি-মানবের অগণিত অনন্য-সদৃশ চরিত্ররাজিতে সেই এক মানুষই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কাব্যসমালোচক সেই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

It was Shakespeare's prerogative to have the universal which is potential in each particular, opened out to him, the *homo generalis*, not as an abstraction from observation of a variety of men, but as the substance capable of endless modifications.

এই *homo generalis*-ই সেই মহামানব—যাহা পিণ্ডীভূত সমষ্টির abstraction বা ভাবনির্য্যাস নয়, বরং এমন একটা বস্তু যাহার ব্যষ্টি-রূপের অন্ত নাই। তথাপি শেক্‌স্‌পীয়র particular-এর মধ্য দিয়াই সেই universal এর উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কারণ, উহাই খাঁটি কবি-কল্পনার জ্ঞানযোগ; এবং "whoever has a living grasp of this particular grasps the universal with it, knowing it either not at all, or long afterwards"। আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের পূর্ণযৌবনে—particular হইতে universal নয়, universal হইতে particular-এ তাঁহার কল্পনার আসক্তি লক্ষ্য করা যায়; তাঁহার সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। সেখানে কবি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই, যাহা সর্ব্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস—বিরাট প্রাণধারার সেই মূলাধার 'বসুন্ধরা'য় নিমজ্জিত হইয়া বহুত্বের—particular-এর রস আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন—

ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।···
···শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন রসে।

তার পর—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত; সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

—তথাপি এই ইচ্ছাও সেই দৃষ্টিসম্ভূত নয়, যাহাতে—"there are neither particulars or universals, abstracts or concretes"। ইহাতে universal-এর চেতনাই প্রবল ও মুখ্য—ইহা সেই শেক্‌স্‌পীরীয় দৃষ্টি নয়। কিন্তু এই সঙ্গে শেলীর কাব্যমন্ত্রের তুলনা করিলে আমাদের ঐ জগৎব্রহ্ম অভেদের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া

উঠিবে। শেলীর কল্পনা খাঁটি বৈদান্তিক—সর্ব্বপ্রকার Concrete ও Particular-এর বিরোধী। শেলীর আদর্শ-'মানুষ' সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-উপাধিমুক্ত 'মানবাত্মা'—

> The loathsome mask has fallen, the man remains
> Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
> Equal, unclassed, tribeless and nationless,
> Exempt from awe, worship, degree, the king
> Over himself; just, gentle, wise: but man
> Passionless;

—এই গুণগুলি সব একত্র অবস্থান করার উপায় না থাকিলেও, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, মানবাত্মার আদর্শ-হিসাবে ইহা চূড়ান্ত বটে; ইহাকে বিবেকানন্দের আদর্শও বলা যায়, আবার আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীর আদর্শও প্রায় এইরূপ বটে; কিন্তু সৃষ্টি-সত্যের কোনরূপ বোঝাপাড়া ইহাতে নাই—যাহা বিবেকানন্দের বাণীতে আছে; তাহার জন্য শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কোন মাথাব্যথাই নাই, কারণ শেলীর যাহা আদর্শ তাহাই বাস্তব; তাহাদের চিন্তাভিত্তিও শেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর ঐ আদর্শ বাস্তবনিরপেক্ষ হইলেও, শেলী বাস্তবের বাধাকে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্ষেপের অন্ত নাই। মানুষের দেহটাই তাহার আত্মার ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির একটা বড় বাধা; 'Chance and death and mutability'-র নিয়তি-নিগড় যদি না থাকত তাহা হইলে ঐ আত্মা—

> Might oversoar
> The loftiest star of unascended heaven,
> Pinnacled dim in the intense inane.

—এমন একটা ভাবনার প্রশ্রয় দিতে আধুনিক মহা-বস্তুবাদীরা শিহরিয়া উঠিবে, যদিও, আত্মহীন বস্তু যে- মানুষ, তাহার অধিকার-ঘোষণায় শেলীর কবিতার ঐ বিশেষগুলিকে আগ্রাহ্য করিবে না।

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত, এখন সেই 'বিশ্বমানব' ও এই 'মহামানব'-বাদের পার্থক্য-বিচার শেষ করিব। একটিতে দেহদশাধীন মানুষকে বাস্তব নিয়তি-নিয়মের বন্ধনে, বিশিষ্ট গুণে ও রূপে, নানা অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে; অপরটিতে দেশকাল প্রভৃতির ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার একটা ভাবরূপের ধ্যান মাত্র আছে; এজন্য এই অপরটিতে—বিশ্বমানবের ঐ মানস বিগ্রহ-পূজায়—মানুষহিসাবেই মানুষকে যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রতি প্রেমের যে বাস্তব-অনুভূতি—সেই বিশেষের প্রীতি নাই। বিবেকানন্দের বাণী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি; তিনি সকল জাতির সকল মানুষকেই একটা abstract, তথা universal মানবতার আইডিয়াল দ্বারা বিচার

করিতেন না ; প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই মানবতার বিশিষ্ট বিকাশকে বুঝিতে চাহিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। উপরে মূরগণকর্তৃক স্পেন-বিজয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দের যে ভাবোল্লাস হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার কারণ ইহাই। তিনি মূরগণের সেই ধর্ম্মোন্মাদ-প্রজ্বলিত বীরত্ব-বহ্নিকে তাহাদের জাতিসুলভ একটা গুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, তাহাতেও মানবতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার পরিব্রাজকবেশে কাশ্মীরভ্রমণকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি এক কৃষক-রমণীর কুটীরে জল চাহিয়াছিলেন ; পিপাসানিবৃত্তির পর তিনি গৃহস্বামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'মাঈ, তোমার ধর্ম্ম কি ?' তাহাতে সে এমন কণ্ঠে উত্তর করিল—'খোদাকে ধন্যবাদ —আমি মুসলমানী' যে, বিবেকানন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন ; তাহার কণ্ঠে ও মুখে-চক্ষে একটি শান্ত গভীর সাত্ত্বিক আবেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই সরল ভক্তির অন্তরালে একটি খাঁটি ভারতীয় মনোভাব রহিয়াছে ; সম্প্রদায় যাহাই হউক—রক্তের ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিবার নয়। এখানেও সেই একই কারণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের Humanism বা মানবপ্রীতিও যে কিরূপ—তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যেমন জাতি, যেমন সমাজই হউক—তিনি মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আমেরিকায় তাঁহার গাত্রবর্ণদৃষ্টে অনেকে তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেজন্য পথেঘাটে তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও সহ্য করিতে হইয়াছে। নিগ্রো-গণও তাহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বহুসম্মানে তাহাদের সমাজে আহ্বান করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে—তিনি একদিনের জন্যও তাহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দেন নাই। কেহ কেহ এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি সরোষে বলিয়াছিলেন, 'কি ! আমি মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া নিজের মান বাড়াইব !' একবার কথাপ্রসঙ্গে, কোনও আদিম অসভ্য জাতির পাথর-পূজা সম্পর্কে একজন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাতেও বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া সেই জাতির পক্ষ সমর্থন করেন ; সেই জাতির অপরিণত জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ঐরূপ আচরণ যে দূষ্য নয়, বরং উহাতে মানব-মনের শৈশব-সারল্যের এমন একটি কল্পনা ও বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে যে, উহাও শ্রদ্ধার যোগ্য—এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন—

"It was his love of Humanity, and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight.

There was the perpetual study of caste ; the constant examination and restatement of ideas ; and above all, the vindication of Humanity, never abandoned, never weakened, always rising to new heights of defence of

the undefended, of chivalry for the weak. Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man."

মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই প্রেম—ইহার মূলে, কেবল একটা বিশাল হৃদয় নয়, একটা বিরাট সত্যোপলব্ধি ছিল ; সেই সত্যও কোন শাস্ত্রবচন বা ভগবদ্বাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় ; যে তত্ত্বের উপরে তাহা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জ্ঞান তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। আমি এতক্ষণ সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছি ; সেই 'মহামানব'-বাদই মানুষের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দান। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে যে একটি অতি মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

"Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal ?" he was asked. "Yes," answered the Swami, "And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes."

—আইনষ্টাইনের Theory of Relativity- র তখনও জন্ম হয় নাই—এখানে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন-মীমাংসায় এক বেদান্তবাদী সেই তত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে !

বিবেকানন্দের এই বাণী শুধুই বাংলার নবযুগের বাণী নয়—পৃথিবীতে যে নবযুগ আসন্ন হইয়াছে তাহারই বাণী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা—বৈরাগ্যব্যাধিকে মানুষের মনের কোণ হইতেও দূর করিয়া এই জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস ইদানীন্তন কালে নানা আকারে দেখা দিতেছে ; মানুষের শুধুই দুঃখ মোচন নয়, এই জীবনেই তাহাকে স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়াছে,—আমার মনে হয় বিবেকানন্দই তাহার প্রথম প্রফেট বা প্রবক্তা। মানুষ যে পাপী নয়—তাঁহার গুরুর এই মহাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া, হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, এবং নিজের পৌরুষ-বিশ্বাসের অসীমশক্তি তাহাতে যুক্ত করিয়া, তিনিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন ; মানুষকে এমন দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। তাঁহার সেই মন্ত্র এক অভিনব শক্তি-মন্ত্র, মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করার মন্ত্র। তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads, and of the Upanishads, it is that one idea, *strength*"। এই শক্তিও মানুষের দুষ্প্রাপ্য বা সাধনলভ্য কিছু নয় ; সে তাহার birthright, তাহার আত্মার জন্মগত অধিকার—প্রাপ্ত-প্রাপ্তির মত। অতএব এই শক্তিলাভ কাল-সাপেক্ষ নয়, কোনরূপ শিক্ষার দ্বারা তাহাকে ধীরে

জাগাইতে হয় না ; চাই কেবল চরিত্র-বল—দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহাতেই দুর্ব্বলতার বন্ধনপাশ নিমেষে ছিন্ন হইয়া যাইবে। কবি শেলীর উক্তি যদি এই হয় যে, "Man has but to will it, and there shall be no evil in the world," তবে বিবেকানন্দের উক্তি হইবে "জগতে যত দুঃখ যত অমঙ্গলই থাক, মানুষ যদি বলবান বীর্য্যবান হয়, তবে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না"। বিবেকানন্দের নিকটে এই শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠজ্ঞান—অশক্তির নামই অজ্ঞান ; এই শক্তি হইতেই যে প্রেমের জন্ম হয় তাহাতেই মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন হয়। কবিদের চিত্তেও আর এক পথে যখন সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায় সেই দিব্য-দর্শনের আভাস দেন, সেও যেন এক একটি ঋক্‌মন্ত্রের মত—'the human face divine' ; 'They seek no wonder but the human face', অথবা, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ; ইহারই গভীরতর প্রেরণায় মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীও বলিয়া উঠেন—

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races".

এই শেষের কথাগুলিতে মানুষের নামেই এ যুগের 'তারকব্রহ্ম-নাম' রচিত হইয়াছে। অধুনা যে নূতন মানবকল্যাণবাদ প্রচারিত হইযাছে, তাহা যতই বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হউক —জগদ্ব্যাপী যে অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান, তাহার ঘোষণা এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ করে নাই ; সেই সমস্যাকেই বিবেকানন্দ সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এত গূঢ় ও ব্যাপক না হইলেও, তাহাতে জড়তত্ত্বের আস্ফালন অপেক্ষা মানুষেরই মাহাত্ম্য-বোধ ছিল—পূরা আধ্যাত্মিক না হইলেও তাহা অধ্যাত্মমুখী ছিল ; তিনিও মানুষের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষকেই সর্ব্ববিধ জাগতিক উন্নতির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল, বিবেকানন্দ তাহার বাস্তব-মূর্ত্তিকে আরও প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, কেবল উপায়-নির্দ্দেশ নয়—প্রতিকারের জন্য একটা কর্ম্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; তাহাই ছিল তাঁহার সকল বাণী ও সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সত্য বটে, এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি জগৎ ও জীবনের একটা পারমার্থিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতেও তিনি তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাত্মবাদকে মানবহিতবাদেরই অধীন করিয়াছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা মানুষের আত্মার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র ইহার বিপরীত ; সে মন্ত্র যেমন একান্তভাবে অনাত্মধর্ম্মী, এ মন্ত্র তেমনই আত্মধর্ম্মী ; প্রথমটিতে মানুষমাত্রের বাস্তবদশা-নিরপেক্ষ কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার্য্য নয়, এবং ভিতরের

সাম্য অপেক্ষা বাহিরের সমানাধিকারই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। তাহাতে দুঃখেরও কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহার অনুভূতি হয় দেহে—উহাও সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে ঘটিয়া থাকে; ঐ দুঃখদর্শনে যে দুঃখবোধ হয় তাহাও মিথ্যা, তাহাও অসুস্থ দেহের স্নায়বিক ব্যাধি মাত্র, অথবা প্রকারান্তরে একরূপ আত্মপূজা; এই 'আত্মা'ই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার আবরণ ও আশ্রয়। অতএব এই তত্ত্ব ও ইহার প্রযোগবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সমস্যার নিদান ও তাহার চিকিৎসা যতই বিসদৃশ হউক, এই সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং বিবেকানন্দেব জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম-মন্ত্রের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই। আজিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক মুক্তিসাধনার যিনি কর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম যেমনই হউক, কর্ম্মমন্ত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের এই বাণীমন্ত্রের অনুবাদ; অপরাপর ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বাঙালীও যে তাহা ভুলিযাছে. ইহাই আশ্চর্য্য! অতঃপর আমি বিবেকানন্দের কযেকটি বাণী উদ্ধৃত কবিব; তাহাদের ভাষা ইংরেজী, তথাপি সেই ভাষারও মূল্য আছে, কারণ সেই ভাষাতেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এমন পরিস্ফুট হইয়াছে যে, বাংলা অনুবাদে তাহার কিছুই থাকিবে না। তথাপি অনুবাদের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপস্থিত তাহার স্থানাভাব। বিবেকানন্দের ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্যক পরিচয এইরূপ বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টিতে মিলিবে না, নতুবা, তাঁহার ইংবেজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে সকলেই মঃ রোলাঁর সহিত একমত হইবেন; তিনি স্বামিজীর ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his ....without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero!

প্রথমেই বিবেকানন্দের এমন এক উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহাতে তাঁহার একটি অতিশয় মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে—

Oh how calm would be the work of one who really understood the divinity of man. For such there is nothing to do save to open men's eyes, All the rest does itself,

তাহার পর :—

He who does not believe in himself is an athiest.

* * *

One may desire to see again the India of one's books, one's studies, one's dreams. My hope is to see again the strong points of that India, reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The new state of

things must be a *growth* from within. (এই শেষের বাক্যটি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।)

* * *

And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intellectually and spiritually, reject as poison ; there is no life in it, it cannot be true.

* * *

Individuality is my motto, I have no ambition beyond training individuals.

* * *

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion, as Hinduism. Religion is not at fault, but it is the Phraisees and Saducees.

* * *

If your brain and your heart come into conflict, follow your heart.

* * *

Man never progresses from error to truth, but from truth to truth.

* * *

The greatest men in the world have passed away unknown. Silently they live and silently they pass away ; and in time their thougths find expression in Buddhas and Christs.

* * *

Fools put a garland of flowers around Thy neck. O Mother, and then start back in terror and call Thee "The Merciful." ("One realised the infinitely greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil *as well as* through good."—Sister Nivedita.)

* * *

The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in God.

* * *

Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flood spirituality, it will erupt.

* * *

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. (ইহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর পৃথিবীতে তথাকথিত কমুনিজ্‌ম জয়ী হইবে—রুশ জাতি এখনও তাহার সাধনা শেষ করে নাই। চীনও সবেমাত্র তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছে।)

As I grow older, I find that I look more and more for greatness in little things.........Anyone will be great in a great position, even the coward will grow brave in the glare of the footlights. The true greatness seems to me that of the worm doing its duty silently, steadily from moment to moment and hour to hour. (গীতার শ্লোকগুলি স্মরণীয়)

* * *

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man ! Be wicked, if you must, on a great scale !

* * *

A strong and true type is always the physical basis of the horizon. It is all very well to talk of universalism, but the world will not be ready for that for millions of years.

সর্ব্বশেষে আমি একটি অপূর্ব্ব কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—শুধু বাণী নয়, কাব্য-হিসাবেও ইহা অনবদ্য :—

Awake, arise and dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবেকানন্দ প্রচারিত মানব-ধর্ম্মের দুয়েকটি মূল তত্ত্ব ; সেই ধর্ম্মের ব্যবহারিক মূল্য বা সাধন-যোগ্যতা ; বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা—বঙ্কিম-যুগের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ : উপসংহার

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। যদিও সকল উক্তির মূলে এক কথাই আছে, তথাপি সেই একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি আরও কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম।—

It is better not to believe than not to have felt.

* * *

Unity is the test of truth. Love is truth and hatred is false, because hatred makes for multiplicity.

* * *

Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free, and you will be !

* * *

The East worships simplicity and herein lies one of the main reasons why vulgarity is impossible to any Eastern people.

* * *

As soon as you say, you are a little mortal being, you are hypnotising yourself into something vile and weak and wretched.

* * *

Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes.

* * *

Be like an arrow that darts from the bow. Be like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not murmur if it misses the target. The hammer does not fret if it falls in the wrong place. The sword does not lament if it breaks in the hands of the weilder. Yet there is joy in being made, used and broken ; and an equal joy in being finally set aside.

"Man has never lost his empire. The soul has never been bound"—ইহাই সেই বৈদান্তিক আত্ম-তত্ত্ব ; তথাপি ইহা যে কেবল তত্ত্বমাত্র নয়—জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া, যোগাসনে বসিয়া সেই তত্ত্বকে আত্মগত করাই যে পরম পুরুষার্থ নয়, বিবেকানন্দ তাহাই প্রচার করিয়াছেন ; সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎকে ধরিয়া মনুষ্যজীবন-রূপ শক্তিযন্ত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ

ব্যাপারে, বিশ্বাস—আত্ম-বিশ্বাসই—সর্ব্বশক্তির মূল ; জগৎ হইতে এ ধরণের বিশ্বাস প্রায় লোপ পাইয়াছে ; অথচ এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি তাহা আমাদের এযুগের কবিও একবার ভাব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

—'যখনি জাগিবে তুমি'—এই জাগাটাই যে সব ! ইহার জন্য চাই বিশ্বাস, তাই কবিও সেই বিশ্বাসকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—

এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

বিবেকানন্দ এই সত্যকেই একেবারে বাস্তব-জীবনের সাধনমন্ত্ররূপে, তাঁহার নিজেরই চরিত্র ও জীবনের দ্বারা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভবিষ্যৎ-বাণী অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মঃ রোলাঁ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমিও ইতি-পূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাও এখানে স্মরণীয়,—

His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost.

বিবেকানন্দও ইহাকেই উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, religion বা ধর্ম্মসাধনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিতেন,—"It is the whole soul changed into what it believes"। মনুষ্য-সাধারণ একই কালে একসঙ্গে এই পথে উঠিতে পারে না—এ পর্য্যন্ত কোন লোকশিক্ষক বা জগৎ-গুরু তেমন আশা করেন নাই। কিন্তু একজন পুরুষের মধ্যেও যদি সেই সত্য দিব্যদীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তবে আরও দশজন সেই জ্যোতির সান্নিধ্যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিবে ; এবং—"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves"। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের ভরসা ও বিশ্বাস। যে আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করে সে মানুষকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না ; তেমনই, এত বড় আত্মবিশ্বাসীকে দেখিয়া মানুষও আপনাকে বিশ্বাস করিতে শেখে। বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁহার সেই শক্তি-ঘন পুরুষ-সত্তা—dynamic personality ; সে যেন জড়ত্বকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার এক মূর্ত্তিমান ঘনীভূত চৈতন্য ! নহিলে এ বাণীর কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকিত না। ঠিক এই প্রসঙ্গে, সাময়িক-পত্রে উদ্ধৃত ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের একটি মন্তব্য চোখে পড়িল, তাহা, এই,—

The emergence of spirit from the bondage of nature is the desideratum in life's movement. But this emergence is a slow process ; the advent of a great soul by its spiritual influence can hasten the emergence, but a too swift process becomes fruitful in producing confusion and chaos.

—পড়িয়া মনে হয়, সরকার মহাশয় তত্ত্বহিসাবে যাহাকে স্বীকার করেন, তথ্য হিসাবে সে বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও হয়, তাই এত কথা লিখিতে হইতেছে। দার্শনিকের অপরোক্ষ-দর্শন নাই, তাই বিশ্বাসও নাই,—চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেই তিনি নিপুণ; 'মায়ার বিচিত্র বসনখানি'র মূল্য যাচাই করিয়াই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, তাহাকে কিনিয়া পরিবার বা টানিয়া ছিঁড়িবার —জীবন-রহস্য-সাগরে অবগাহন ও সন্তরণ-শেষে তাহার তলে পৌছিবার—শক্তিও তাঁহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু এইরূপ দার্শনিক চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন আছে,—জীবনের অকূল অগাধ বারিরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তাহারই তরঙ্গচ্ছন্দের সহিত নিজের প্রাণস্পন্দন মিলাইয়া সত্যের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা না থাকিলেও, চিন্তার সাহায্যে তাহার যে একটা পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার নিকটে পাইয়া থাকি—আমাদের মত মানুষের তাহাই একমাত্র সম্বল। তাই সরকার মহাশয়ের উক্তির একাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট; বাকিটা সত্য কিনা, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার মনে হয়, সরকার মহাশয়ের ঐ আশঙ্কার মূলে কোনরূপ ভূত-দর্শন বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে—তাহা বিবেকানন্দেরই সেই 'spiritual influence'-এর সদ্য ফলাফল-ঘটিত কি না জানি না; আমি নিজে এতখানি ভয় পাইবার মত ভূত-দর্শন করি নাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা আছে; আধুনিক যুগের সহিত যুক্ত করিলেও, আমি বিবেকানন্দকে আসন্ন ও অনাগত বৃহত্তর কালের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি।

বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম্ম-সাধনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন; 'মানুষগড়া'-(man-making)-ই ছিল তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। এই 'মানুষে'র সবচেয়ে বড় লক্ষণ—'manliness' বা পৌরুষ। অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্বহিসাবে ইহা হিন্দুর চিন্তায় নূতন নয়, পুরাতনই বটে; কিন্তু সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা যে কত নূতন, তাহা আশা করি, এত কথার পর আর বুঝাইতে হইবে না। বিবেকানন্দ যখন বলেন—"Fight always, fight and fight on, though always in defeat—that's the ideal," তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহাও সেই গীতার বাণী; তথাপি ইহার ভাষা ও ভাব দুই-ই যে নূতন, তাহাতে সন্দেহ কি? গীতায় আছে ভগবানে আত্মসমর্পণ—এখানে শক্তিও আমার শক্তি, কর্ত্তৃত্বও আমার। আবার বিবেকানন্দ যখন বলেন—

Worship Death ! All else is vain. That is the last lesson...Yet this is not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and *knows* there is no other alternative.

—তখনও তিনি চরম শক্তির আশ্বাসই দিতেছেন—অশক্তির নিরাশ্বাস নয়; ঐ চরম শূন্যতার মধ্যেই আত্মা যেন পূর্ণতায় টলমল করিতে থাকে! নিজের চরিত্রে ও জীবনে তিনি আত্মার এই যোদ্ধৃ-মনোভাব সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এ মনোভাব যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—বিবেকানন্দ 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝিতেন, ইহা যে তাহারই লক্ষণ—তাহার প্রমাণ এক সৈনিক-কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে মিলিবে; এমন আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই—

We have built a house that is not for Time's throwing,
We have gained a peace unshaken by pain for ever.
War knows no power. Safe shall be my going,
Secretly armed against all death's endeavour;
Safe though all safety's lost; safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের এই বীর মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া শেষে বলিযাছেন—"Both victory and defeat would come and go. He was their witness"—আবার সেই গীতা। বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিও এখানে স্মরণীয় —"Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside"; উপরি-উদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলির ভাবার্থ একই।

এইজন্য বিবেকানন্দেব একমাত্র সাধন ছিল, "Individuality"—মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তিব উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব্যক্তির আত্মাভিমান নয়, পূর্ব্বে সে আলোচনা করিযাছি। এ সম্বন্ধে এক মহামনীষীর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

> আপনারা Individualism বলিয়া একটি কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড করা, যাবতীয় নিয়ম ও সংযমের, আচাবের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: রোমান রাষ্ট্রনীতিমতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্যজীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিমদেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে; ফলে, বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি, গার্হস্থ্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে; কিন্তু বেদপন্থীর স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে আমি যত বড়, অন্য কেহ এত বড় নহে—হইতে পারে না।

বৃহদারণ্যক স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই,—"পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা"—আমার অন্তরের ভিতর এই যে আমি, সেই আমি পুত্র, বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহার চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দস্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইহার সোয়াস্তি হইতে পারে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ, এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে সকলেই আমার পর, আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া, চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই করিতেছে।··· আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic process-এর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎটাকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার আবর্জ্জনার ক্লেদে জগৎটাই পূর্ণ হইয়া উঠে। এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন তাহার সহিত এই cosmic process-এর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic process-কে পরাভূত করিয়া ethical process-কে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম।···

প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য-পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে, সে কেবলই না—না—না—না, বলিতেছে।······ইনিই সেই আসল মানুষ, প্রজাপতি—যিনি 'চরতি গর্ভে অন্তঃ'। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বযজ্ঞে আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ—এবং ত্যাগের দ্বারা মেলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া, পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই; এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি Individualism; কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে—পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, পৃঃ ১৭৮-৮০]

এই যে আত্মোপলব্ধি বা স্ব-মহিমার দিব্যানুভূতি—যাহাদের ইহা হইয়াছে, তাহারাই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়াছে। কিন্তু সেই অসীম আত্মস্ফূর্ত্তির এমনই গুণ যে, সে অবস্থায় আত্মা স্ববশেই বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পূর্ণতাপ্রাপ্তিকেই তাহার প্রকৃত Individuality বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তবু সেই এক প্রশ্নের উত্তর চাই—আত্মার এইরূপ সম্প্রসারণ কি সাধারণভাবে আদৌ সম্ভব? বিবেকানন্দ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেন করিতেন তাহাও বলিয়াছি,—সে বিশ্বাস তাঁহার নিজের আত্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস, কেবল জ্ঞান-বিচারের বিশ্বাস নয়। একজন মানুষের পক্ষেও যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে সকলের পক্ষেও অন্তত অসম্ভব নয়। পদার্থমাত্রেই যে অগ্নি বা বৈদ্যুত প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে প্রকট কবিবার উপায় চাই। ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে, সেই প্রেরণা সঞ্চার করা সাধ্য ও সম্ভব; আত্মার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যক্তির জীবন বা জাতির জীবনে যাহা দৈবাৎ নৈমিত্তিকভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে নিত্য করিযা তুলিবার পন্থাও আছে—বিবেকানন্দ সেই পন্থার প্রদর্শক। ব্যক্তির পক্ষে এমন জাগরণ যে সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াছি; কলিকাতার রাজপথে ড্রেনের গহ্বরে নফর কুণ্ডুব সেই আত্মবিসর্জ্জনেব ঘটনা এখনও ভুলি নাই। একজন অতি-সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মার সেই দিব্যপ্রকাশ নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে, জাতিগতভাবে, তাহারই আর এক প্রকাশ আর এক-রূপে দেখিলাম; সেই অতি-প্রবুদ্ধ আত্মাই ষ্টালিনগ্রাডের গগনস্পর্শী জ্যোতিঃশিখায় সারা ইউরোপ আলোকিত করিয়াছে; সেই শক্তি, সেই বীর্য্যও কম আধ্যাত্মিক নয়,—অনাত্মবাদী নাস্তিকেরা তাহার যে অর্থই করুক, সে দৃশ্য দেখিলে বিবেকানন্দও আনন্দে আত্মহারা হইতেন। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর এই বাণী, শুধুই জীবনের ঘটনায় নয়—সাহিত্যিক কবি-সাধকের ধ্যানেও ধরা দিয়াছে, সে প্রমাণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি, চিন্তাবিষ-জর্জ্জর ম্যাথু আর্নলড ইহাকেই আত্মার একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া একজন মনীষী সমালোচক বলিতেছেন—

To be oneself, to possess one's own soul,—this, Arnold knew, was the necessity; if this could be achieved, belief could be achieved and an end of perturbation.

> **"Resolve to be thyself; and know that he**
> **Who finds himself loses his misery."**

রুশ সাহিত্যিক চেহভের (Anton Tchehov) এই কথাগুলিও বিবেকানন্দের সেই বাণীমন্ত্রের অনুরূপ—

I believe I see salvation in individual personalities scattered here and there all over Russia—whether they belong to the intelligentsia or to the peasants.

ইহার পরেই বলিতেছেন—

This feeling of personal freedom is the mark of the true and completed individuality. Such individuals are the pioneers of humanity, and on them the future of true civilisation does indeed depend.

এ যেন বিবেকানন্দের ভাষায় বিবেকানন্দেরই বাণী! রুশীয় মনীষী যাহাকে তথ্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে তাহার গভীরতর তত্ত্বও উদ্ঘাটিত হইয়াছে; চেহভ যাহা অনুমান করিয়াছেন, বিবেকানন্দ মন্ত্রদ্রষ্টার মত তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইযাছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিযাছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই এক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া·গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না; অতএব এখনস কল প্রশ্নই বৃথা।

কিন্তু বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবযুগের সহিত বিবেকানন্দের বাণী নিঃসম্পর্কিত নয়। সে যুগের ভাবধারার যে গতি ও প্রবৃত্তির আলোচনা আমি এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বিবেকানন্দে আসিযাই একরূপ শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাঁহার বাণী সেই যুগকে যতই অতিক্রম করুক, ধারা সেই একই—কেবল কূল ছাপাইয়াছে মাত্র। সে যুগের সমস্যা ছিল মুখ্যত বাংলার, এবং গৌণত ভারতের; বাঙালীর প্রতিভাই সেই যুগকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া, জীবনের একটা নূতন অর্থ—একটা নূতন পথও পাথেয়-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্যা কি তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সমাধানে কল্পনা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় বঙ্কিমের প্রতিভাকে সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল, এবং তাহাতে সেই যুগ যে তাহার সকল প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া বাঙালীর চিত্তে, তথা সাহিত্যে, প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাতি-হিসাবে বাঙালীর যে নব-জাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল তাহার নিদর্শন—বঙ্কিম-সাহিত্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেই বিবেকানন্দের সহিত সে যুগের সম্পর্ক কতটুকু ও কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দুইটি বিষয়ে উভয়ের মিল খুব স্পষ্ট—প্রথম, প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয় বা যোগস্থাপন; দ্বিতীয়, স্বজাতি-সমাজের চৈতন্য-সম্পাদন। প্রথমটির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রয়াস তাহাতে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—ভারতীয় জ্ঞানগরিমা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার মূলে ছিল—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব; তিনি ভারতীয়

সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাই করিয়া। এজন্য, তিনি যে নবমানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিকতাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, তিনি পারমার্থিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—যুগের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইয়াছিলেন; যুগ ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তব। হাতের কাছেই যে উপাদান আছে, তাহা দ্বারা প্রযোজন-অনুযায়ী একটা কিছু গড়িয়া লইতে হইবে, কবি ও মনীষী বঙ্কিম ইহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অথচ বঙ্কিম যে কতবড় আদর্শবাদী ছিলেন তাহাও আমরা জানি; সেই আদর্শকেই বাস্তবের অধীন করিবার যে শক্তি, তাহাই বঙ্কিমের সৃষ্টিশক্তি; এই সৃষ্টি-শক্তি তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কবিকর্ম্মে যেমন, জ্ঞান-গবেষণার কর্ম্মেও তেমনই—পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপকরণ যত সামান্য হউক, আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক, বাস্তবে ও কল্পনায় যতই বিরোধ থাকুক, তথাপি তাহারই সাহায্যে একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ-মীমাংসায় তিনি আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; একের গৌরব-উদ্ধাবেও অপরের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র; তিনি য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধনার বৈশিষ্ট্য ও মূল্য স্বীকার করিলেও, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন, এবং উভয়কে পৃথক রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিও অবজ্ঞা করেন নাই এবং বঙ্কিমের মতই তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং জ্ঞানকে সপ্রতিভ রাখিবার জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকার কয়িরাছেন; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তত্ত্বকে ভারতীয় সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি 'এভল্যুশন'-বাদ মানিতেন না—বঙ্কিম প্রায় পূরাপূরি মানিতেন। তিনি আত্ম-তত্ত্বকেই সকল তত্ত্বের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া, যে 'progress' বা 'প্রগতি'র সংস্কার য়ুরোপীয় চিন্তায় বদ্ধমূল, তাহাতেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; একবার ভগিনী নিবেদিতার একটি অভিযোগের উত্তরে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That's because you cannot overcome the idea of progress, but things do not grow better.. They remain as they are, and we grow better by the changes we make in them."—ইহা সত্যই বড় ভয়ানক কথা!

এ সম্বন্ধে আমি খাঁটি হিন্দু মনোভাবের আর একটু পরিচয় দিব—পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা আরও ভয়ানক। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-সাধন নয়—হিত-সাধনই হিন্দু চিন্তায় অনুমোদিত। ওই উন্নতির একটা মাপকাঠি অনুসারে, জাতি বা ব্যক্তিসকলের উচ্চ

নীচ-ভেদ হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী। নবপ্রকাশিত একখানি অভিনব ও উপাদেয় বাংলা পুস্তক হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিব—প্রত্যেক সত্যপিপাসু ও আত্মজিজ্ঞাসু শিক্ষিত বাঙালীকে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি—বর্ত্তমান যুগে এই ধরণের পুস্তক 'টনিকে'র মতই স্বাস্থ্যকর। পুস্তকখানির নাম—'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ', গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে এক অঘোরী তান্ত্রিকের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; তাহাতেই স্পষ্টই দেখা যাইবে—আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ উন্নতিবাদ ভারতীয় সাধনার একটা মূলতত্ত্বের বিরোধী। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না ; তাহা হইলে, তিনি কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গী উদাসীন হইয়া শ্মশানে বা গিরিগুহায় বাস কবিতেন।

> "তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি ; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যেমন তার সেই রকম ভোগ আব কর্ম্ম এখানে চলবে ত?···লোকচক্ষে—অন্ততঃ তোদের মত লেখাপড়া-জানা বাবুলোকদের চক্ষে হয়ত তা খারাপ ঠেকবে, কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে।···
>
> একটা কথা মনে রাখবি, কখনো ভুলিস নি ;—কারও উন্নতি বা অধঃপতন নিযে বিচার করতে যাস্ নি, আর প্রচারও করিস নি কখনো,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে যা কিছু দেখবি বা শুনবি তার থেকে একটা মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস—যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে—তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী, মহৎ ব'লে তুই যাদের কর্ম্মের কতকটা দেখেছিস তাদেরও যে রকম—অজ্ঞান, হীনবুদ্ধি, মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত ব'লে যাদের দেখছিস, তাদেরও সেই রকম—সকলকারই এক একটা আলাদা পথ আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে—আপনাকে প্রকাশ করছে।"
> (পৃঃ ২২২)

অতএব মূল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন সত্যকার রফা হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দ বুঝিতেন। তথাপি য়ুরোপের বিশিষ্ট সাধনাকে শ্রদ্ধা করিতেও কোন বাধা ছিল না ; প্রত্যেকের পথ পৃথক হওয়াই তো স্বাভাবিক ; যাহার যে পথ সে সেই পথেই অগ্রসর হউক—শেষে সেই এক তীর্থেই পৌছিবে। তথাপি বিবেকানন্দের এ অভিমান ছিল যে, সে তীর্থ ভারতেই আছে,—শেষে সকলকে সেখানেই পৌছিতে

হইবে। এরূপ অভিমান বঙ্কিমেরও ছিল ; কিন্তু তিনি উপস্থিত একটা রফা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বিবেকানন্দের মত এত বড় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না,—কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়া একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের উপরে বহুকাল ধরিয়া যে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তাহা কাটিয়া দূর করিবার একমাত্র অস্ত্র—য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ; তাহা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মতি-গতি হইয়াছে তাহাকেও যথাসম্ভব অনুকূল রাখাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না ; ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

To his mind Hinduism was not to remain a stationary system, but to prove herself capable of embracing and welcoming the whole modern development . .... Above all, she was the holder of a definite vision, the preacher of a definite mission among nations.

—অর্থাৎ, এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ নাই যাহার সহিত হিন্দু-চিন্তার রফা করিতে হয় ; তাহা এমনই সর্ব্বাশ্রয়ী যে, কিছুরই সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না, তাহার মত করিয়া সে সকলকে হজম করিয়া লইবে ; এবং তাহার যে নিজস্ব সত্য-সম্পদ—যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি আছে—তাহাই সে জগৎকে দান করিবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সহিত বঙ্কিমের মতভেদ ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি ও সাধন-রীতিতে বিশ্বাস-ঘটিত তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়—স্বজাতির উদ্ধার-সাধন। এখানেও উভয়ের বাসনা এক হইলেও, আদর্শ এক ছিল না। এই উদ্ধার-সাধন বিবেকানন্দের নিকটে কোন পৃথক সমস্যার মত ছিল না ; তাহার জন্যও তিনি সেই একমন্ত্র—আত্মার মুক্তিমন্ত্র ছাড়া, আর কোন উপায় চিন্তা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাজাত্য-সাধনাকেই জাতির মুক্তিলাভের অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া—ভারতবর্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন—সেই জাতীয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ও উদারতর, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি বিবেকানন্দের সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনা এবং এই সাধারণ মানবধর্ম্ম-সাধনার একত্র বিচার করিয়া মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

This message of energy (বিবেকানন্দের) had a double meaning ; a national and a universal. Although for the great monk of the Advaita, it was the universal meaning that predominated, it was the other that revived the sinews of India. (ইহা আমরাও জানি ; অন্ততঃ বাংলাদেশে—জাতীয়জাগরণের এই আদি অরুণোদয়ের দেশে...বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী বিবেকানন্দের মন্ত্রে অধিকতর শক্তি লাভ করিয়াছিল)। There was ground for fearing that its high spirituality would be twisted to the profit of a purely animal pride in race or nation, with all its stupid ferocities.

কিন্তু তাহার পরেই বলিতেছেন—

But how else was it possible to bring about within the disorganised Indian masses a sense of human unity, without first making them feel such unity within the bounds of their own nation?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ইহাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'-গানের উদ্দিষ্ট দেবতা যে ভারতভূমি নয়—বঙ্গভূমি, ইহাতেও তাঁহার বাস্তব-দৃষ্টি, মানব-চরিত্র ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে! প্রেমের উদ্দীপন, বাস্তবের ক্ষেত্রে, অতিশয় নিকট বস্তুতেই হইয়া থাকে; স্ব-সমাজ ও স্বজাতি আগে, বৃহত্তর সমাজ পরে, এ তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ভালরূপই জানিতেন। বিবেকানন্দের প্রেম কত বড় ও গভীর ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ভারতীয় সাধনার প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ, তাই ভারতীয় জনগণের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া তিনি সমগ্র ভারতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতএব এই দুইজনের ব্রত যে দুইরূপ—তাহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কারণ, একজন ছিলেন সন্ন্যাসী, আর একজন সমাজধর্ম্মী গৃহস্থ। এই দুই ধর্ম্মই সত্য—এক অপরের পরিপূরক মাত্র। এ বিষয়ে সে যুগের এক মনস্বী বাঙালী-লেখকের উক্তি বড়ই যথার্থ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এই দুই-ই যে সমান সত্য ও সমান আবশ্যক, এই উক্তি যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে।—

"তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, undefined and indefinite units, অর্থাৎ নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোন সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় হইবে না—দ্রাবিড়ের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারত-ব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও; পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী ও যতি-সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

এ চিন্তা এ ভাবনা এ যুগে একেবারে 'out of date' হইয়াছে—বাঙালীরও চিন্তাশক্তি আর নাই; তাহার কারণ, সত্যকার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও আর নাই; নহিলে কংগ্রেসপন্থী বাঙালী ক্রমেই এত দুর্ব্বল ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবে কেন?

'The Bengalees have ceased to think.'—শ্রীঅরবিন্দ

আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। দুইজনেই 'পলিটিক্‌স্' বা রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন, আজিকার দিনে ইহা বড়ই

অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। একজনের মতে উহা ধর্ম্মই নহে, আর একজন উহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনরূপ মন্তব্য করা শোভা পায় না ; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল আমরা ক্রমে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা যে এখনও আমাদের ধাতুগত হয় নাই, বরং তাহার ফলে আমাদের শক্তি অপেক্ষা অশক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি—মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। কেবল ইহাই লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ে এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারার ঐক্য আছে। তারপর, এ যুগের যাহা প্রধান প্রবৃত্তি—যাহা এই যুগেরই নবধর্ম্ম—সেই Humanity বা মানব-পূজা, বা মানবাত্মার মহত্ত্ব-বোধ উভয়কেই সমান অনুপ্রাণিত করিয়াছে ; বঙ্কিমে যাহার প্রথম পূর্ণ ও সজ্ঞান উপলব্ধি, বিবেকানন্দে তাহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "We Indians are MAN-worshippers. Our God is man"—বিবেকানন্দের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়,—বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' এই 'মানব-ভগবৎ'-বাদের একটি সুনিপুণ ভাষ্য মাত্র। কেবল একটা বিষয়ে দুইয়ের দৃষ্টিতে প্রভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্ম্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইযাছে, এবং সেই জন্য পূর্ণ-মনুষ্যত্ব-লাভকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ব্ববৃত্তির অনুশীলন-সাপেক্ষ কবা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম ব্যতিরেকেও, তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেও, অন্য উপায়ে মানুষের আত্মা যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনু-শীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'Individuality') বিশ্বাস করিতেন না ; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না ; চরিত্র-বলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দের 'Doc-trines of Culture' তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristocrat নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy, আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও চূড়ান্ত।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ সেই যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র—তাহার সেই ধারাকে তটবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে পৌছাইয়া দিয়াছেন।

বিবেকানন্দও সেই যুগেরই সন্তান, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতিতেও সেই যুগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ; তাঁহার বালক-বয়সের সেই বিদ্রোহী মনোভাব সেই যুগেরই লক্ষণ। কেবল তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রে যে অসাধারণ পৌরুষ সুপ্ত ছিল—শ্রীরাম-কৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে তাহা এমনই স্ফুরিত হইয়াছিল যে, তিনি অনায়াসে যুগকে অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর দেশে ও কালে আপনাকে প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেকালে ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—বিবেকানন্দের পক্ষেও নয় ; কারণ, ইহা ঐতিহাসিক কালধর্ম্মে—বা স্বভাবের নিয়মে—ঘটে নাই। তথাপি, ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বাঙালী—উভয়ের প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা ; উভয়ে একই যুগের একই জল-মাটির মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই জল-মাটির বটে (বাঙালী না হইলে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের রস-রসিকতা সম্ভব হইত না), কিন্তু তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-চেতনা এই যুগাতীতের স্পর্শ লাভ করে নাই—বিবেকানন্দের করিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বাঙালীর ধাতুগত সেই শাক্ত-সংস্কার জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও, একজনের সংস্কার খাঁটি, আর একজনের তেমন খাঁটি নয়—মিশ্র। বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে—লীলায় নয়—সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়া, বন্ধন-ছেদনের আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্যই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া—আত্মার কর্তৃত্ব-শক্তির (dynamic energy) জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, খাঁটি শাক্তের মত, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাহারই পথে, পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে আরোহণ করাকেই সহজ ও সাধ্য মনে করিয়াছিলেন। একজনের সাধন-পীঠ—আত্মা, আর একজনের—দেহ ; একজন মৃতকেও জাগাইবার জন্য ডাক দেন—"Lazarus come forth !", আর একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্য তাহার দেহে বৈদ্যকশাস্ত্র অনুসারে তাপসঞ্চারের চেষ্টা করেন ; একজনের মতে—"The soul is the cause of the body", আর এক-জনের মতে—"The body is the cause of the manifestation of the force we call the soul" ; যদিও ঐ 'soul' উভয়ের নিকটেই সমান সত্য। তথাপি উভয়েই শাক্ত ; বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্ম্মকে 'dynamic religion' বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই dynamism-কে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের ভিত্তি করিয়াছেন ; প্রভেদ এই যে, একজন প্রকৃতিপন্থী হইলেও যুক্তিবাদী, অতিশয় নিয়মতান্ত্রিক, তাই 'morality'র উপরে উঠিতে পারেন নাই ; আর একজন অধ্যাত্মবাদী, তাই সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু ; তাঁহার ধর্ম্মে, আত্মা আত্মা-ছাড়া আর কিছুরই বশীভূত নয় ; morality প্রভৃতি 'custom' মাত্র—'character'ই সব। কিন্তু কেহই বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কথা বলেন নাই ; 'পথ-চলার আনন্দ' নয়—পথ-চলার দারুণ বাধা-বিঘ্ন বিপদ-বিভীষিকাকে অপসারিত করিবার যে শক্তি, তাহার সাধনাকেই একমাত্র সত্য-সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই তত্ত্বের রস রূপ ট্র্যাজেডির আকারে প্রকটিত করিয়াছেন; বিবেকানন্দও 'মায়া'কে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, বরং সেই মোহিনী তাঁহার বাঙালী প্রাণকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়াছিল, নতুবা, তিনি এত বড় প্রেমিক হইতে পারিতেন না। মঃ রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দেব নূতনতর মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিবার ছলে লিখিয়াছেন—

Nothing in the world is to be denied, for, Maya, illusion, has its own reality. We are caught in the network of phenomena. Perhaps it would be a higher and a more radical wisdom to cut the net, like Buddha, by total negation and to say: "They do not exist" But in the light of the poignant joys and tragic sorrows, without which life would be poor indeed, it is more human, more precious to say: They exit. They are a snare.

—বাঙালী কবি ও বাঙালী সন্ন্যাসী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; "They exist. They are a snare"—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও এই আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতএব, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা মাত্রাগত; বিবেকানন্দ বঙ্কিম-যুগের প্রবৃত্তিকে বিপরীতগামী করেন নাই, তাহার সেই ধারাকেই সহসা এক গভীরতর খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

* * *

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল একটি কথা এখনও বাকি আছে। বিবেকানন্দেব বাণীই যে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে কিছু পরিমাণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, সে বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত; কিন্তু এই জাতি এতই সত্য-ভীরু বা পাপ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সাধনার ক্ষেত্রেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্বীকার করে না। বাঙালী ডুবিয়াছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্রও ডুবিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষ তো জাগিয়া উঠিতেছে; সেই জাগরণের অন্ততঃ দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী এখনও কার্য্যকরী হইয়া আছে। তথাপি বিবেকানন্দের প্রতিও সেই মনোভাবের কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে? মহাত্মা গান্ধী যে কখনও বিবেকানন্দের নাম করেন নাই এমন নহে; তথাপি একজন বিদেশীকেও দুঃখ করিয়া বলিতে হইয়াছে—

It is regrettable that the name the example and the words of Vivekananda have not been invoked, as often as I could have wished, in the innumerable writings of Gandhi and his disciples.

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই,—বিবেকানন্দ যে বাঙালী! কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস হইতে বাঙালীর কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিবার এত আগ্রহ যাহাদের তাহারা সত্যাগ্রহী

হইতে পারে, কিন্তু সত্যবাদী হয় কেমন করিয়া? আমার এই কথাগুলি অনেক বাঙালীরও ভাল লাগিবে না, তাহা জানি, কারণ, এ ধরণের কথা রাজনৈতিক-বুদ্ধিসঙ্গত নয়; সত্যকে গোপন করা, এবং মিথ্যাকে সহ্য করা—অকপট না হওয়াই রাজনৈতিক ধর্ম্ম; এই জন্যই কি বিবেকানন্দ রাজনীতিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন? কারণ, ইংরেজের মত ও-পাপ হজম করিয়া চরিত্র বজায় রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি গান্ধীভক্ত ভারতীয়দের কথাই বলিতেছি, মহাত্মা গান্ধীর কথা বলিতেছি না। কথা উঠিতে পারে, ইদানীং বাংলাদেশেই বা শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম কয় জন করিয়া থাকে? কথাটা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; বাংলার নবযুগের সেই ধারাই যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কি জন্য ও কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে, এই আলোচনার পরিশিষ্টে তাহাই বলিব।

একদিকের কথা বলিলাম, আর একদিকে, অর্থাৎ সাধনার অপর ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একই, বরং আরও বিচিত্র—কারণ, সেখানে এই বিস্মৃতি অবাঙালীর নয়, বাঙালীর। বিবেকানন্দের কর্ম্ম-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের এক মহাশক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে, —শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তাঁহার নিজেরই রচনা-বলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে। কিন্তু পরে, একটি সম্প্রদায়ের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেই সাধন-ধারার পারম্পর্য্য আর স্বীকৃত হয় না, বরং ক্রমেই একটা বিরোধের ভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'Eastern Lights' নামক উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শনের নবত্ব ও মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহার একটিও শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের তত্ত্ব-দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। আমি এখানে সেই তত্ত্বের দার্শনিক গহনে প্রবেশ করিব না, কেবল নমুনাস্বরূপ একটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিব। শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শন সম্বন্ধীয় সেই তত্ত্বটি সরকার মহাশয় এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"Energy and matter are the bi-polar expression of the divine Sakti"; যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-মূর্ত্তির ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এ তত্ত্ব নূতন নহে। তাহা ছাড়া, Arthur Avalon-এর সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তন্ত্র-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই তত্ত্বের সন্ধান অনেকেই পাইয়া থাকিবেন। এমন কথা বলিলেও হয়তো অযথার্থ হইত না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যাহা বীজ বা অঙ্কুররূপে বিদ্যমান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রতিভাবলে তাহাকেই পূর্ণবিকশিত করিয়া, অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু বলিব না, কেবল উক্ত প্রবন্ধ হইতে আরও দুই-একটি এমন উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহা শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য। যথা—

'Shiva and Kali, Brahma and Sakti are one, and not two who are separable. Force inherent in existence may be at rest or in motion."

এ উক্তি যদি কোন অর্থে নূতন হয়, তবে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের। নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটিও বিবেকানন্দের; প্রথমটির আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে করিয়াছি—বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'Individuality'র ব্যাখ্যায়, এবং আরও পূর্ব্বে, 'আত্মা'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধিকার-বোধ এবং 'ব্যক্তি'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমানের পার্থক্য-বিচারে; ইহা যে বিবেকানন্দেরই বাণী, তাঁহার বক্তৃতাগুলির মধ্যে তাহার অজস্র প্রমাণ মিলিবে।—

"But the finer insight of Aurobinda has been able to distinguish will from desires, and to discern the cosmic and the transcendent movement of will from egoistic tendencies."

* * * *

"Aurobinda is equally alive to the play of the divine life in creation and destruction. 'God is there not in the still small voice, but in the fire and the winds."

এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে আদৌ নূতন নহে, বিবেকানন্দের পরে আরও পুরাতন। আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এই প্রবন্ধে, James, Bergson, Plato, Schopenhauer, বুদ্ধ, চৈতন্য, তন্ত্র, সাংখ্য, বেদান্ত—কিছুই বাদ যায় নাই, বাদ গিয়াছেন কেবল বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ!—যেন তাঁহাদের বাণীর মৌলিকতা বিচারযোগ্যই নয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'—কিন্তু ইহা কি সত্যই মতিভ্রম? সত্যের উপরে ব্যক্তিকে স্থান দিলে ব্যক্তিরও যেমন মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই, যুগের স্বরূপ ও তাহার ধারাটি ধরিবার পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবযুগের গতিরোধ—আকস্মিক পন্থা পরিবর্তন ; রাজনৈতিক ভাবোন্মাদ, তাহার কারণ ; রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ; রবীন্দ্র-জীবনে ও চরিত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ; দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন ; রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ; তাহার পরিণাম।

বাংলার নবযুগের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ওই যুগ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই একরূপ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা তাহার ধারাকে এ কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আজিকার এই প্লাবনকেও সেই এক গতিবেগের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণাও এক অর্থে সত্য হইতে পারে, কারণ, কালের স্রোত অবিচ্ছেদেই বহিয়া থাকে, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সম্পর্ক থাকেই। কিন্তু সেই সাধারণ কালধর্ম্মকে স্বীকার করিলেও কালের এক একটা অংশ এমন বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্বতন্ত্র যুগ বিভাগও আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ ; সে যুগে সমাজ, ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল ; সে এক অকাল-সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল। সে যেন একটা আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত ! তারপর হইতেই তাহার জীবনের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। কেন এমন হইল, এই ঘটনার মূলে কোন্ জটিলতর কারণজাল প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার বিচার এ যুগের ঐতিহাসিক করিবেন, এখানে সে প্রয়োজন নাই। বাংলার নবযুগ বলিতে আমি কালের যে ধারাকে একটি সুস্পষ্ট গতি ও পরিণতির আকারে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহার প্রধান প্রেরণা ও প্রবৃত্তি ছিল—বিধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের, মানবতার সহিত জাতীয়তার সমন্বয়-সাধন। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; বিবেকানন্দও সেই বিরোধকে একটা বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গীভূত করিয়া তাহার সমাধান-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনকে স্বীকার করিয়া তাহার উপরে জয়ী হইবার যে প্রয়াস,—সেই সংগ্রামকে জীবন-ধর্ম্মরূপে বরণ করাই ছিল উভয়ের আদর্শ ; এজন্য চিত্তশুদ্ধি ও পৌরুষের সাধনাকেই তাঁহারা আর সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফল কিছু

ফলিতেও আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল, সেই সাধনা অতিশয় বিষময় হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দ তাহাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি-মন্ত্র যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষেত্র ছিল সমাজ ; বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি' এবং বিবেকানন্দের 'পৌরুষ' এই দুইয়েরই সাধনা সমাজ-জীবনে হইতে পারিবে, এবং তাহাই আবশ্যক, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাহার কারণ, উভয়েই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, জাতির এই অধঃপতিত অবস্থায় প্রথমেই বাহিরের সহিত বিরোধ নয়, শক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বেই শত্রুজয়ের অভিযান নয়,—ভিতরে আত্মস্থ হওয়া—মানুষ হওয়াই মুখ্য, আর সকলই গৌণ। দুইটি কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না, প্রথমটি—বাঙালীর জাতিগত ব্যাধি, তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা ; দ্বিতীয়—নবযুগের সেই বাণীমন্ত্রের বিশুদ্ধি-রক্ষা, এবং সেই পথে দৃঢ়ভাবে চালিত করিবার মত শক্তিমান নায়কের অভাব।

প্রথমটির কথাই আগে বলিব। চরিত্রই মানুষের জীবনের নিয়ামক বা নিয়তি, জাতিরও তাহাই। বাঙালী জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তা অপেক্ষা ভাবাবেগ-বিহ্বলতাই অধিক ; তাহার মেরুদণ্ড বড়ই দুর্ব্বল, মস্তিষ্কের ভাবগ্রাহিতা যেমন ক্ষিপ্র, হৃদয়ও তেমনই সদ্য-স্ফীতিপ্রবণ ; তাই দীর্ঘকাল একাসনে কোন মন্ত্রের সাধনা তাহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর। যাহার চরিত্র দুর্ব্বল তাহার আত্মপ্রত্যয় দ্বিধাযুক্ত হয়, অতএব এমন জাতি অবস্থার দাস হইতে বাধ্য। এইরূপ চরিত্রের কারণে বাঙালীর ইতিহাসও বিচিত্র বটে ; ধর্ম্ম ও ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে সে অতিশয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া, বৈষয়িক জগতে, সে কোন বড় কীর্ত্তির অধিকারী হয় নাই, নিজ বাস-পল্লীর ক্ষুদ্র সমাজ-জীবনে কর্ম্মকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সাধনার সহায় করিয়া, এবং ভোগ-সুখকে যতদূর সম্ভব পরিমিত করিয়া, সে পারিবারিক জীবনকেই সুন্দর ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

তথাপি গত শতাব্দীতে এই জাতিই তাহার সেই দুর্ব্বল চরিত্রে একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া যেন নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কারণ, তাহার সেই মেধা ও প্রতিভার বলে সে জগতের যুগান্তর-সমস্যাকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাব-চিন্তার সংঘর্ষে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। সেই প্রথম তাহার নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ; সেই দৃষ্টির ফলে, সে আর একবার —সেই ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন—আত্মসংশোধনে ও আত্মরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিল। এবার শুধুই বর্জ্জন নয়—গ্রহণও আবশ্যক ; প্রাণপণে কেবল আত্মরক্ষাই নয়—পরকেও জয় করিতে হইবে, তাই কেবল শাস্ত্র-শাসন নয়—চরিত্র-গঠনই হইল মুখ্য ; কারণ, পথ্যাপথ্য বিচার নয়—সর্ব্বপথ্য হজম করিবার শক্তিই তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে।

এই চিন্তা, এই ভাব, এই সংকল্প যখন তাহার জীবনে একটু মূলবদ্ধ হইতেছে ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে প্রবল ঝড় বহিতে সুরু করিল—ভাব-প্রবণ বাঙালী আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই ঝড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই ঝড়কে বশীভূত করিবার জন্য যে বুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োজন তাহা গণবুদ্ধি ও গণশক্তি—সে শিক্ষা ও সে সংস্কারই ভিন্ন, আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক আদর্শ ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই নবযুগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই, সহসা সাধনার এই ক্ষেত্রপরিবর্ত্তনে একটা আদর্শ-বিপর্য্যয় ঘটিল; বাঙালী আবার ভাসিয়া গেল; তারপর এখনও পর্য্যন্ত সে পায়ের নীচে মাটির সন্ধান পায় নাই। যে শক্তি-সাধনা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তাহা এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও সুদুর্গম কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইল; পূর্ণশক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, সেই স্বল্পসঞ্চিত শক্তির উন্মাদনায় বাঙালী যুবক, আত্মজয় নয়—আত্মনাশের আতশবাজিতে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে চাহিল। বাঙালীর চরিত্রগুণে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী সংহতিসাধক না হইয়া বিস্ফোরক হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাংলার নবযুগের অবসান হইয়াছে। বাংলার যুবজীবনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার কারণ, খাঁটি স্বাজাত্যচেতনার পরিবর্ত্তে, বিলাতী nationalism তাহাকে রিপুর মত গ্রাস করিয়াছিল; সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে আত্মস্থ হইবার—স্বজাতিকে চিনিবার ও তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় করিবার পূর্ব্বেই, সে একটা সেন্টিমেন্ট-মাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না। এখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব করা দূরে থাক—নিজ সমাজে নেতৃত্ব করিবার জন্য সে পরের শরণাপন্ন হয়!

অতএব, বাহিরের দিক দিয়া বাঙালীর এই দুরবস্থার কারণ যেমনই হউক, বা যতই জটিল হউক, তাহার চরিত্রই যে তাহার শত্রু, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই চরিত্রই গত যুগের সেই নব জাগরণের ফলে নূতন ছাঁচে পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও যুগপ্রভাবের সহিত বাঙালীর জাতিগত সংস্কৃতি ও প্রতিভার মিলনে, জীবনের এক নূতন আদর্শ—এক অভিনব মানব-ধর্ম্ম—বাঙালীর সুপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল, সে সাড়া তাহার আত্মায় জাগিয়াছিল, নতুবা জ্ঞানে কর্ম্মে, কল্পনায় ও ভাবুকতায় এমন প্রতিভার বিকাশ হইত না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বাঙালী সেই নবযুগকে এত সহজে বরণ করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব ভারতীয় প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র, তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কারও সন্ন্যাসের বিরোধী,—

বৈষ্ণবই হউক, আর শাক্তই হউক, সে ভোগবাদী, রূপরসরসিক—তান্ত্রিক। তাই জীবনকে আরও শক্ত করিয়া ধরিবার জন্য—পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদকেও যেমন, ভারতের অধ্যাত্মবাদকেও তেমনই, তাহার সেই স্বভাব-ধর্ম্মের বা স্বধর্ম্মের দ্বারা শোধন করিয়া, সে এক নূতন শক্তিমন্ত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত, তাহার চরিত্রে যে বস্তুর বিশেষ অভাব—সেই পৌরুষ ও কর্ম্মবীর্য্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাধনাই প্রধান পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই সে যুগের শেষ শিক্ষা, এই মন্ত্রে দীক্ষালাভই যে সেই যুগ-সমস্যার শেষ সমাধান তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাও জানি; এই জীবনবাদ ও শক্তিসাধনার এই আদর্শ যে অতঃপর ভাসিয়া গেল কি কারণে, তাহা বলিয়াছি। বাঙালীর দুর্ব্বল ধাতুতে ওই শক্তিমন্ত্র সহ্য হইল না। কিন্তু ইহার পর তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কাব—ব্যক্তি ও সমাজের সেই পুরাতন বন্ধনও আর টিঁকিল না—একটা ভূকম্প যে আসন্ন, সেই আশঙ্কা করিয়াই, গতযুগের শেষভাগে, জাতিহিসাবে বাঁচিবার জন্য এত চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাই উপস্থিত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবধারাও রুদ্ধ হইয়াছে।

(২)

তথাপি ওই যুগের শেষভাগে, বিবেকানন্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর-এক মহা-প্রতিভার উদয় হইয়াছিল; পরবর্ত্তী কালে এই প্রতিভা বাঙালীর ভাব-জীবনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—আমি বঙ্গভারতী ও ভারত-ভারতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথের উদয় ও অভ্যুদয়ের কাল উনবিংশ শতাব্দীর কিয়দংশ অধিকার করিলেও, তাঁহার প্রকৃত উদয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই হইয়াছিল, এবং তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ওই শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সাধনাও ক্রমে যে মুখে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এতই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপরীত যে, তাহাকে নবযুগের সেই ধারার সহিত যুক্ত করিলে, সেই যুগ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়কে বুঝিবার পক্ষে বাধা হইবারই সম্ভাবনা। এজন্য, আমি যাহাকে বাংলার নব-যুগের সাধনা বলিয়াছি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে পৃথক রাখাই কর্ত্তব্য মনে করি। তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার এইরূপ বিকাশের মূলে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীরই একটা গভীর ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে—প্রধান ধারার বহির্ভূত হইলেও, তাহা সে যুগের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। অতএব আমার এই আলোচনার পরিশিষ্ট হিসাবে আমি প্রথমে সেই সম্পর্কের, পরে সেই প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলিব।

বাংলার নবযুগের বঙ্কিম-পূর্ব্ব ভাগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি সেই কালের একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির নাম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহা। যে মানব-মহত্ত্ববোধ এই যুগের নব প্রবৃত্তির আদি লক্ষণ, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহাও তাহারই অন্তর্গত। সমাজের

সহিত ব্যক্তির নূতন করিয়া বোঝাপড়া, শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে বিচার-বুদ্ধির জাগরণ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিতা—এ সকলই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের লক্ষণ। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-চেতনা ততখানি অন্তর্মুখ ছিল না, তিনি তৎকালীন সমাজকে সহ্য না করিলেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্যবোধে একরূপ পৌরুষেরই দৃপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামমোহনের বাণী ও তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহার সেই আদর্শস্থাপনের পক্ষে কার্যকরী হয় নাই; তাঁহার সেই আন্দোলন কেবল একদিকেই নবযুগের সেই প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করিয়াছিল—সর্ব্ববিষয়ে Reason বা বিচার-বুদ্ধির একাধিপত্য এবং তজ্জনিত ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির উপরে বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে, সমগ্রভাবে সমাজ বা জাতির কল্যাণ-কামনা মুখ্য না হইয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনাই শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিতেছিল; যে তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য, যে দূরদৃষ্টি ও প্রেম ব্যতিরেকে, এক অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী, অথচ অধুনা-মৃতবৎ অতিকায় সমাজ-দেহের উত্তোলন ও উজ্জীবন অসম্ভব, ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্য-কামনা তাহার আদৌ অনুকূল নয়। এইরূপ মনোভাব সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও মধ্য স্তরে সংক্রামিত হইবার পক্ষে একটা বড় সহায় হইয়াছিল—সেকালের ইংরেজী শিক্ষা; সেই শিক্ষার অন্তর্গত Humanity বা মনুষ্যত্বের মহিমাবোধ এবং তাহারই সমর্থনে ইতিহাস-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ও তৎ-প্রসূত যুক্তিবাদ, সেকালের অতি দুর্ব্বল হিন্দু-সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করিবারই কথা। রামমোহনের প্রতিভায় এই ভাব আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, তাই বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু পরে যাঁহারা রামমোহন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ঠিক রামমোহনের অনুগামী ছিল না; তখন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ভিতরে ভিতরে জাতীয়-চেতনার মূল ক্ষয় করিতেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষার সার-তত্ত্ব হজম হইয়া আসিলে পর, বাঙালীর মানস দেহে সেই শিক্ষা বিষ-চিকিৎসার মতই সুফলপ্রদ হইল, তাহারই কারণে, সমাজ-চেতনারও অধিক—জাতীয় আত্ম-চেতনার সঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার মস্তিষ্কের যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চেতনা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিল, প্রাণে সাড়া জাগিল—প্রেম আসিয়া জ্ঞানের হাত ধরিল, বাঙালী নবযুগকে তাহার জীবনে বরণ করিয়া লইল। আমি ইহারই কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উদয় ও সেই প্রতিভার উন্মেষের সহিত এই যুগের যে সম্পর্ক তাহা ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ঘটিত, অতএব এই তত্ত্বটিকে ধরিয়া আর একটু ভিতরে যাইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই অন্ততঃ কতক পরিমাণে দেশ-কালের নিয়ম-বহির্ভূত,—কখন কোথায় যে তাহার আবির্ভাব হইবে পঞ্জিকার সাহায্যে তাহা গণনা করা যায় না;

তাহার উপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই স্বতন্ত্র যে, অনেক সময়ে মনে হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের, তথা বাঙালী-জীবনের কোন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই—কেবল ইহাই সত্য যে, ওই জ্যোতিষ্কের উদয় আর কোথাও না হইয়া আমাদের এই নিম্নভূমির অতি-নিকট দিগ্‌বলয়ে হইয়াছিল; তাহার কোন কারণ না থাকিলেও, বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয় নিয়মে তাহার বারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ-নামক যে প্রতিভা-সূর্য্য আপন জ্যোতির্লীলা আপনারই স্বভাবে প্রকটিত করিয়া আপনিই অস্ত গিয়াছে, তাহার আলোকে আমাদের অন্ধকার গৃহকোণ আলোকিত হইয়াছে কি না, তাহার কিরণ-প্রাচুর্য্যে আমাদের ক্ষেত্রতলের শস্য-রাশি পাকিয়াছে কি না, অথবা তাহার উত্তাপে আমাদের শীত-জড়িমা ঘুচিয়াছে কি না, —এমন প্রশ্ন যেন নিতান্তই অবান্তর; যদি তাহা হইয়া থাকে, ভালই, যদি না হইয়া থাকে, সে অনুযোগ করা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু এ কথা পরে, এখন যাহা বলিতেছিলাম। এই যে প্রতিভা, ইহা যতই স্বয়ম্পূর্ণ বা দেশকাল-নিরপেক্ষ হউক, ইহারও একটা জন্মস্থান বা উদ্ভব-ক্ষেত্র আছে—সেই ক্ষেত্রই ইহার বিকাশের পক্ষে বাধা না হইয়া বড়ই অনুকূল হইয়াছিল। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাধন-জীবনের প্রভাবে; দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই যুগের যে সম্পর্ক—রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবনের সম্পর্ক গৌণভাবে তাহাই; অন্তর্জ্জীবন বলিলাম এই জন্য যে, কবিশিল্পী-হিসাবে সেই যুগের সহিত তাঁহার যে সাহিত্যিক সম্পর্ক তাহা অন্যরূপ; সেই সম্পর্কের কথা, এ প্রসঙ্গে যতটুকু আবশ্যক, পরে বলিব।

দেবেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে রামমোহনের শিষ্য হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতিশয় বিলক্ষণ; ওই যুগের যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের কথা বলিয়াছি, সেই সঙ্কট দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই সর্ব্বপ্রথম গুরুতর হইয়া উঠে। রামমোহনের নিকটে তিনি একটা মন্ত্রের নির্দ্দেশ মাত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় আরও গভীর হইয়াছিল। তিনি, রামমোহনের মত, ধর্ম্মবিষয়ে কেবল জ্ঞানপন্থী ছিলেন না—ভাবপন্থীও ছিলেন, তাই বেদান্ত-দর্শনের অদ্বৈতকে যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া, এবং সেমিটিক ঈশবাদকেই তাহার দ্বারা উন্নত ও মার্জ্জিত করিয়া, কেবল 'পৌত্তলিকতা'র উচ্ছেদসাধনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই নিজের আধ্যাত্মিক পিপাসার অনুরূপ একটি ভাব-সাধনার বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন যে ধর্ম্মমতের স্থাপনা করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে একটি বিশিষ্ট সাধনা যুক্ত করিয়াছিলেন; কেবল 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' নয়—তিনি ব্রহ্মের রসরূপকেও জীবনে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সাধনার সহিত এমনই জড়িত ছিল, তাঁহার সেই আদর্শের মধ্যে এমন একটা বন্ধন ছিল যে, মুক্তিপিপাসু নব্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই; রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারপন্থীরা

সেরূপ না বুঝিয়া তাঁহার সেই যুক্তিধর্ম্মের শাণিত অস্ত্রখানিকেই সর্ব্ববন্ধন ছেদনের উপযোগী বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল।

নব্যপন্থী হইলেও দেবেন্দ্রনাথ যে-বন্ধন মানিতেন, তাহা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আধ্যাত্মিক সংস্কার; তিনি আধুনিক জীবনেই সেই সনাতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যুগ-প্রবৃত্তির সহিত তিনি যেটুকু রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা প্রকৃত রফা নয়—আসলে তাহার সেই আক্রমণকে নিবারণ করিয়া, সেই বিদ্রোহকেই ভিন্ন পথে ফিরাইয়া, একটা অতীত যুগ ও অতীত সমাজের ভাবস্বপ্নময় আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন—বংশগত সংস্কারেও তিনি ছিলেন পুরা অ্যারিষ্টোক্র্যাট (aristocrat)। তাহার উপর, তাঁহার চরিত্রেই এমন একটি উন্নত আদর্শনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল যে, তিনি সহজেই ভারতীয় সাধনার সেই অন্তর্মুখ ও আত্মতান্ত্রিক আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের এক খণ্ড সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ নব-যুগের সেই সমস্যাসঙ্কুল ভাববন্যার তরঙ্গাভিঘাত রোধ করিয়া, একটি সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে স্বকল্পিত সাধনমঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন ; সেই সাধনমঞ্চ যেমন বিবিক্ত, তেমনই তাঁহারই স্বহস্তরোপিত পুষ্পপাদপে সুশোভিত ছিল। বাহিরের হিন্দুসমাজের সহিত যে ব্যবধান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহাও সম্ভবতঃ এইরূপ মনোভাবের সহায়ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের বিদ্রোহকে অস্বীকার কবিতে পারেন নাই—কিন্তু সমাজ-জীবনের মিথ্যা অপেক্ষা ব্যক্তি-জীবনের মিথ্যাকেই তিনি বড করিযা দেখিযাছিলেন, এজন্য নিজ জীবনের সত্যোপলব্ধিকে সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী মনে করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে সংস্কারকের গোঁড়ামি বা প্রচারকসুলভ অন্ধতা ছিল না—তাঁহার চরিত্রগত আভিজাত্য সে বিষয়ে একটি সুন্দর সংযম রক্ষা করিয়াছিল।

এই যে চবিত্র এবং এই যে বিশিষ্ট সাধনা, ইহা যে সেই যুগের ভাবধারারই একটি তরঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভাবের কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই আন্দোলনের গতি ও পরিণতি ওই শতাব্দীর শেষে কিরূপ হইয়াছিল সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন ; কেবল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবন-গঠনে তাহার প্রভাব অতি গভীর। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মজীবনে উপনিষদের বাণী যেভাবে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল তেমন আর সে যুগে কোথাও দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন স্রষ্টা-কবি। তিনি তাঁহার নিজ জীবনের ভাষায় যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের বাণী-মন্ত্রে বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অর্থে

স্বকীয় বা নিজস্ব, সেই অর্থে এই পৈতৃক মন্ত্র-বীজ তাঁহার নিজস্ব নয়, এমন বলা যাইতে পারে ; তথাপি, ইহারই প্রভাব তাঁহার কবিমানসকে প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাঁহার কবিপ্রতিভা ও কবিজীবন একটি বিশিষ্ট ভাব-তন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কথাটা একটু বেশি সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতেছে—বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশও নাই, তথাপি, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে যে উদার রসপিপাসা ও সর্ব্বতোমুখী কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এমন সন্দেহ হয় যে, সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা যদি এত বড় একটা প্রভাব ও তাহার বেষ্টনী বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিত, যদি সেই একান্ত আত্মমুখী সাধনা তাঁহার পিতার মূর্ত্তিতে শরীরী হইয়া তাঁহার মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে হয়তো রবীন্দ্রনাথই অতিশয় শক্তিমান তান্ত্রিক সাধকরূপে বাংলার সেই নবযুগের Renaissance-কে চরম ও পরম পূর্ণতা দান করিতে পারিতেন। এইরূপ ভাবনা যে সূক্ষ্ম বিচারসঙ্গত নয় তাহাও বুঝি ; কারণ এরূপ মহতী প্রতিভা আপনার নিয়মেই আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে, বাহিরের সকল প্রভাবকে সে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহাকে কেহ আত্মসাৎ করিতে পারে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোনরূপ বাধা পাওয়া দূরে থাক, তাঁহার পিতার ওই প্রভাবে একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত ও দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাঁহার সেই Idaelism ও আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ওই সনাতন ভারতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তির আত্মসাধনাই ইহাতে প্রবল ; এইরূপ ভাব-সাধনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা যুক্ত হইলে যাহা হয়—রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাহাই হইয়াছে। এক দিকে সেই এক ভাব-মন্ত্রের বন্ধন, এবং অপর দিকে কাব্যরস-সাধনার মুক্তি, এই উভয়ের লুকাচুরি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র সেই লীলা, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিমানসকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাহার মূলে আছে সেই খাঁটি ভারতীয় মনোভাব, তাহারই বশে রবীন্দ্রনাথ, এত কাল পরেও, বাস্তবজীবনের সকল বিরূপতা ও আধুনিক যুগের বিষম কোলাহলের উপরে এক স্বাধীন আত্মার স্বকল্পিত ভাব-জগৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমানস ও সেই কাব্যজগতের বিস্তারিত পরিচয় এখানে অনাবশ্যক ; তাহা যে সেই যুগের ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র—শুধুই সে যুগ কেন, কোন যুগেরই অধীন বা অনুগামী নয়, ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি কারণে এত গভীর ও গূঢ় তাহা বলিয়াছি, সেই একই কারণে তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাই, বাংলার ও ভারতের—কেবল পৌরাণিক ছাড়া, আর সকল যুগের—সকল ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার রসকল্পনাকে পুষ্ট করিয়াছে ; অতএব, এক হিসাবে ইহা যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি-কাননের যেন একটি কবি-মধুকর,—তেমনই কোন এক বিশেষ যুগের প্রতিনিধি

নহে। এই অবাধ ভাবরসরসিকতার সহিত দুর্জ্জয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্র-নাথের অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের দ্বন্দ্বও অতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সকল আসক্তির মধ্যেই তিনি নিরাসক্ত; জনতার শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেও সারা পথ তিনি আত্মমনস্ক; তাঁহার জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা আত্মগত ভাবসত্যের প্রয়োজনই অধিক। যে পথ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লয় তাহা আমাদের এই পথ নয়;—তাঁহার সেই পথ ও ঘর একই, তাহার কারণ, সে পথে—যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই —তাহাতে গন্তব্যের ভাবনা নাই, পথ চলাতেই আনন্দ, তাই পথবাসে ও গৃহবাসে প্রভেদ নাই। এইরূপ দেশকালহীন মানস-ভ্রমণ কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব, যে রবীন্দ্র নাথের মত একটি আত্মস্থির ভাবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যে নিজেরই মধ্যে সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়া তাহাকে আপন রসকল্পনার অধীন করিয়াছে—গতি ও স্থিতির যুগ্মতালকে বিশ্বরাগিণীর সঙ্গীত-সুষমায় সমীভূত করিতে পারিয়াছে। তখন কোথায় যুগ! কোথায় বা তাহার সমস্যা! উনবিংশ শতাব্দীতে যাহার উদয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকালে যাহার অস্তগমন—সেই অন্বর্থনামা কবির রবিমণ্ডলে বসিয়া প্রাচীন ঋষিবংশবন্দিত সাবিত্রী-দেবতা সেই এক সুরের উদ্বোধন করিতেছে—সেই—'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্'।

অতএব, সে নূতন মানবধর্ম্ম—Humanity-র যে বাস্তব আদর্শ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় সাধন, এই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-মুক্তির সাধনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাধনা অতিশয় শক্তিমান ব্যক্তিপুরুষের সাধনাই বটে; কিন্তু সকল ভাবতান্ত্রিক আদর্শকে নিষ্ফল করিয়া মানুষের যে ইতিহাস-জাত নিয়তি আজ শত শতাব্দীর শেষে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার উপায় আর নাই; এবার ব্যক্তি-জীবনকে মানব-জীবনে লয় করিতে হইবে; সেই মানবও ব্যক্তি-মানবের একটা ভাব-বিগ্রহ নয়, রক্তমাংসেরই এক বিরাট শরীরী বিগ্রহ। মানবাত্মার যাহা পরম-পদ তাহাও আর ভাবসাধনার লভ্য নয়; জীবনের উপলবন্ধুর পথ, দুর্গম গিরিসঙ্কট ও তপ্ত মরুসৈকত অতিবাহন করিয়া, দুর্ব্বলতম যাত্রীর হাত ধরিয়া, সেই পরম তীর্থে পৌঁছিতে হইবে। অতএব ওই ভাবমার্গের সাধনা এ যুগের পক্ষে ব্যর্থ হইবারই কথা—যদিও আর এক ক্ষেত্রে আর এক রূপে তাহা সার্থক হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাব বীজ কালজয়ী কাব্যকুসুমে বিকশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—নবযুগের সমস্যা-সমাধানের সহিত সে কীর্ত্তির সাক্ষাৎ-সম্পর্ক যে অল্প, এ কথা বিস্মৃত হইলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিই অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে, যুগ, জাতি ও দেশের বাস্তব আঘাত হইতেও নিষ্কৃতি পান নাই; সেই আঘাতে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত নানা রূপে

সাড়া দিয়াছে—সেই সাড়াও তাঁহার সেই আত্মসচেতন মনের সহিত নিজেরই বোঝা-পড়া। সাময়িক ভাবাবেগে তিনি নিজের কবিধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগও করিয়াছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির অন্তর্জ্জীবনের পাশে পাশে সেই বহির্জ্জীবনের কাহিনীও রেখাপাত করিয়াছে। সেই সকল রেখাবলী হইতে পৃথক করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়া লওয়া দুরূহ নয়, বরং বাংলার নবযুগের ভাবধারার যে পরিচয় আমি দিয়াছি তাহার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমূর্ত্তিকে স্থাপন করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সে যুগের সাহিত্যিক আদর্শকেও অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য এমনই যে, যতদিন বাংলার ভাবচিন্তায় সে যুগের প্রভাব মন্দীভূত হয় নাই, ততদিন তাঁহাকে কেহ চিনিতেও পারে নাই; তখন তাঁহার ভাবও যেমন—ভাষা ও ছন্দও তেমনই, সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া মনে হইত; প্রায় মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াও এই রবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র আপনার কিরণজাল প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। তারপব, যখন কিছুদিনের জন্য (তাঁহাব কবিমানসের একটি আকস্মিক ও অভিনব বিকাশে) তিনি জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে পথে বাহির হইলেন—এবং গানে গানে জনতার কণ্ঠ ভরিযা দিলেন; যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত, বিবেকানন্দেরই প্রায় সমধর্ম্মী, আর এক মহাপ্রাণ মহামনস্বী বীর-সন্ন্যাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এক দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, এবং অপর দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, তাঁহারই স্মৃতিমণ্ডিত 'নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতায়, জাতির চরিত্রগঠনে ও জাতীং আদর্শের উদ্ধারসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখনই বাংলার নবযুগের শেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি আপন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করিলেন। তাহার পরের ইতিহাস অন্যরূপ; রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়ই বাংলার নবযুগের শেষ অধ্যায। ইহার পর দেশ ও জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধনাও ভিন্নমুখী হইয়াছে, অথবা আরও নিশ্চিত-রূপে আপন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই যুগের রচনাবলীর সহিত পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই পরবর্ত্তীকালের যে কবিকীর্ত্তি তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এ আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাহাতে নবযুগের সেই সাধনার ধারা যে খণ্ডিত হইযাছে, আমি অতঃপর তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মানব-পূজা, তথা জীবনের নূতন আদর্শ—বাংলাসাহিত্যের ধারা-পরিবর্ত্তন ; সনাতন ভারতীয় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—মহামানববাদ ও বিশ্ব-প্রেম, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্বের বিপরীত ; রবীন্দ্র-সাধনায় ভাবান্তর ; রবীন্দ্রনাথের কবি-কীর্ত্তি।

নবযুগের প্রেরণায় মানবধর্ম্মের যে নব-আদর্শ-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা মূলে যেমন সর্ব্বমানবীয়, তেমনই সেই এক আদর্শই বাস্তবের দিক দিয়া কেন যে জাতীয়তা-বিরোধী নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই জাতীয়তা-ধর্ম্ম আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন, ইহার নীতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র ; তাহাতে, স্ব-পর-কল্যাণ সাধনের যে মর্ম্ম আমাদের সংস্কারগত হইয়াছিল তাহাও ভিন্নরূপ ধারণ করিল —কোন আকারেই ব্যক্তির আত্মচিন্তা বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান তাহাতে রহিল না। ইহাতেও অন্তর ও বাহিরের সকল বাধাকে জয় কবিবার জন্য যে সংগ্রাম অনিবার্য্য—সেই সংগ্রাম বা সাধনাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' এবং বিবেকানন্দের 'dynamic religion'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যুচ্চ ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে মানবতার যে আদর্শ স্থাপন কবিলেন তাহা বিশ্বজনীন—জাতি-বর্ণ হীন ; তাহাতে মানবসাধারণের পরিবর্ত্তে এক মহামানব বা বিশ্ব-মানব অকূল অচিহ্নিত ভাবসাগরে লীন হইয়া আছে, শেলীর সেই আদর্শের মত, 'pinnacled dim in the intense inane' না হইলেও, তাহা অনেক পরিমাণে পৃথিবীর ধূলামাটির অতীত ; সেই আদর্শধর্ম্মী জীবনে বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রূর-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাব-কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়। অতএব এইরূপ আদর্শ সেই 'dynamic religion'-এর আদর্শ নয়—ইহা জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের অমৃতগন্ধী লিরিকের প্রাণস্বরূপ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় কাব্য-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শুধু লিরিকধর্ম্মী নয়, তাঁহার সেই রসদৃষ্টি আরও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির ফল, সে দৃষ্টিতে, জীবনের নিয়তি-কঠিন নাটকীয় শক্তিরূপের পরিবর্ত্তে নিয়তি-নিয়মহীন আত্মস্ফূর্ত্তির লিরিক রূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মানুষের বাস্তব-নিয়তি বা প্রবৃত্তি-বিরোধকে সেই আদর্শ-জীবনের বাধা বলিয়া স্বীকার করে নাই ; এই জন্যই তাঁহার বাণী শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মশাসনমূলক discipline বা বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক অভ্যাস মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দকেই শক্তি-সাধনার উপরে স্থান

দিয়াছেন ; তাঁহার বিশ্বাস—প্রাণমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশই মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ; ফুল যেমন আপন অন্তরের রসপ্রেরণায় বর্ণে-গন্ধে দল বিস্তার করে, মানুষও তেমনই স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবে। এরূপ সাধনায় চরিত্র-শক্তির যেমন পৃথক মূল্য নাই, তেমনই, পৌরুষের অর্থও—সেইরূপ ভাব-জীবনেরই আদর্শ-নিষ্ঠা। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিমান্ ও স্ব-তন্ত্র পুরুষের পক্ষেই সত্য ও সম্ভব তাহা আমরাও বুঝি ; কিন্তু ঐ মন্ত্র যে অপূর্ব্ব বাণীরূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই উহা সাধারণের চিত্তও অধিকার করে ; কিন্তু শেষে তাহাতেই আধ্যাত্মিক অভিমান জন্মে—কবির সেই আধ্যাত্মিকতা আমরাও দাবি করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে মোহ মাত্র, বর্ত্তমান সমাজে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীবনের ক্ষেত্রে সে আদর্শ অচল বলিয়াই তাহা ক্রমেই জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে, শেষে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেও নির্ব্বাসিত হইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থা ও চরম স্বৈরাচারনিবারণে তাহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ বয়সে জরাগ্রস্ত কবি, কবিধর্ম্মবশে, যৌবনের জয়গান করিতে গিয়া—তাঁহারই সেই জীবনবাদকে সুদৃঢ় করিতে গিয়া—নিজেও বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত এইরূপ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তাহার ফলে, তিনি যে তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ হইতেও কতখানি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় শেষ রচনা—'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয়, জীবনের আর্ট ও আর্টের জীবন এক নয়। বিশুদ্ধ রসসাধনা সর্ব্ব-বন্ধন অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু জীবন-সাধনায় ঐ বন্ধনের প্রযোজন সর্ব্বাগ্রে—সমুদ্রের তরঙ্গলীলা ও তটিনীর জলোচ্ছ্বাস এক দৃশ্য নয়। কবির কাব্যপ্রেরণারূপে—বিশুদ্ধ আর্টে পুষ্পপরাগরূপে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যে কত মূল্যবান, রবীন্দ্রকাব্যেব মর্ম্মরস তাহা চিরদিন প্রমাণ করিবে ; কিন্তু জীবনকে জয় করিতে হইলে, অশান্ত ও অশিবের দ্বৈতকে স্বীকার করিয়া, পরে সেই অদ্বৈতে উঠিতে হয়; এই উঠিবার তত্ত্বই dynamism বা জীবনের শক্তিবাদ ; আনন্দবাদে সকলই 'হইয়া আছে'—কিছুই 'হইতে' হয় না, তাই শক্তিসাধনার প্রয়োজন নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' কথাটি বহুবার একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পর্কে তাহার বিশেষ অর্থ না করিয়া, তাঁহার রচনা হইতেই কিঞ্চিৎ নমুনা দিব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে ইহার বিকাশ যে প্রথম হইতেই হইয়াছে—'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র একটি কবিতায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি'।

আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিলো
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এখানে কবি যাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহার রূপ—তাহার 'আঁখি দুটি'ই—তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, সেই চোখের দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ে যে আলোকপাত করিতেছে, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইতেছেন; তাঁহার নিজেরই হৃদয়-রহস্য তাঁহার নিকটে পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই দৃষ্টি শুধুই subjective বা আত্মভাব-রঞ্জিত নয়, ইহা বিশেষভাবে আত্মমুগ্ধ বা egoistic; ইহা এতই স্ব-তন্ত্র ও আত্ম-সচেতন যে, সর্ব্ববিষয়ে আত্মানুভূতি ভিন্ন আর কোন অনুভূতিই যেন নাই। এই ভাব রবীন্দ্র-নাথের কবিকল্পনায়, তথা মানস-জীবনে, চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে; বাল্যের ওই কবিতাটির পর তাঁহার শেষ জীবনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি।...তার মধ্যে অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।" [রবীন্দ্রনাথের "পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮]

বলা বাহুল্য, ইহাও নিজের মধ্যে—অর্থাৎ ব্যক্তির মারফতে, বিরাটের উপলব্ধি—বহি-র্জগতের, বা বহুমানবের মধ্য দিয়া নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধিলাভের পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধন-মন্ত্র একই হইবার কথা, বরং কাব্যের সেই সৌন্দর্য্য-সাধনাতেই তাঁহার অন্তর-পুরুষের আসল পরিচয় আছে। আমি এখানে কবির সেই কবি-স্বপ্নেরও কিছু পরিচয় দিব। প্রথমে এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব যাহাতে কবির সেই প্রাণের সুর যেমন গভীর, তেমনই অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী—
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম-হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ঐ 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', ঐ 'অচপল দামিনী'এবং 'চারিদিকে চির-যামিনী'র যে ভাব-সিদ্ধি, তাহা সাধক-ব্যক্তির সফল সাধনা হইলেও, কবির পক্ষে উহা ধ্যানগম্য, এবং মানুষের পক্ষে একরূপ ক্ষণিক চিত্ত-বিলাস মাত্র ; কারণ, 'বিপুল বিরতি' বা 'অকূল শান্তি' জীবনের সত্য নয় ; 'চারিদিকে চিরযামিনী'র মধ্যে, 'অসীম চিত্ত-গগনে একটি চন্দ্রে'র ঐ যে ধ্যান, উহাতে যে অদ্বৈত-সাধনার ইঙ্গিত আছে, তাহাতেও সকল দ্বৈতকে জয় করিবার প্রয়োজন হয় না—অন্ধকার হইতে চক্ষুকে ফিরাইয়া আলোকের দিকে নিবদ্ধ করিবার উপায় করিতে পারিলেই হয় ; এইরূপ "intellectual attitude in all its naive simplicity" কবির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনই গৌরবজনকও বটে ; কিন্তু জীবন-পথযাত্রী মানুষের পক্ষে ইহার মত ভ্রান্তি আর নাই। জীবনের দামিনী অচপল নয়—অতিশয় চপল, এবং তাহার পক্ষে, good ও evil—শিব ও অশিব, দুই-ই সমান সত্য। ইহারই প্রসঙ্গে, মঃ রোলাঁ। তাঁহার বিবেকানন্দ-চরিতে, বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তাহা উদ্ধৃত করিতেছি এইজন্য যে, তাহা দ্বারা, বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ যে ভাবান্তর আনিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—"Learn to recognise the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in Sweetness and Joy"। এই কথাই আর একটু বিস্তারিত করিয়া, মঃ রোলাঁ। লিখিয়াছেন—

Similarly the smiling Ramkrishna from the depths of his dream of love and bliss could see and remind the complaisant preachers of a "good God", that Goodness was not enough to define the force which daily sacrificed thousands of innocents.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঐরূপ। তাঁহার শিল্পী-মন বহু-বিচিত্রের পিপাসায় কত ভাবকেই না রূপ দিয়াছে—কত চিন্তাকে, কত তত্ত্বকে, কত অনুভূতিকে, কত অপরূপকে বাংলা ভাষার বীণা-ধ্বনিতে বাঁধিয়া দিয়াছে ! আমি এখানে তাঁহার সেই কবিকীর্ত্তি বা কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতেছি না—বাংলার নবযুগের সেই ধারাটির সঙ্গে তাঁহার বাণী, তথা ব্যক্তি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সেই যুগকে যেরূপে বরণ করিয়া তাহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সেই ধারাকে ধরিতে চাহিলেও, তাঁহার ব্যক্তিধর্ম্ম অতিশয় স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি শেষে সেই ধারাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অথচ কোন নূতন ধারার প্রবর্ত্তন বা নায়কত্ব করিতে পারেন নাই ; তাঁহার মত, রস-শিল্পী কবির পক্ষে কোন একটি বিশেষ জীবন-বাদকে একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়া—তাহারই ভেরী বাজাইয়া জনারণ্যের পথপ্রদর্শক হওয়া যে কতখানি স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শেষে আপন ব্যক্তি-সাধনার সেই মন্ত্রটিকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া, ভাবমার্গে

বিশ্বাত্মার সহিত ব্যক্তি-আত্মার যোগস্থাপন এবং তাহারই ফলে একটা মহামানবীয় কাল-চারের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যকলা ও তন্নিহিত মানস-মুক্তির রস-পিপাসা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালী-মনকে যে ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহাতে বাংলার নবযুগের সেই আদর্শ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেই জয়গান বিংশ শতাব্দীর ভগ্ন-জীর্ণ বাঙালী-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া, তাহাব আত্মসুখপরায়ণতাকেই একটি উদার ভাবসাধনার মহত্ত্ববোধে আশ্বস্ত ও চরিতার্থ করিয়াছে। ইহার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ দায়ী নহেন, দায়ী আমাদের চরিত্র ও আমাদের ভাগ্য—অবস্থাবশে অমৃতও এ জাতির.পক্ষে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দের ধর্ম্মমন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার নবযুগের সেই জীবনাদর্শ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

Those who have followed me up to this point, know enough of Vivekananda's nature, with its tragic compassion binding him to all the sufferings of the universe, and the fury of action wherewith he flung himself to the rescue, to be certain that he would never permit or tolerate in others any assumption of the right to lose themselves in an ecstasy of art or contemplation.

—এই "ecstasy of art or contemplation"—"রস-সাধনা বা ধ্যানকল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ"—যে-জীবনের আদর্শ, তাহা 'tragic compassion' বা 'fury of action'-এর জীবন নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন নিজের নিকটে তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন; এইরূপ স্বীকারোক্তি তাঁহার একটি কবিতায় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; 'এবার ফিরাও মোরে' নামক সেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি ও ব্যক্তি-স্বভাবের সুগভীর আত্মপরিচয় আছে। মানুষের বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেও তিনি সেই দুঃখের জগতে বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন না; যেখানে—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—সেখানেও তিনি সেই বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া, এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্ত্তিনাশনের জন্য অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য যে অন্নজল, তাহার পরিবর্ত্তে পরম সত্যের অমৃত-পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে বিশ্বজীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তি-রূপিণীর পরিবর্ত্তে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

…ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

—এমন যে দুর্গত সমাজ, যাহারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তাহাদিগের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার-চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা—

এবং মুহূর্তে ভাবাবিষ্ট হইযা, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, নিজেরই জবানিতে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

দুর্দিনের অশ্রু-জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে ? জানি না কে, চিনি নাই তারে…

তারপর কবি পৃথিবীর এই কঙ্করকণ্টকময় পথ কোনরূপে অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বপ্রিয়ার—সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার চরণতলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ; এই দুঃখের জগতে দুঃখীদের সঙ্গে বাস করিয়া বলিতে পারেন নাই—

'নত্বহং কাময়ে স্বর্গং ন চ রাজ্যং পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্॥

রবীন্দ্রনাথের দোষ নাই ; রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মনুষ্য-সাধারণের জীবন-দেবতা নয়। তিনি যে জীবনের আরাধনা করিয়াছেন, তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি বাহিরে নয়—ভিতরে ; তাহার যতকিছু অভাব-অভিযোগ, যতকিছু দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম অতি কঠিন স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার দ্বারা অন্তরেই প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রিয়ার প্রেমমূর্ত্তিখানিই কবির সেই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার শক্তি-উৎস ; জীবনের সকল উদ্বেগ ও জ্বর-জ্বালা তাহারই করপদ্মপরশনে জুড়াইয়া যায়—সেই সৌন্দর্য্যকে অন্তরগোচর করিলে জীবনের কোন দৌরাত্ম্যই আর থাকে না ; তখনই—"অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি"। অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ—জীবনকে জয় করিবার নয়—বিস্মৃত হইবার এই মন্ত্র আরও উৎকৃষ্ট কবি-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় রূপলাবণ্যদর্শনে

মহাভারতের সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনও গভীর ভাবাবেশে কবির ন্যায় গাহিয়া উঠে—

কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি,
কি আনন্দ-কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হ'য়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে।...
চারিদিক হ'তে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।
...ভাবিলাম
কত যুদ্ধ কত হিংসা কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য-কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইবা
পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে।

জীবন বলিতে যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—বাধাবিঘ্ন-জয়ের যে সংগ্রামশীলতা বুঝায়—এই সৌন্দর্য্যধ্যান তাহার প্রতিষেধক—তাহারই নাম 'জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ'। যে কাম সকল প্রবৃত্তির মূলে তাহাও এই বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্য প্রতিমার কটাক্ষমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে—রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় সেই তত্ত্ব রূপকচ্ছলে অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও কবি, রঙ রূপ ও রেখাকে ভাষার অধীন করিয়া, নারী-রূপের যে অনবদ্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা গড়িয়াছেন মদন তাহার দ্বারা পরাস্ত হইল—

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে। (চিত্রা—'বিজয়িনী')

এইরূপ সৌন্দর্য্য-সাধনার সাধারণ নাম—Aestheticism; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানস-বিলাস মাত্র নয়; ইহার মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রেরণা রহিয়াছে; ইহা আত্মারই লীলারস-সম্ভোগ, এই সৌন্দর্য্য-চেতনার মধ্যে গভীরতর আত্মচেতনার আনন্দ রহিয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের সেই মর্ম্ম

ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা সেই সনাতন রস-তত্ত্বকেই এক অপূর্ব্ব কাব্যকলায় পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন, তেমনই তাহার অন্তর্গত আদর্শের সহিত নবযুগের জীবনসাধনার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এজন্য তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাণী বা ভাবদৃষ্টিকে বাস্তব জীবন-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার মূল্য বিচার করিবেন না—কবি রবীন্দ্রনাথ, তথা ভাবুক ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যত কিছু উক্তিকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান করিবেন। বাঙালীর ভাবজীবনকে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমন আর কেহ করে নাই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন সাহিত্যকে কোন একজন কবি করেন নাই। বাঙালী যদি জীবনের অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে তীর্থপর্য্যটনের শক্তি লাভ করে, যদি সেই পথের পাথেয় সে কখনও সঞ্চয় করিতে পারে, তবেই হিমালয়ের পারে কবিকল্পিত সেই মানস-সরোবরের স্বর্ণকমল-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সে তাহার সেই পৌরুষ ও প্রাণশক্তির পুরস্কার লাভ করিবে। তৎপূর্ব্বে সেই ফুলকে অলস সুখ-স্বপ্নের লীলা-কমল করিয়া তুলিলে, শুধুই জীবনের প্রতি মিথ্যাচার নয়—রবীন্দ্রনাথেরও অসম্মান, এমন কি তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা মনে পড়িল। খাঁটি পাশ্চাত্যসংস্কারবতী ও আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধিশালিনী এক ইংরেজ বিদুষী, একদা তাঁহার আদর্শ-মানব ঋষি রাসেলের (Bertrand Russel) গৃহে ভক্তদল-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনদান উপলক্ষ্যে দুই মনীষীর দুই মূর্ত্তির তুলনা করিয়া, এবং ভক্তদলের রবীন্দ্র-পূজা ও সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুমান করিয়া, যে সকৌতুক কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা যেমন অজ্ঞাতমূলক, তেমনই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের ধাতুগত যে mysticism—যে mysticismএর অপচারকে রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই এ যুগের সাধনা হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহা পাশ্চাত্য প্রকৃতির পক্ষে এতই বিজাতীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই ভারতীয় ভাবের গন্ধমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, এই পাশ্চাত্য বিদুষী যখন মন্তব্য করেন—

> I like the picture of Tagore with his flowing beard and his oriental mysticism, his exotic pseudo-philosophic poems, with his pomegranate and lotus-bud imagery.......his flowing robes, his reverent disciples, his crescent moon idealism.......It is an amusing picture.

—তখন এইরূপ উক্তিকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই; ইহার মূলে যে অজ্ঞতা আছে তাহাও যেমন বুঝি, তেমনই, ইহা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন এই দুয়েরই আদর্শ একটা বিপরীত সংস্কারে কিরূপ আঘাত করে, এবং কেন করে, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে লাগিয়াছে ঐ

ভক্তগণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার—তাঁহাকে যথার্থভাবে ভক্তি করিবার মত শিক্ষা বা সংস্কৃতি ঐ বিদেশিনীর অবশ্য নাই, কিন্তু আমাদের জীবনেও কি রবীন্দ্রনাথের আসন প্রস্তুত হইয়াছে? রবীন্দ্র-ভক্তির যে আতিশয্য আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে কি কোন জ্ঞান-বিচার আছে? গড্ডালিকাবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা কি সত্য নয় যে, বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যাহারা একটা Cult বা ভক্তি-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় কৃত্রিম জীবন যাপন করে—দেশ, জাতি বা সমাজের সহিত তাহাদের যেমন নাড়ীর যোগ নাই, তেমনই তাহারা অতিশয় সুখী ও সৌখীন সমাজে বাস করিতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করে। আমি এখানে, প্রসঙ্গক্রমেই, অতিশয় দুঃখের সহিত ইহার উল্লেখ করিলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনা এযুগে এ জাতির পক্ষে যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছে ইহাও তাহারই একটা প্রমাণ।

কিন্তু ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায় না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যদি তাঁহার স্বকীয় সাধনায় ও লোকোত্তর প্রতিভাবলে এমন এক স্থানে পৌছিয়া থাকেন যেখানে সৃষ্টির সকল পদার্থই জ্যোতির্ম্ময়, অথবা অন্ধকার যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে ধ্বনিমাত্রেই সুরময়, অগ্নিরও আলো আছে—তাপ নাই; যেখানে সকল অন্যায় ও অসত্যকে কেবল অস্বীকারের দ্বারা নিরস্ত করা যায়; তবে তাঁহার মত পুরুষের সেই প্রাচীন ঋষি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার দ্বারা সে অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাংলা দেশে ঠিক ঐ কালে বাঙালীর বংশে এমন এক প্রতিভার উদয় যে কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নব-পুষ্পিত রূপ,—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'—এই যে বাণী, রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ইহাতেই নিহিত আছে। অতএব বাংলার নবযুগ যে পথে যুগ-সমস্যা, তথা জগদ্ব্যাপী আসন্ন মন্বন্তর-সঙ্কটকে বরণ করিয়া তাহার সমাধানে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এই খাঁটি সনাতনী সাধনা জীবনের রূপ-রসকে আশ্রয় করিয়াও, সেই পথে প্রবৃত্ত হয় নাই, বরং তাহার অন্তরায় হইয়াছে। তাহার কারণ, এই সাধনা আদৌ ব্যক্তিমুখী—সমাজমুখী নয়; বিশ্বকে বিরাটকে নিজ-আত্মায় সংহরণ করিয়া সেই মুকুরবিম্বিত আত্মানুরূপ ছায়ার রূপ-রস-প্রীতিই ইহার সাধন-বস্তু; এই প্রীতিও একরূপ বিশ্বপ্রীতিই বটে, কিন্তু ইহা সেই প্রেম নয়, যে-প্রেম আপন আত্মাকে—নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে—বিশ্বে বিলাইয়া দিয়া, সেই বিশ্বের ছায়া নয়—কায়াকে আলিঙ্গন করিয়া, "with its tragic compassion binds him to all the sufferings of the universe", এবং 'ecstasy of art or contemplation-এর পরিবর্ত্তে 'fury of action'কেই বরণ করিয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনাই বটে, তাহাতে সেই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাবদৃষ্টিই আধিপত্য করিয়াছে; তথাপি যুগধর্ম্ম এমনই যে, সেই প্রাচীন, আপন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই, আধুনিক বেশ ধারণ করিয়াছে; সেই ভাবদৃষ্টিতেই একটি নূতন রঙ লাগিয়াছে—মন্ত্র সেই একই বটে, কিন্তু তাহাতেই একটি নূতন পিপাসা যুক্ত হইয়াছে—জীবনে যাহা সম্ভব নয়, কাব্যে তাহা হইয়াছে। যে ভূমানন্দের অনুভূতি এক-কালে ঋষিকেই কবি করিলেও, জগৎ ও জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই সেই রসই একালের কবিকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার—অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করিবার—বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে; যেন সেই রসকে জীবনের পাত্রেই আস্বাদন করিতে হইবে; শুধুই মর্ম্মকোষের মধু নয়—সৃষ্টি-শতদলের প্রত্যেকটির বর্ণ, গন্ধ ও রূপরস পঞ্চেন্দ্রিয়-মুখে পান করিতে হইবে। এই যে অরূপের রূপ-পিপাসা, ইহাতে জীবনের যেটুকু আরাধনা আছে, তাহাকেই কালের প্রভাব বলা যাইতে পারে। এবার সেই অমৃতপিপাসু আত্মা দেহেরই দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়াছে—

> বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
> অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে;
> পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা—

—এমন কথা বাঙালী কবির মুখে আদৌ অসম্ভব নয়—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বংশগত ভাবধারার সেই প্রভাব ব্যর্থ হইবার নহে। তথাপি জীবনের এমন আরতি—মর্ত্ত্যের ধূলামাটিকেই এমন ভাবের ভরে আলিঙ্গন—পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। যুগের সহিত রবীন্দ্র-প্রতিভার যদি কোন গূঢ়তর যোগ থাকে, তবে তাহা ইহাতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আদর্শে যুগ-প্রবৃত্তির এই যে নূতনতর প্রেরণা রহিয়াছে, ইহাতেই অতঃপর বাংলা সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যজীবনকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্যবিধ গৌরব দান করিয়াছেন। তিনি মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠতাকে—তাহার কীর্ত্তি বা প্রতিভার উচ্চতম শিখরকে—মহিমান্বিত করেন নাই; যে মনুষ্যত্ব জীবনের সমতলভূমিতে সাধারণ জীবনযাত্রায়, তাহার মর্ম্মের মাধুরী বিকাশ করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত শত পুষ্পবৃন্তে ঝরিয়া যায়, তিনি সেই মনুষ্যত্বের পূজা করিয়াছেন। যদিও কাব্যমন্ত্ররূপে ইহার বীজ আরও পূর্ব্বে বিহারীলালের কবিতায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথই যেমন ইহাকে সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক করিয়াছেন, তেমনই সজ্ঞানে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।—

> আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজকেও ভালরূপে চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে

প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপর কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য। (পঞ্চভূতঃ 'মনুষ্য')

অন্যত্র—

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল,
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত,
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি—
শব্দ তার শুনি অবিরত।

—(সোনার তরী : 'বর্ষাযাপন')

—এই যে মানুষ-পূজা ইহা লোকোত্তর-চরিত্রের বা বীর-মানুষের পূজা নয়—মানুষমাত্রেরই মধ্যে যে মনুষ্য-হৃদয় বা মনুষ্যসুলভ সুখদুঃখ-চেতনা সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতেছে—ইহা তাহারই পূজা। এই মনুষ্যত্ব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র মত, ইহার জন্যও ঋষির সেই দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন; ঐ সাধারণ মানুষের উপরে সেই 'কাব্যের আলোক নিক্ষেপ' করিতে হইবে, যাহাকে ইংরেজ কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"the light that never was on sea or land, the consecration and the Poet's dream"; অর্থাৎ, এখানেও রবীন্দ্রনাথের সেই Idealism—ভাবের আলোকে বস্তুসকলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার সেই দৃষ্টি—জয়ী হইয়াছে; এবং ইহার ফলে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে কবি-কল্পনার মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। সে কল্পনা, প্রকৃতির মধ্যেও যেমন মানুষের জীবনেও তেমনই, একটি শান্ত-স্থির সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উভয়কে একটি আধ্যাত্মিক ঐক্য-সূত্রে বাঁধিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্ত্র ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিদৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুরূপ। সাহিত্যিক ভাষায় এই আদর্শকে লিরিক আদর্শ বলা যাইতে পারে; মানবপূজাহিসাবে সেই যুগের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, এই লিরিক আদর্শ পূর্ব্ববর্ত্তী এপিক বা নাটকীয় আদর্শকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের আদর্শ ও এই আদর্শ এক নয়, বরং বিপরীত; পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শে মানুষ একটা বিরাট শক্তির আধার—কেবল সুখদুঃখ-চেতনার আধার নয়; জীবন একটা নিস্তরঙ্গ সরোবর নয়, ভাবস্থির রস-সাগরও নয়; মানুষের দেহদশাধীন আত্মা বিকাশের অপেক্ষা রাখে—জীবনের গণ্ডি যত বৃহৎ হইবে, কর্ম্মের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে মানুষের চেতনাও তত উদ্বুদ্ধ হইবে, জীবন ততই সমৃদ্ধি লাভ করিবে। অতএব মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, অথবা, মহত্ত্বের মাত্রাভেদ না মানিলে সৃষ্টিগত জীবন-ধারাকে

অস্বীকার করিতে হয়, বস্তুকে বাদ দিয়া ভাবের সাধনা করিতে হয়। তাহাতে মানুষের সমাজে মিথ্যাচারই বাড়িয়া উঠে। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব-সাধনা দ্বারা; এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা। তথাপি তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুই সাধনাই সত্য; একটি সমাজ-জীবনের সাধনা, অপরটি ব্যক্তি-জীবনের—একটি স্রোতে ঝাঁপ দিয়া, অপরটি কূলে বসিয়া; একটি শাক্ত সাধনা, অপরটি বৈষ্ণব। রবীন্দ্রনাথ যে খাঁটি বৈষ্ণব তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি বিরাট-বিপুলকে ক্ষুদ্রের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চরিতার্থ হন, তাঁহার ভগবান তুচ্ছতম জীবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল—

> "আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"
> শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া
> "ছোট হ'য়ে আমি তোমারে রহিব ভরি'
> তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি'।"

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বম্" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাটের শক্তির দিকটিকে বড় করিয়া দেখেন নাই। জীবনের যে রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে তিনি যে নর-নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি বড় যথার্থ বলিয়া মনে হয়—অপর এক সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয়প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন—

> **In many ways he was a tremendously intelligent child who, playing on the sea-shore, did not concern himself with the sweep of the great tides, but splashed ecstatically in the less menacing ripples, with the keenest eyes for the adorable jetsam they flung up. He was not at ease, nor at his best in the presence of high tensions, they made him feel uncomfortable, as if a thunderstorm was brewing.**

এই যে "keenest eyes for the adorable jetsam"—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এইরূপ জীবন-দর্শন কাব্যের পক্ষে যতই সত্য ও সঙ্গত হউক,—'Criticism of Life', বা বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়-মূলক জীবন-সত্যের দিক দিয়া, সম্যক-দর্শন নহে। বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষের যে পৌরুষ-ধর্ম্মের উৎকর্ষই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে; এখানে জীবন মানুষের অধীন নয়, মানুষই জীবনের অধীন; এবং সে জীবনে কর্ম্মের উপরে

ধ্যান, বস্তুর উপরে ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ভাবধারা সম্পূর্ণ নূতন, ইহার অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া—বাস্তব ও আদর্শের ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া—জগৎব্যাপী মহাবিপ্লবের মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এক দিকে সর্ব্বমানব-মতবাদ ও অপর দিকে সর্ব্বমানব-পশুবাদের সাম্য ঘোষণা হইতেছে। বাংলার নবযুগের সাধনা ও তাহার আদর্শ যে ইহা হইতে কত স্বতন্ত্র, তাহার সেই মানব-বাদ বা মানব-ধর্ম্ম যে এইরূপ বিশ্বমানব-বাদকে—এই universalismকে স্বীকার করেন নাই, বরং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরেই সর্ব্বজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও জাতিধর্ম্মকেই—তাহার সেই স্বধর্ম্মকেই, সেই এক আদর্শে আরোহণ করিবার সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এককালে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। যথা—

গোলাপফুল ত বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য্য ত সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল ত বিশেষ ভাবে গোলাপ গাছেরই সামগ্রী, তাহা ত অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকে প্রকাশ করিতেছে। (আত্মপরিচয়)

* * *

এই বিশ্বধর্ম্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়; আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। (আত্মপরিচয়)

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোন ফাঁকি চলে না সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়।

—(হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ইহা জাতীয়তা-ধর্ম্মেরই কথা, ইহাই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কথা; রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলার নবযুগের সেই সাধনাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই আদর্শ একেবারে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানব-বাদ প্রচার করিলেন, একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন মানুষের জাতিভেদ, স্বধর্ম্ম, ও সংস্কৃতিভেদ আর নাই—মানুষের নাম হইল 'বিশ্বমানব', তাহার দেশ হইল—'সর্ব্বমানবলোক'। সেই মানুষের প্রকাশ যেখানে তাহাই তাঁহার স্বদেশ।—

সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক, এই আমার কামনা।

* * *

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্ছে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্তই মোটা মোটা নাম-ওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করিতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্ব-লোকে। ("পত্রধারা", 'প্রবাসী' ১৩৩৮)

'নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না'—রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বড় সত্য ও মূল্যবান। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি' একদিন তিনিও করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁহার পক্ষে পরধর্ম্ম, শেষে স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সনাতন'-পন্থী, ভারতের সেই ভূমা-বাদে দেশ কাল বা জাতি, কোনটারই স্থান নাই, তাই বাংলার নবযুগের সাধনা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই সাধন মন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য রচনা ও অসংখ্য উক্তি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা এই পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হইলেও তাঁহার স্থান বিংশ শতাব্দীতেই; তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার যে দৃঢ়তর অভিব্যক্তি, এবং—কাব্যসাধনার বাহিরেও—নব নব ভাব-চিন্তার নায়করূপে তাঁহার যে আত্মপ্রকাশ, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতেই ঘটিয়াছে; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু প্রভাব, তাহাও এই কালের শিক্ষিত-সমাজের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার সেই কবি-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সেই প্রভাবের ফলাফল বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়; এজন্য বাংলার নবযুগের পরিশিষ্ট হিসাবেই, সেই যুগকে অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে তাঁহার প্রতিভার সমগ্র পরিচয় নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শেষ কথা ; গ্রন্থকারের বিদায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে সমগ্রভাবে দুই-চারিটি কথা বলিব। এই কাহিনীতে আমি বাঙালীজাতির প্রতিভা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করিয়া, একটা যুগের যুগসমস্যার পরিচয় দিয়াছি। আজ এই জাতি প্রায় মরণোন্মুখ বলিলেও হয় ; জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আজ আত্মচৈতন্যহীন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থা তাহার কখনও হয় নাই। বহু পূর্ব্বকালের না হইলেও, দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের যে অসন্দিগ্ধ ইতিহাস আজও স্মরণাতীত হয় নাই, তাহাতে এই জাতির মনীষা ও প্রাণশক্তির, এবং জাতিহিসাবে একটি অতিশয় বিলক্ষণ সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে অসাধারণ উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারই আলোকে তাহার সেই অতীতকে যেমন, তেমনই তাহার ভবিষ্যৎকেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। আজিকার এই মহা দুর্দ্দিনে—এই মোহ ও মস্তিষ্ক-বিকার এবং পরধর্ম্মপিপাসার প্রবল উপসর্গ-পীড়ার মধ্যে—প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য অতিশয় ধীরভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। সেই আত্মপরিচয় লাভ করিবার জন্য বেশি দূরে দৃষ্টি করিতে হইবে না, মাত্র দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী কি ছিল তাহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে। এই উদ্দেশ্যে, আমি আমার অভ্যস্ত সাহিত্য-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অতিশয় স্বাস্থ্যভগ্ন অবস্থায়, এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি জানি, আমার এই আলোচনায় বহু ভ্রম-প্রমাদ আছে, বিশেষতঃ, ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি ইতিহাস লিখি নাই ; সে যুগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করিয়া, কেবল সাহিত্যিক ভাব-চিন্তার সাহায্যে, জাতির গূঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রেরণা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি ; তাহাতেই তাহার যে প্রতিভা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, সে পরিচয় মিথ্যা নহে। ইহাও সত্য যে, আমি সেই নব-জাগরণের একটা দিক ধরিয়াই আলোচনা করিয়াছি ; কিন্তু আর একটা দিকও আছে, এইবার সেই দিকটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব। এই নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল একটি মাত্র কারণে—জাতির দেহও যেমন সুস্থ ছিল, তেমনই তাহার প্রাণশক্তিও ছিল অটুট ; যেন বহুকালসঞ্চিত শারীরিক শক্তি ও হৃদয়বল একটা অভাবনীয় সুযোগে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—শুধুই মনের নয়, প্রাণের প্রাবল্যও ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। সে কি উল্লাস ! কি উৎসাহ ! অতি দরিদ্র নিঃসহায় পল্লীবালকও

কেবল দৈহিক কৃচ্ছ্র সাধনশক্তি ও প্রাণের অদম্য পিপাসায় শহরের বিদ্বৎ-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। ধনীর সন্তান নিশ্চিন্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নূতনতর জীবন-যাপনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিতেছে। কোথাও বা নবশিক্ষার সেই আলোক প্রাণের আতশ-কাচে পড়িয়া অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে, গোঁড়া হিন্দুর সন্তান দারুণ ম্লেচ্ছাচারে মাতিয়া উঠিতেছে। সংস্কারে আচারে অনুষ্ঠানে আজন্ম ব্রাহ্মণ থাকিয়া শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতও গুরুতর সমাজসংস্কারে সর্ব্বস্বপণ করিতেছে, জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা হইতেও ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শনকে বহিষ্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে! যে নিজে খ্রীষ্টান হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইয়াছে, মাতৃভাষায় উন্নতি ও স্বজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তাহারও কি উৎসাহ! অসাধারণ মেধাশক্তির বলে দেশী ও বিদেশী বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া যাহার প্রত্যয় হইল যে, জীবনের বাহিরে আর কিছু নাই, সে সারাজীবন নাস্তিক হইয়া কাটাইয়া দিল, কোন মোহ মানিল না, নিজের অমূল্য প্রতিভার কোন মূল্য চাহিল না! আর একজন—আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রতিভাশালী—জীবনের সমস্যাকে এমনই দুর্ব্বোধ্য ও মূল্যহীন মনে করিল যে, পূর্ণযৌবনে সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আত্ম-হত্যা করিল, সে আত্মহত্যা দুর্ব্বলের আত্মহত্যা নয়; এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। সাহিত্যসেবার পূর্ণ উৎসাহ এবং নিশ্চিত কবিখ্যাতি সত্ত্বেও একজন সুস্থ ও হৃদয়বান ব্যক্তি কেন যে আত্মহত্যা করিল, তাহার কারণ কেহ জানিল না; সেখানেও আত্যন্তিক আত্ম-চেতনা—প্রাণের গভীরতর প্রবৃত্তির সহিত সমাজ-জীবনের বিরোধই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়; প্রাণের প্রাবল্যই প্রাণধারণের বাধা হইয়া দাঁড়াইল; অর্থাৎ জীবনে সে কোন ফাঁকি সহ্য করিবে না। আর একজনের সাহিত্যিক নিষ্ঠা এতই কঠোর যে অতিশয় সারবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াও তাহা প্রকাশিত হইতে দিল না, জোর করিয়া মুদ্রিত করিলেও তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিল; সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলেও তাহাতে তাহার নাম যুক্ত হইতে দিবে না; ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ মৃত্যুর পরে প্রচারিত হইয়াছিল, অধিকাংশ রচনাই লুপ্ত হইয়াছে। ইহাও এইরূপ আত্মহত্যা—অতি উচ্চ আদর্শের নিকটে আত্মবলি। এক দিকে এই সব আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবান পুরুষের কাহিনী, অপর দিকে জাতি ও সমাজের কল্যাণ কামনায় কত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান! শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সারা দেশে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সে কি অসীম আগ্রহ! কত পুস্তক-প্রণয়ন—কত পত্রিকা-প্রচার! বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্য-সেবা ধনীগণেরও বিলাস-ব্যসন হইয়া উঠিয়াছে—তজ্জন্য কত সভা-স্থাপন, পরস্পরের কি প্রতিযোগিতা! উৎকৃষ্ট নাটকরচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা, মূল মহাভারতের অনুবাদ ও বিনামূল্যে তাহা বিতরণের জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয়! এইরূপ কত অবদান! ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য সেই যে প্রয়াস, তাহাতেও ত্যাগ, সাহসিকতা ও আত্মনিগ্রহের কি সংক্রামক উত্তেজনা! এ কাহিনীর শেষ নাই!

শতাব্দী প্রায় প্রথম হইতেই এই যে জাগরণ ইহা কেবল মনীষা ও প্রতিভারই জাগরণ নয় ; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইহার মানদণ্ড মাত্র ; এমন কি, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, কৃষ্ণমোহন, কৃষ্ণকমল, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির দ্বারাও এই যুগের সম্যক পরিচয় হইবে না। ভিতরে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, এ সকলের মূলে ছিল বাঙালীর অটুট স্বাস্থ্য—অতি বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার দেহ, সুদৃঢ় মেরুদণ্ড ও সুগভীর হৃদয়বত্তা। আজ আর তাহার কোনটাই নাই ; মনে হয়, সেই জাতিই যেন লোপ পাইয়াছে। এখন আর সে কল্পনাশক্তি নাই—ভাববিলাস আছে ; বিশ্বাস নাই—সৌখীন মতবাদ আছে ; সাহস নাই—শঠতা আছে ; প্রেম নাই—কলহ আছে ; প্রতিভা নাই—অনুকরণ-পটুতা আছে। সব চেয়ে আশঙ্কার বিষয়, সে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িতেছে। কারণ, আধুনিকেরা যে নব নব মতবাদের আস্ফালন করে, ভাব-চিন্তার যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহাও তেমন আশঙ্কাজনক নয়, বাঙালীর পক্ষে বরং তাহাই স্বাভাবিক—বাঁধন সে অনেকবার ছিঁড়িয়াছে, আবার শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে ; এমন মেধাবী ও ভাবপ্রবণ জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস খুব দৃঢ় না হইবার কথা ; কিন্তু দেহ যদি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তবে সে দাঁড়াইবে কিসের উপর ? ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার সেই স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল তাই সেই প্রবল স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও সে সগৌরবে কূলে উঠিতে পারিয়াছিল।

এই স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির সহিত জাতিগত প্রতিভার যোগ হইয়াছিল বলিয়াই সে যুগের সাধনায়, সকল তত্ত্ব ও আদর্শবাদের মধ্যেও, জীবনের বাস্তব দিকটা এত বড় স্থান অধিকার করিয়াছিল—সমস্যা এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই, সৃষ্টিবিধানের অলঙ্ঘ্য নিয়মকে—দেশদশাহীন মানুষের স্বভাব-ধর্ম্মকে—অতিশয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া, তাহারই অনুকূলে স্বজাতি ও সর্ব্বজাতির কল্যাণ-পন্থাকে স্থাপন করা হইয়াছিল। প্রায় শতাব্দীব্যাপী আক্ষেপবিক্ষেপের পর বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একটা সমন্বয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন, এবং বিবেকানন্দ তাহার সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরেই জীবনের একটা মহত্তর তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্ধবিশ্বাস, মিষ্টিক ভাবসাধনা, যোগশক্তি বা মন্ত্রবলকে সহায় করিয়া জীবনকে একরূপ ফাঁকি দিবার যে পন্থা এতকাল নানা আকারে, নানা তন্ত্রে, ভারতীয় হিন্দুমনকে প্রলুব্ধ ও আশ্বস্ত করিয়াছিল—মাটির উপরে দাঁড়াইয়া জীবনের সহিত মুখামুখি না যুঝিয়া অতি ঊর্দ্ধ শূন্যে ধ্যানমার্গে তাহাকে জয় করিবার যে অতি-মানুষী সাধনা—তাহাকেই ইহারা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী জীবনের যে নূতন আদর্শকে উদ্ধার প্রচার করিয়াছিল, তাহাই তিন হাজার বৎসর পরে ভারতের নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

কিন্তু এই আদর্শ পরে বিচলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে সাধন-মন্ত্রের কথা বলিয়াছি তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁহার যে অধিকার আছে, তাহা আর কাহারও নাই; কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে জননায়ক বা লোকগুরু নহেন; যেখানে তিনি প্রচারক বা শিক্ষক সেখানে তাঁহার ব্যক্তিত্বই প্রবল—কবিত্ব নয়, একথা স্মরণ রাখিলে আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইবে না। কিন্তু জীবনেরই সাধনার দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মন্ত্র আবার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে সেই অন্ধবিশ্বাস অথবা তান্ত্রিক ভাবসাধনার পন্থাই বরণীয় হইয়াছে। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে বাস্তব অস্ত্রের পরিবর্ত্তে, অতি-মানবীয় শক্তির উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হইতেছে; অথবা, ব্যক্তিগতভাবে আত্মানুশীলনের দ্বারা যোগশক্তির অধিকারী হইয়া, সেই শক্তির বলে জগৎ ও জীবনকে রূপান্তরিত করিবার এক নূতন উপায় ঘোষণা হইতেছে। যাহার দেহই দুর্ব্বল, উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইয়াছে—তাহাকেই আত্মার শক্তি প্রয়োগ করিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হইবে! এ সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই; এই দারুণ মোহ ও আত্মপ্রবঞ্চনার ফল কি হইতেছে বা হইতে পারে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বাংলার নবযুগের সাধন-মন্ত্র ইহার তুলনায় যে কত সত্য ছিল, তাহাই বুঝিয়া দেখিবার জন্য আমি এখানে এ বিষয়ের একটু ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

আমার আলোচনা এইবার শেষ হইল; তথাপি শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও দুই-একটি কথার পুনরুল্লেখ করিব। বাঙালীর এই নবজাগরণ শুধুই বাঙালীর নয়—এক হিসাবে তাহা ভারতেরও নবজাগরণ, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এইরূপ জাগরণ কোন একটি জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতি বা স্বধর্ম্মের অনুকূলেই সম্ভব—স্বাজাত্যবোধই সেই আত্ম-চেতনার সহায়। বাঙালী-জাতির জীবনে এইরূপ জাগৃতি দুই বার ঘটিয়াছে; অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস প্রায় অপরিজ্ঞাত, তাই দুই বারের কথাই নিশ্চয়তার সহিত বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় প্রথম সেই পূর্ব্ববারের জাগৃতির সগৌরব উল্লেখ করিয়াছিলেন। সে জাগৃতি ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে; ধর্ম্মসাধনায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায়, কাব্যে ও দর্শনে, ভাবুকতা ও মনীষায় বাঙালী-প্রতিভার সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উদ্দীপ্তিই ভারতের আধুনিক ইতিহাসে জাতিহিসাবে বাঙালীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। সেবারে তাহার যাহা কিছু কীর্ত্তি, তাহা নিজের সমাজে, নিজের জাতীয় জীবনে প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে জাগরণ তাহা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজের এক-শাসনের ফলে সমগ্র ভারতে একটা সহানুভূতির সুযোগ। নবযুগের প্রভাব বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও স্বভাবের পক্ষে যেরূপ আশু ফলপ্রদ হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হইতে পারে নাই। বাঙালীর প্রকৃতিতে, রক্ষণশীলতা ও বন্ধনবিমুখতা—পুরাতনের সেন্টিমেন্ট ও নবতনের ভাবাকুলতা—দুইই এমন প্রবল যে, বাঙালীই সেই

গুরুতর যুগসঙ্কটে—এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, অপর দিকে তেমনই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, উভয়ের সমন্বয় করিয়া—শুধু বাংলার নয়, ভারতের সংস্কৃতিকেও পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সন্ধানে সে যেমন ইংরেজ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তেমনই ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে—ভারতীয় চিন্তার বিশিষ্ট ধারাটিকে—নিজের অসাধারণ ধীশক্তি ও রস-দৃষ্টির দ্বারা সে-ই পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে; সে কালের নব্য বাংলাসাহিত্যে ও কাব্যেই শুধু নয়—হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনের বহুতর চর্চ্চায় ইহার প্রভূত প্রমাণ আছে। এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে নবজীবনের এমন সাড়া আর কোথাও জাগে নাই—সেই মহাদেশব্যাপী তামসিক অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানের যা-কিছু আলোক এই বাংলা দেশেই জ্বলিয়াছিল। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে প্রতিভা-পরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহাতে মনে হয়, যেন ঐ কালে এই দেশে, একের পর এক, দেবগণের আবির্ভাব হইতেছিল—বাঙালী জাতির এ হেন ভাগ্যোদয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। তথাপি এ কথাও বিস্মৃত হইতে পারি না যে, বাঙালীর সেই অভ্যুদয়ে ভারতেরও গৌরববৃদ্ধি হইযাছিল—উনবিংশ শতাব্দীব বাংলার ইতিহাস ঐ শতাব্দীর ভারতেরও ইতিহাস বটে। এই বাঙালীব অন্ধ স্বজাতিপ্রীতির মিথ্যা গর্ব্ব নহে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচীন হিন্দুর অবজ্ঞাত এই অনার্য্য অধ্যুষিত দেশেই—আর্য্য-ভাবতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশেই—নানা জাতির সংমিশ্রণে এমন এক জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসেব যত-কিছু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গস্রোত উত্তর-পশ্চিম হইতে এই পূর্ব্বতটে প্রহত হইযা, এই শান্তিপ্রিয় ঘাতসহনশীল জাতির বহির্জ্জীবন প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার মত, এমন একটি বিশিষ্ট ভাব প্রকৃতিকে পুষ্ট করিযাছিল যে, তাহারই কালোচিত উন্মোচনে ও প্রস্ফুটনে সারা ভারতের সুপ্তিভঙ্গ হইয়াছিল। আজিও বাংলা সাহিত্যই ভারতের জাতীয় ভাবধারার উৎসস্থল; বাংলা ভাষাই সংস্কৃতেব সকল সৌন্দর্য্য আপন অঙ্গে ধারণ করিয়া ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতির বাগ্-বৈভবকে নবজীবন দান করিয়াছে; ভারতীয সাধনার বহুযুগের সেই বহুমুখী ধারাকেও এতকাল পরে এক অবতারকল্প বাঙালী মহাপুরুষই সাগরসঙ্গমে মিলাইয়া দিয়া সারা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন। বাঙালী মহাকবিই খাঁটি ভারতীয় ভাবকল্পনাকে আধুনিক কাব্যকলায় প্রতিফলিত করিয়া, বিশ্বসাহিত্যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। অতএব বাংলার নবযুগ শুধুই বাংলার নয়, ভারতেরও বটে।

সর্ব্বশেষে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে—পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে তাহাই আমার বিদায়-বাণী। এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তা-কার্য্যে আমার মুখ্য অভি-

প্রায় ছিল—বাঙালীর আত্মপরিচয়-সাধন। সে অভিপ্রায় কতখানি সিদ্ধ হইয়াছে, জানি না ; এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি-উদার কালচার-বাদ ও বিশ্বমানবীয় ভাব-বিলাসের দিনে, আমি যে আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি, এবং তাহার গৌরব-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই ; অতিশয় বর্ত্তমানে নূতন করিয়া যে 'অখণ্ড ভারতে'র ধুয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যেমনই হোক, তাহা যে পারমার্থিক সত্য নয়, তাহা আমি জানি ও বিশ্বাস করি। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতই একটি ভূখণ্ড, তাহাতে নানা জাতির বাস, এই সকল জাতি কখনও এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। একদা ধর্ম্ম সংস্কৃতিগত একটা ঐক্য-বন্ধন ছিল, অপর সকল বিষয়ে একটা পার্থক্য চিরদিন আছে ও থাকিবে। 'অখণ্ড ভারত' বলিতে যে পারমার্থিক ঐক্য বুঝায়—ভারতীয় প্রকৃতির যে আধ্যাত্মিক সমভাব বুঝায়, আজিকার 'অখণ্ড ভারত' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যে যুগে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা প্রত্যেক জাতিকে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন করিয়া তুলিতেছে, সেই যুগে ধর্ম্ম বা সংস্কৃতির বন্ধন কখনও দৃঢ় হইতে পারে না ; স্বার্থেরই মিলন ঘটাইবার জন্য যে অখণ্ডতার দাবি করা হইতেছে, তাহাতে সেই একাত্মীয়তা সম্ভব নয় যাহাতে সর্ব্বপ্রকার পলিটিক্স বর্জ্জন করিতে হয়। সারা ভারতকে যদি এক দেশে ও এক জাতি বলিয়া গণ্য করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে য়ুরোপও অখণ্ড য়ুরোপ হইতে পারিত—শুধুই য়ুরোপ কেন, সারা পৃথিবীই মানব-মহাদেশে পরিণত হইত। তাহা যে কখনও হইবে, সে বিশ্বাস আমার নাই। মানুষ যুগে যুগে অতিশয় রোচক মিথ্যার স্বপ্ন দেখিয়াছে ; অনেক মহাপুরুষ—কবি ও ভাবুক, ঋষি ও প্রফেট—পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশায় বহু উপদেশ ও আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই সকল মহাপুরুষের আত্মাও প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই। জয় করিবার প্রয়োজনও নাই ; পুরুষই উন্মাদ, প্রকৃতি অতিশয় সুগৃহিণী, তাহার গৃহস্থালীতে কোন হিসাব-ভুল নাই। স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টির নিয়ম, এবং শক্তিই বিশ্বের শাসয়িত্রী। সকল বৈষম্য ও ভেদ-প্রভেদের মধ্য দিয়াই শক্তির বিকাশ—এই বিকাশই জীবন ; সৃষ্টির মূল তত্ত্ব ইহাই, তাহা সর্ব্ববিধ একাকারের বিরোধী। তাই 'সাম্য' একটা উন্মাদ-বিজৃম্ভিত কল্পনা-মাত্র—শক্তিহীন দুর্ব্বলের মস্তিষ্কবিকার। আজই পৃথিবীতে এই তত্ত্বের একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে মানুষের মস্তিষ্কজাত যত-কিছু লূতাতন্তু মহাকালের সম্মার্জ্জনীমুখে নিমেষে অন্তর্হিত হইবে—সেই 'শক্তি'ই দেশ ও জাতির গণ্ডির মধ্যে আপনার লীলা আরও অপ্রতিহত করিয়া তুলিবে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মকে পরিহাস করিলে যমে

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ

এই জাতির গত-যুগের ইতিহাসে যে সমস্যা ও সঙ্কট ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—কেশবচন্দ্র তাহারই একটি স্ফুলিঙ্গ। জাতির সেই ইতিহাস বুঝিতে হইলে, কেশবচন্দ্রকেও বুঝিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির নিয়মে, সকল সমস্যাই মূলে একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটরূপেই দেখা দেয়, কেশবের মধ্যে ইহা বিশেষ করিয়া সেই আকারই ধারণ করিয়াছিল। যুগ ও জাতির প্রতিনিধিরূপে কেশব-জীবনের আদর্শ ও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই বলিব।

এ যুগের ধর্ম্মান্দোলনেব সঙ্গে যে সমস্যা বিশেষ করিয়া জড়িত ছিল, যাহার সমাধান একটা সজ্ঞান সুস্পষ্ট অভিপ্রায়রূপে সেই আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা মুখ্যত মোক্ষলাভ নয়—জাতির জীবনকে নূতন করিয়া একটা নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযোজন-চিন্তাই তাহার মূল। সমাজরক্ষা বা লোকসংস্থিতিব জন্য যে নীতিমার্গ বা Law, তাহাই ছিল এ যুগের ধর্ম্মসমস্যা। এই ধর্ম্মকে নূতন করিয়া উদ্ধার করা—তাহাকে যুগোপযোগী রূপ দিয়া জাতিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুগ-সঙ্কটে পরিত্রাণ-লাভের উপায় আবিষ্কাব করাই—সেকালের বাঙালী-মনীষিগণের একমাত্র ভাবনা ছিল; সকলের ধারণা এক ছিল না—আদর্শ পৃথক ছিল। কেশবচন্দ্র এই সমস্যার সমাধানে ভগবদ্‌ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা জাতির নৈতিক উন্নতি-সাধনকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে ও কর্ম্মজীবনে এই অভিনব আদর্শের অনুপ্রেরণা আপাত-দৃষ্টিতে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলে, তাহার মধ্যে বাঙালীব ভাব-প্রকৃতি ও বাঙালী-প্রতিভারই এক নূতন অভিব্যক্তি দেখা যায়। সে যুগের সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই বাঙালীয়ানাই আমাকে মুগ্ধ করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাঙালীর প্রতিভায় কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতি একজন বাঙালীর হৃদয়ে কিরূপ সাড়া জাগায়, কেশবচন্দ্রের প্রতিভায় তাহারও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্র যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন—যুগের প্রভাব ও জাতির প্রতিভা দুই-ই তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া কেশবকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্ম-সাধনা, এবং ধর্ম্ম-প্রচার এক নহে; উভয়ের প্রয়োজন স্বতন্ত্র। যে কারণে যে-ধর্ম্ম প্রচারযোগ্য হয়, জগতের ইতিহাসে তাহার একাধিক বড় দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষেই সেইরূপ ধর্ম্ম ও তাহার প্রচার প্রথম প্রকটিত হয়। ধর্ম্ম যখন জাতি বা সমাজের কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের আধ্যাত্মিক

সাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার সাধন-পন্থা 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' বলিয়া বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত হয়, তখনই লোকস্থিতিমূলক ধর্ম্মের প্রণয়ন ও প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। শাক্যমুনি ঐতিহাসিক কালের প্রথম ধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার ধর্ম্ম গুহ্য-সাধনার ধর্ম্ম নয়—জ্ঞান-যুক্তিমূলক পুরুষকারের ধর্ম্ম। লোকধর্ম্মের আর এক আদর্শ আছে, প্রাচীন সেমীয় জাতির মধ্যেই তাহার বিকাশ ঘটিয়াছিল। এ ধর্ম্মও সমাজশাসনমূলক, লোকসংস্থিতিই ইহার মূলগত অভিপ্রায়। প্রাচীন ইহুদীয় ধর্ম্ম স্বজাতি বা গোষ্ঠীর জন্যই প্রণীত হইয়াছিল। রাজা বা পিতারূপে এক ঈশ্বরের ধারণা করিয়া প্রেরিত-পুরুষগণ ঈশ্বরাদেশ প্রচাব করিতেন; সেই আদেশ পালনই ছিল সর্ব্বপ্রকার বিনাশ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এই একেশ্বরবাদ, রুক্ষ কঠিন শাসন-বাদ হইতে ক্রমে ঈশ্বরবাদের ভক্তি-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল, এবং স্বজাতি বা গোষ্ঠীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে গ্রহণ করিয়াছিল। এদেশীয় প্রাচীন আর্য্যগণের সমাজেও এক ধরণের ব্রহ্মবাদ প্রচলিত ছিল; তাহাও কেবল আর্য্যগোষ্ঠীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য বিহিত হইয়াছিল, প্রচারযোগ্য ছিল না। কিন্তু এই অতি সহজ সরল—বায়ু ও আলোকের মত জীবনীয—ব্রহ্মবাদ ভারতবর্ষের জল-মাটিতে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই, অদ্বৈত-তত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি সেই আর্য্যধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে রূপান্তরিত করিয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম মিলিত হইযা নানা সম্প্রদায়ের – নানা তন্ত্রের সৃষ্টি করিযাছে বটে, কিন্তু অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের ছায়া সুদূরপ্রসারিত হইযা, ধর্ম্মকে শেষ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে সরাইযা, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন-সাধনেই বিশেষ করিয়া নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই অতুচ্চ্য আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমাজবিধি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেকালের জনসমাজের কীদৃশ কল্যাণ কি ভাবে সাধন করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন—আজিকার আদর্শে তাহা নির্ণয় করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই অধ্যাত্মসাধন ও সামাজিক হিতসাধনের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, এই বাংলা দেশেই, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, যে নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতেও এই সমস্যার সম্যক মীমাংসা হয় নাই। নিয়ম-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে, ধর্ম্মমূলক ভক্তিরসের প্লাবনে, জাতির প্রকৃতি আরও কোমল হইযা পড়িয়াছিল, সমাজ আত্মস্থ না হইয়া কতকটা আত্মহারা হইয়াছিল। সমগ্র মুসলমান-অধিকারকালে, আত্মোন্নতি অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টাই প্রবল হইতে দেখা যায়; সেকালে এই আত্ম-রক্ষার উপায হইয়াছিল আত্মসঙ্কোচ। এই জন্যই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-ধর্ম্ম সামাজিক সংস্কার ও সংগঠন-কর্ম্মে দুঃসাহসী হইতে পারে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মের যে আর এক আদর্শ আছে, লোকসংস্থিতিই যাহার

মুখ্য অভিপ্রায়—যে ধর্ম্ম-নীতি ব্যবহারিক লোকযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশে বহুদিন প্রচারিত হয় নাই। আমরা ধর্ম্ম বলিতে ব্যক্তিগত মোক্ষসাধনার আদর্শ ই বুঝি; এই মোক্ষলাভের সাধনায় ব্যক্তির অধিকারভেদ মানি। প্রত্যেক জীবই কর্ম্ম অনুসারে অন্য হইতে স্বতন্ত্র, অতএব সাধন-মন্ত্র সকলের পক্ষে এক হইতে পারে না। মানুষমাত্রেই এক ধর্ম্ম-পরিবারভুক্ত বটে, কিন্তু তুল্যাধিকার-সম্পন্ন নয়; একই গোষ্ঠীপতি ভগবানের সন্তান বলিয়া সকলেই একই সত্যের অধিকারী—এ ধারণা আমাদের নিকট নিতান্তই হাস্যকর। অধিকারভেদে একই সত্যের নানা রূপ—কোনটাই মিথ্যা নহে; মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিহিসাবে যাহার যতটুকু অধিকার তাহাই তাহার পরম সত্য। এই তত্ত্বের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম যতই গভীর হউক—এ আদর্শের মূলে যত গভীর সত্যই নিহিত থাক, ইহার ফলে যে সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সামাজিক নীতি-সত্যের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। যতদিন বাহিরের সঙ্গে সংঘাত গুরুতর হইয়া উঠে নাই—অহিন্দু সেমীয়-সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ঘটে নাই, ততদিন এই বাস্তব-স্পর্দ্ধী অধ্যাত্মসাধনা কতকটা নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়াছিল। কিন্তু পরে, বিধর্ম্মের প্রচণ্ড আঘাতে, বিজাতির প্রবলতর রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎপাতে, যখন এ জাতির দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, তখন এই ধর্ম্ম বাহিরের জীবন ও সামাজিক নীতি-সত্যকে পাশ কাটাইয়া গুহ্য তান্ত্রিক সাধন-মার্গে আত্মগোপন করিল; যে ধর্ম্ম সমাজকে ধরিয়া রাখে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া, আমরা জীবনে মিথ্যাচারী, এবং ধর্ম্মসাধনায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিলাম।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সকলেই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই আমরা নিজেদের দুর্গতি সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিলাম, যে সঙ্কট সম্বন্ধে এতদিন আমাদের কোনও চৈতন্যই ছিল না, তাহাই মর্ম্মান্তিক রূপে উপলব্ধি করিলাম। ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজ-চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সবচেয়ে বেশি করিয়া বুঝিলাম—আমাদের নৈতিক দীনতা, জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় অবনতি, বৃহৎকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রের প্রতি আসক্তির জন্য আত্মার জড়তা। ইংরেজী শিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হইবারও পূর্ব্বে এ চেতনা বাঙালীকে অধিকার করিয়াছে, নিজেদের হীন অবস্থার জন্য লজ্জিত হইবার মত আত্মজ্ঞান তাহার হইয়াছে। পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদে, এবং নূতন বিদেশী শক্তির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, বাঙালী আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল—এই ভাবনাই তাহার সুপ্ত মনীষা জাগাইল। কারণ, বাঙালী চরিত্রবলে যতই হীন হউক, তাহার ভাবগ্রাহিতা-শক্তি অসাধারণ, যুগান্তরের ভাব-সত্যকে সে অবিলম্বে জ্ঞান-গোচর করিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেই বাঙালী বুঝিতে সুরু করিল, যুগ-প্রয়োজন কি। রাজা রামমোহন রায় বাঙালীর হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের যে অপর অর্থ আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই অর্থে

রামমোহন একটা ধর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে, জাতির মনোভূমি হইতে সকল অন্ধ-বিশ্বাস, এবং ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র বা অলৌকিক অনুভূতির চর্চ্চা দূর করিয়া, তিনি একটি যুক্তিসম্মত, নীতিমূলক ধর্ম্ম দেশবাসীর জন্য প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের এই উদ্যম ও তাহার অন্তর্গত অভিপ্রায় আজিও কেহ বুঝিতে সক্ষম বা সম্মত হয় নাই। রামমোহন যে একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, পারলৌকিক কল্যাণচিন্তাই তাহার মুখ্য কারণ নয়; সাধু-সন্ত বা ভক্তভাগবতগণ যে শ্রেণীর ধার্ম্মিক, রামমোহন নিজে সেরূপ ধার্ম্মিক ছিলেন না। রামমোহনের প্রতিভার প্রধান কৃতিত্বই এই যে, তিনি রাষ্ট্রে, সমাজে ও শিক্ষায় একটা নূতন যুগোপযোগী আদর্শের সন্ধান করিয়াছিলেন—ভগবৎ-লাভের উৎকৃষ্টতর পন্থানির্দ্দেশ, নূতন করিয়া মোক্ষশাস্ত্র-রচনা, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না; বলহীনকে পার্থিব জীবনে শক্তিমান করিয়া তোলাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল; মধ্যযুগের ধার্ম্মিকতার আদর্শকেই সংস্কার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি চান নাই। জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, জাতিহিসাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে, প্রত্যক্ষকে স্বীকার কর, এবং তজ্জন্য সহজ মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা কর—ইহাই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম; পৌরাণিক ধর্ম্মের ভাবসাধনায় যে বক্রকুটিল গহন-গূঢ় আরণ্য পথ মানুষকে সহজ সত্য ও সামাজিক শক্তিসাধনা হইতে দূরে লইয়া যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করে, তাহাকে বর্জ্জন কর। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অতি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ "বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী"র একস্থানে রামমোহন-সম্পর্কিত আলোচনায় রামমোহনের একখানি ইংরেজী পত্রের যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ; আমিও এখানে তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। সে কয় ছত্র এইরূপ—

I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest.......It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.

উক্ত গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহনের গ্রন্থ হইতে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত হইযাছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত—

Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other human creed.

এই সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রামমোহন কেন ধর্ম্মসংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান সাহিত্য ও খ্রীষ্টান চরিত্র এবং খ্রীষ্টান রাজশক্তির প্রভাব একালে বাঙালীর মনকে হঠাৎ একটা বড় ধাক্কা দিয়াছিল—তুলনায় নিজেদের হীনতা-বোধ বড়

বেশি করিয়া বাজিয়াছিল। বাঙালী নূতন করিয়া মানুষ হইতে চাহিল; এবং এক যুগের নিশান্তকালে, অরুণোদয়-প্রতীক্ষায়, পশ্চিমকেই পূর্ব্বদিক্‌প্রাপ্ত বলিয়া তাহার দিঙ্‌মোহ হইয়াছিল। তথাপি রামমোহন একটা ধর্ম্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র—ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না; তিনি কোন পৃথক সমাজস্থাপনের চেষ্টাও করেন নাই। রামমোহন চিন্তা করিয়াছিলেন, তর্ক করিয়াছিলেন, লেখালেখি করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, কোনও ভক্তি-বিশ্বাসের আবেগ তাঁহার ছিল না—তাঁহার ধর্ম্মও আবেগের ধর্ম্ম ছিল না। তাই তিনি নবযুগের একটি আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, জাতির জীবনে বা তাহার হৃদয়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। রামমোহন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন—অপক্ষপাত সহকারে তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে তাঁহার যে ব্যক্তি-স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, তিনি ভক্তমণ্ডলীর অনুকরণীয় আদর্শরূপে নিজ জীবন যাপন করেন নাই। সেখানেও, তিনি 'বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের মত অটল অবিচলিতভাবে নিজের মনের মত জীবন যাপন করিতেছিলেন, দেখিতে পাই। এই বীরমূর্ত্তি কোন সাধু, দরবেশ বা ভক্ত-সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি নহে। রামমোহনের যে অসাধারণ মনস্বিতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহাও নব্যন্যায়ের স্রষ্টা বাঙালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এই যে রামমোহন, ইঁহার পরিচয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রামমোহন বাঙালীর বরণীয় বটেন, কিন্তু কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠার জন্য নয়—রামমোহনই এ যুগে সর্ব্বপ্রথম জাতির জড়বুদ্ধিকে সবলে আঘাত করিয়াছিলেন, স্বাধীন জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জনমনকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; ইহাও সত্য। তাঁহার বাণীকে এ জাতি জীবনের মধ্যে পায় নাই। আজ রামমোহনকে লইয়া আমরা যে গৌরব করিতেছি, তাহার আরও সঙ্গত কারণ থাকিলে ভাল হইত। তাঁহার জীবন বা তাঁহার আদর্শ কোথাও সাক্ষাৎভাবে জাতিকে প্রভাবিত করে নাই, শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে আমাদের হৃদয়ের বলবৃদ্ধি করে নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামমোহনের নামে যে নূতন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মন্ত্রও ঠিক রামমোহনের মন্ত্র নয়; সে সমাজ এক অভিজাত জ্ঞানী-সম্প্রদায়রূপে অচল হইয়া রহিল। কিন্তু নবযুগ বসিয়া ছিল না, বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার হলকর্ষণ বন্ধ হয় নাই; বরং আরও গভীরভাবে সেই খনন-কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশবচন্দ্র সেন নামে আর এক বাঙালীর অভ্যুদয় হইল। কেশবের ধর্ম্মজীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এ যুগের পক্ষে আকস্মিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেশবচন্দ্রের মধ্যে বাঙালী-প্রতিভার আর এক দিক নবযুগের সমস্যায় সাড়া দিয়াছিল। কেশব যুক্তিবাদী

নহেন, ভক্তিবাদী; কেশব যে শক্তিবলে যুগ-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে চাহিলেন, সে শক্তি আত্মিক বিশ্বাসের শক্তি, তাই কেশব রামমোহনের মত নীতিবাদী নহেন—নীতিধর্মী; তিনি ধর্ম্ম-প্রণেতা নহেন—ধর্ম্ম-প্রচারক। তথাপি কেশব ও রামমোহনের লক্ষ্য এক—জাতির নৈতিক জীবনের সংস্কার-সাধন। রামমোহন যাহা বুদ্ধির সাহায্যে করাইতে চাহিয়াছিলেন, কেশব তাহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে। রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও, এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য-সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—বেদান্ত উপনিষদের দোহাই না দিয়া পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার 'ভাবের ঘরে চুরি' ছিল; তিনি ভিতরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে তাহা খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। এই আভিজাত্যাভিমানের বশেই—নিজধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তিনি যে পরমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব স্বীকার না করিয়া, তিনি অতি প্রাচীন শাস্ত্র হইতে স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেশব এই আবরণটি উড়াইয়া দিলেন, নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অকপটে স্বীকার করিলেন। কেশব বিদ্রোহী নব্যবঙ্গের এক অভিনব মূর্ত্তি। কেশবের ধর্ম্ম-প্রতিভা ছিল, তাঁহার সমস্ত হৃদয়-মন ভক্তির ভাবাবেশে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত—সে সময়ে তাঁহার মুখে দিব্যপ্রভা ও কণ্ঠে দিব্যভারতীর উদয় হইত। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ যেমন রামমোহনের প্রতিভাকে স্ফুরিত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ধর্ম্মও তেমনই কেশবকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। এই দুই অগ্নি-পরীক্ষাই বাঙালীকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে; কেশবের প্রতিভা খাঁটি বাঙালীর প্রতিভা, কেশবের জয় ও পরাজয় সে যুগের বাঙালীর ইতিহাসে এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

কেশবের প্রতিভায় তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—(১) তাঁহার অভারতীয় ধর্ম্মপ্রেরণা; (২) ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি স্বীকার করিলেও কার্য্যত তিনি ভক্তিযোগী মিষ্টিক; (৩) কঠিন মত-নিষ্ঠা অপেক্ষা উদার ভাবগ্রাহিতা। এই তিনটি লক্ষণে আমরা তাঁহার সাধন-জীবনের যুগোপযোগিতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কেশবের ধর্ম্মজীবনে আমরা পর-ধর্ম্মের প্রেরণা দেখিতে পাই। ইহুদীয় ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণ—ব্যাপ্‌টিস্ট জন (John the Baptist), সেণ্ট পল ও যীশু—যে একজন ঈশ্বরপিপাসু হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মগুরু হইলেন, কেশবের ধর্ম্ম-জীবনে ইহা কি কেবল একটা দৈব ঘটনা? ইহার মূলে কি বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং যুগপ্রভাব ও যুগ-সমস্যার একটা ইঙ্গিত ছিল না? ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রভাব ইহার মূলে ছিল, সন্দেহ নাই—কিন্তু বাঙালীর ভাব-প্রকৃতি ইহার জন্য সমধিক দায়ী। সে যুগের ধর্ম্মহীন নীতিহীন সমাজের পরিণাম-চিন্তা কেশবকে যে ভাবে ব্যাকুল করিয়াছিল, তেমন আর কোনও ভাবুক বাঙালীকে করে নাই। অতিশয় স্পর্শকাতর

চিত্ত ও অতিশয় কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ে যদি আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত হয়, যদি তাহার সঙ্গে আন্তরিকতা, আত্মপ্রত্যয় ও চরিত্রবল থাকে, তবে সে যুগের পক্ষে যেরূপ ধর্ম্মপ্রেরণা স্বাভাবিক, কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহারই বিকাশ হইয়াছিল। যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতির প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কেশবচন্দ্রকেও সেই ধর্ম্মনীতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহা হইতে সে যুগের বাঙালীর প্রতিভা কোন্ প্রধান সমস্যার সমাধান-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র নয়, ইংরেজী সাহিত্যও নয়, ইংরেজের যে চরিত্রবল—বিজেতা জাতির যে পৌরুষময় প্রাণের স্ফূর্ত্তি সেকালে সমগ্র ভারতবাসীকে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল—যাহার প্রভাবে ইংরেজ শুধুই রাজ্য-জয় করে নাই, বহু শতাব্দীর অনাচারকলুষিত নৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল—সে যুগের বাঙালী মনীষী ও বাঙালী ভাবুক তাহাকেই বরণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, জাতির জীবনে নব আদর্শরূপে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কেশব এদেশে ইংরেজ-অধিকারের ইতিহাস জানিতেন; তাহার কারণও যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনই তাহার সুফললাভের আশাও করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বলিয়াই, ইহার মূলে মঙ্গলময় বিধাতার শুভ অভিপ্রায় আছে। যে ধর্ম্মনীতির প্রেরণায় ইংরেজ জাতি বড় হইয়াছে—ইংরেজের দৃষ্টান্তে ও সাহচর্য্যে তাহারই সারতত্ত্ব আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরিত্রাণ আশু ও সহজ হইবে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ের ফলে জাতির একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে—এমন ধারণা সেকালে সকল শিক্ষিত বাঙালীর ছিল, বাঙালী একটা বড় আশা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এ আশা করিতেন। ইংরেজের প্রতি এই শ্রদ্ধা, বিজাতির প্রতি এই মনোভাব—ভাবনা ও কল্পনাশক্তির ফলে বাঙালীই সর্ব্বাগ্রে পোষণ করিয়াছিল; ইহারই ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালীই আধুনিক ভারতে যুগান্তর আনিয়াছে। কেশবের মধ্যে সেই বাঙালীয়ানারই বিকাশ হইয়াছিল ধর্ম্ম-প্রেরণার দিক দিয়া।

কেশবের ধর্ম্ম-প্রেরণার মূলে ছিল পাপবোধ। অতি অল্প বয়সেই জাতির বহুকালসঞ্চিত পাপের পরিণাম-চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। বৈষ্ণব কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রকৃতিতে বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে পাপ ও পাপমুক্তির তত্ত্ব গ্রাহ্য হইলেও, সে ধর্ম্মের সাধনায় আর সে সরলতা ছিল না, জটিল রসতত্ত্ব ও নানা তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কেশব বুঝিয়াছিলেন, মানুষকে মানুষহিসাবেই উন্নত হইতে হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যক্তি-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, সহজ স্বাভাবিক মানবীয় চেতনাকে অতিক্রম করিলে

চলিবে না। সে সম্বন্ধ আপামরসাধারণের পক্ষে একই ভাবে ও একই কারণে সহজ হওয়া চাই। এই সম্বন্ধস্থাপনের উপায়—জ্ঞান নয়, ধ্যান নয়, গুরুদীক্ষাও নয়—প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই গুরু—ভগবান ও মানুষের মধ্যে সহজ যোগস্থাপনের একমাত্র সেতু। এক প্রার্থনার উপযোগী চিত্তের অবস্থা—পাপ-বোধ, দুর্ব্বল অসহায় মানুষের ভয়-ব্যাকুলতা। চিত্তের এই অবস্থা ও এই প্রার্থনা-তত্ত্ব কেশবের জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইযাছিল, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনকে খ্রীষ্টীয় সাধন-পদ্ধতির অনুকূল করিয়াছিল। কেশবের নীতি-নিষ্ঠায় ভক্তের আত্মসমর্পণ ছিল, যুক্তিবাদীর অহঙ্কার ছিল না। প্রথম হইতেই এই নৈতিক চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাই খ্রীষ্টীয় সাধুর উক্তি—"Repent ye, for the Kingdom of Heaven is at hand"—তাঁহাকে এমন গভীর ভাবে বিচলিত করিয়াছিল।

কেশব রামমোহন-পন্থী ছিলেন না—ইহার পরেও তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কেশব সজ্ঞানে ভক্তি-সাধনা করিতেন বটে—প্রচাবক কেশব তাঁহার নব ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিত্তিমূলে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসাকে স্থান দিযাছিলেন বটে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে তিনি বিশ্বাসকেই সর্ব্বোচ্চ পীঠমণ্ডপে আসন দিয়াছিলেন; তিনি সকল জিজ্ঞাসার উত্তর চাহিতেন ভাগবতী প্রেরণার সমীপে। বাঙালীর সন্তান, উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগে—নূতনতর জাতীয় সমস্যার সঙ্কটে, এবং এক অভিনব শিক্ষা-দীক্ষার আবহাওয়ায—যে নূতনতর ভক্তের বেশে আবির্ভূত হইতে পারে, কেশব ছিলেন তাহাই; নদীয়ার জল-মাটিতে জুডিয়ার ধর্ম্মবীজ যে ফুল ফুটাইতে পারে, কেশবের ধর্ম্মজীবন সেই ফুল। কিন্তু নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অবিমিশ্র ভক্তিকেও মিশ্ররূপ ধারণ করিতে হয়; কেশবের জীবনে সে দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি সেই দ্বন্দ্বকে জ্ঞানত অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু যিনি তাঁহার সমগ্র চরিত আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের পূর্ব্বোত্তর ধারায় ইহাই কেশব-জীবনের বিশেষত্ব। এই জন্যই সে যুগের সংস্কারপন্থীদের মধ্যে একমাত্র কেশবের প্রতিভাকেই সত্যকার ধর্ম্ম-প্রতিভা বলা যাইতে পারে। কারণ, ধর্ম্ম কেবল নীতির শাসন নয়; অথবা ঈশ্বর নামক কোনও কল্পিত সত্তাকে যুক্তি বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করার পন্থাও নয়। ইহারই বিরুদ্ধে কেশব তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসকে ভক্তিরসধারায প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্ব ছিল; না থাকিলে তাঁহার জীবন এমন কর্ম্মময় হইত না; বুঝি বা, তিনি নব ধর্ম্মনির্ম্মাণে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইতেন না। এই ভক্তি যেমন তাঁহাকে নিজ ধর্ম্মজীবনে জয়ী করিয়াছিল, তেমনই ধর্ম্মপ্রচারের স্ববিরোধী অধ্যবসাযে তাঁহাকে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও বিফল-মনোরথ করিয়াছে। কেশব জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন; প্রকৃতি জ্ঞানপ্রধান না হইলে এমন

সমন্বয় হয় না। কেশবের প্রকৃতি ছিল ভক্তিপ্রধান, তাই এইরূপ সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন হইলেও তিনি তাহা সাধন করিতে পারেন নাই। বড় ভক্ত বড় বীরও বটেন; কেশবও বীর ছিলেন—তিনি ছিলেন উৎসাহ ও কর্ম্মবীর্য্যের অবতার। কিন্তু ধর্ম্মকে যে রূপে ও যে উপায়ে তিনি বহিঃসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য অন্যবিধ প্রতিভার প্রয়োজন। যে আসলে বৈষ্ণব—তাহার শাক্ত অভিমান চলে না; কিন্তু যে শাক্ত, তাহার পক্ষে বৈষ্ণব-রীতি দুরূহ নয়। কেশব যে জ্ঞানী শাক্ত ছিলেন না, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ভক্তিই ছিল তাঁহার প্রধান সম্বল, তাই দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই। 'Am I an inspired Prophet'?—নামক সুবিখ্যাত বক্তৃতায় এই অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট আভাস আছে। তিনি বলিতেছেন—

> **Pantheism and mysticism are things of Asia, while positivism and all the Sciences of the day belong to Europe. My Church is an Asiatic Church. I am in my very bones and blood, in the very constitution of my soul, essentially an Asiatic. As an Asiatic, I would encourage and vindicate devotion to the extent of mystic communion. But here you will probably say there is no harmonious development. It is all prayer and contemplation, and no work. I say there is harmony. If I am mystical, am I not practical too? I am practical as an Englishman. If I am Asiatic in devotion, I am a European in practical energy. My creed is not dreamy sentimentalism, not question, not imagination. Energy, yes, energy—I have that in a great measure in my character and in my church.**

কেশবের চরিত্রে এই শিশুর মত সারল্য ও আত্মপ্রত্যয় বড়ই উপভোগ্য। "Am I not practical too?"—সেদিন কেশবের এই উক্তি তাঁহার শ্রোতৃবর্গ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না; কিন্তু এতদিন পরে আজ আমরা দূর কণ্ঠের এই আকুল প্রশ্ন শুনিয়া বেদনা অনুভব করি। কেশব নিজের সম্বন্ধে যে কর্ম্মবীর্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা খুবই সত্য,—যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নৈতিক উৎসাহ তাঁহার কর্ম্মজীবনে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতেই তিনি আমাদের দেশের নবযুগকে একটি বিশেষ দিক দিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি 'মিষ্টিক',—উনবিংশ শতাব্দীতেও খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের বংশধর। ইহাই তাঁহার আত্মার স্বধর্ম্ম; তিনি যদি নিজ জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই; জাতির পরিত্রাণের জন্য যুগোচিত ধর্ম্মচিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল; ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, এই জন্যই তিনি সে যুগের একজন স্মরণীয় পুরুষ। বর্ত্তমান যুগ ক্রমশই গণতন্ত্রের দিকে চলিয়াছে। একেশ্বরবাদ একদিন মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ঈশ্বরাদেশের কঠিন শাসন। ভক্ত কেশব এই শাসনকে স্বাধীন আত্মার সানন্দ স্বীকৃতির সহিত যুক্ত করিয়া লইলেও তিনি মানুষকে বড় করেন নাই, বরং

সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে, মিষ্টিক যোগীর মত, আত্মলব্ধ ঈশ্বরাদেশকেই শিরোধার্য্য করিয়াছেন। ইহাই চিরযুগের ভক্ত-সাধকগণের চরিত্র-নীতি। কিন্তু এ যুগের সাধনায় এই মধ্যযুগীয় ধর্ম্মনীতি কতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারে, কেশবের আজন্ম সাধনার পরিণাম লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের যে তৃতীয় লক্ষণটির কথা বলিয়াছি, তাহা এই যে, ধর্ম্মবিষয়ে কেশব মতবাদী না হইয়া ভাবগ্রাহী ছিলেন—নিজ হৃদয়ের বিকাশ-কামনায় তিনি সর্ব্বমত ও সর্ব্বতন্ত্র হইতে সুপথ্য সংগ্রহ করিতেন ; ভাবুক ভাবপ্রবণ কেশব ধর্ম্মপ্রেরণার ক্ষেত্রে একরূপ কবি ছিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে নিরন্তর একটি ভাবাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, তাহাতে তিনি কখনও কোথাও সাধনজীবনে স্থাণু হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার 'জীবন-বেদ' নামক গ্রন্থের এক প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

হে আত্মন্ ! ধর্ম্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে ? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিমন্ত্রে। আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নিমন্ত্র কি ? শীতলতা বুঝিতে হইলে উত্তাপ বুঝিতে হয়।

কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। একদলের কাছে সেবা করিলাম, আর একটি দল কবে হইবে ; দশটি দল প্রস্তুত করিলাম, আর দশটি দল কবে প্রস্তুত করিব ; কতকগুলি লোকের সহিত আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সহিত কিসে আলাপ করিতে পারিব ; কতকগুলি শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া সত্য সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্য-গুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এইজন্য অপর কতকগুলি পড়িয়া সত্য সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

এই যে উত্তাপের অবস্থা, ইহাই কেশব-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানবুভুক্ষা ও ভক্তিরসের নিয়ত উচ্ছ্বাস, একই জীবনে এই দুইয়ের অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব—ইহাই নবযুগের বাঙালীর নবসৃষ্টি-কামনার অবস্থা ; ইহাই এ জাতির প্রতিভার নিদান। ইহা আর্য্যও নয়, সেমিটিকও নয়, ইহা বাঙালীর শোণিত ও বাংলার জলমাটির বিশিষ্ট গুণ। ইহারই বলে আমরা নবযুগের নূতন কাল্চার সৃষ্টি করিয়াছি—রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে, বিষম আদর্শের মিলন ঘটাইয়া, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছি। কেশবচন্দ্রে সেই সংস্কৃতিশীলতার এক অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। ভাবুকতাপ্রবণ বাঙালীর নিকটে কোন ভাব-সত্যই বর্জ্জনীয় নহে। বাঙালীর নবজাগ্রত উচ্ছৃঙ্খল আবেগ কেশবের সত্যপিপাসা ও বলিষ্ঠ ধর্ম্মচেতনায় সংহত ও সংযত হইয়া জাতীয় জাগরণের একটা দিক নির্ণয় করিয়া দিল। আমার মনে হয়, কেশব-চরিত্রের এই দিকটি বাঙালী জাতির নবজাগৃতির ইতিহাসে বিশেষ করিয়া অনুধাবনযোগ্য।

উপসংহারে আরও কয়েকটি কথা বলিব। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী আর কোন চিন্তা করে নাই—নূতন যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সামঞ্জস্য সাধনই, তাহার সকল কর্ম্ম-চিন্তা, সকল ভাবুকতার মূলে

ছিল। জাতির অধঃপতনও যেমন গভীর, পরিত্রাণের আদর্শও তেমনই উচ্চ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামমোহনের মনীষা সেই সমস্যাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ইহাই রামমোহনের কৃতিত্ব। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির জড়তা-প্রদর্শন, যুক্তি-বিচারের প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন ছাড়া তিনি অধিক কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল যুক্তিবিচার-সিদ্ধ মতবাদের দ্বারাই একটা জাতির হৃদয় বা চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না—চাই প্রেম, চাই তপস্যা; জীবনে তাহারই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই আলোক মানুষের প্রাণে ও মনে বিকীর্ণ করা। কেশব দ্বিতীয় যুগের যুগন্ধর; তিনি নবজীবন-সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন—তিনি সে যুগের প্রথম প্রেমিক। কিন্তু কেশবের প্রেমও জাতীয় জীবন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সিদ্ধিলাভ করিল না। ধর্ম্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্রের মন্ত্র জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কেশব নিজেও শেষে সকল বিধি, সকল বিধান উত্তীর্ণ হইয়া, নিজের প্রচার-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচারেরও বহু ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, জাতীয় জীবন-যজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচার-কর্ম্মের অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নূতন ভাবচিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য্য সৃজনীশক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব—কেশববিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে; তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি কত কর্ম্মীকে পথ দেখাইয়াছে। সে যুগের যে বাঙালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমার মনে হয়, তিনিও কেশবীয় ভাবের ভাবুক। "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান"—এই মহাকাব্য প্রচারকল্পে, যিনি নূতন করিয়া বাঙালীর জন্য মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সেই কবি নবীনচন্দ্রও কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয়, কেশবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও, তাঁহার প্রচার-প্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা কেশব তাঁহার 'জীবন-বেদে' উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ, কর্ম্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত। বিবেকানন্দ কেশবের পরবর্ত্তী হইলেও অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহার গুরুমন্ত্র ও তাঁহার বাণী স্বতন্ত্র; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আদর্শে কেশবের ছায়া কতকটা সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে।